বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

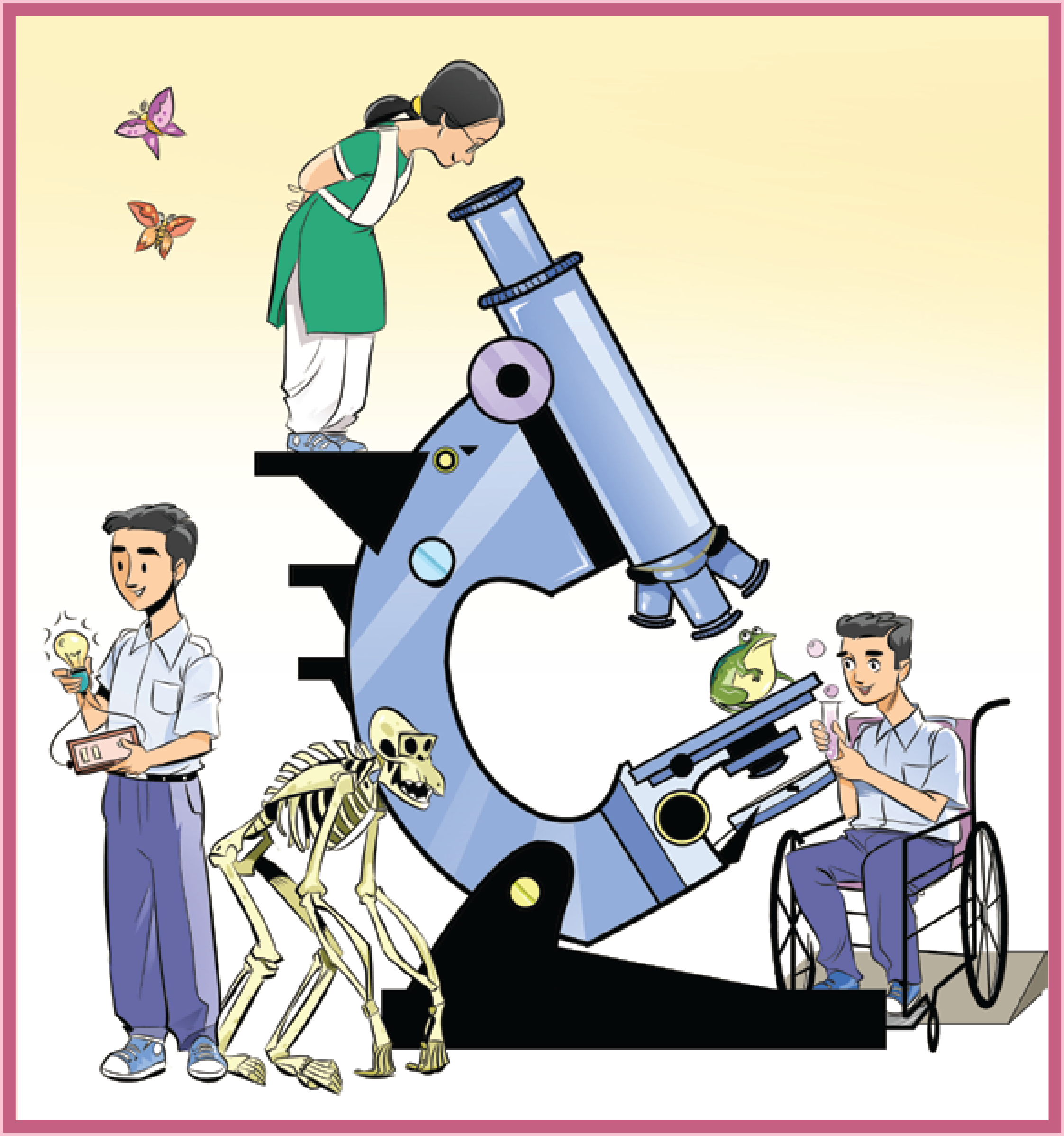

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

নারী ও কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারের স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৪ সালে
ইউনেস্কো 'শান্তিবৃক্ষ' (Peace Tree) পুরস্কার গ্রহণ।

নারী ও কন্যাশিশুদের শিক্ষা প্রসারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ২০১৪ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'শান্তিবৃক্ষ' (Peace Tree) পুরস্কারে ভূষিত করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে 'শান্তিবৃক্ষ' (Peace Tree) পুরস্কার তুলে দেওয়ার সময় শেখ হাসিনাকে 'সাহসী নারী' হিসেবে অভিহিত করেন ইউনেস্কোর মহাপরিচালক। তিনি বলেন, নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বমঞ্চের জোরালো এক কণ্ঠ।

কন্যাশিশু ও নারী শিক্ষা প্রসারের ফলে নারীরা সামাজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছে, টেকসই উন্নয়নের ভিত্তি রচিত হয়েছে এবং নারীরা নতুন নতুন পেশায় যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বিজ্ঞান

নবম-দশম শ্রেণি

সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য পরিমার্জিত সংস্করণে
প্রয়োজনীয় সংযোজন, পরিবর্ধন, পুনর্লিখন ও সম্পাদনা

ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল
ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ

পূর্ববর্তী সংস্করণ রচনা

অধ্যাপক ড. শাহজাহান তপন
অধ্যাপক ড. সফিউর রহমান
ড. এস এম হাফিজুর রহমান
ড. মো. আব্দুল খালেক

পূর্ববর্তী সংস্করণ সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মো. আজিজুর রহমান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ: অক্টোবর, ২০১২
পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ২০১৭
পুনর্মুদ্রণ: , ২০২২

প্রচ্ছদ: মেহেদী হক

চিত্রাঙ্কন: নাসরীন সুলতানা মিতু, মেহেদী হক

আলোকচিত্র: সাস্ট SUPA ও সংগৃহিত

ফন্ট প্রণয়ন: মো. তানবিন ইসলাম সিয়াম

বুক ডিজাইন: মেহেদী হক, নাসরীন সুলতানা মিতু

পেইজ মেকাপ: মাহবুবুর রহমান খান

সমন্বয় ও সার্বিক সহযোগিতা: (পরিমার্জিত সংস্করণ) মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গ-কথা

ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষায় যোগ্য করে তোলা মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির প্রেক্ষিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের সকল পাঠ্যপুস্তক। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্যচেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, প্রকৃতি-চেতনা এবং ধর্ম-বর্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার প্রত্যয় ঘোষণা করে ২০০৯ সালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর হাতে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তাঁরই নির্দেশনা মোতাবেক ২০১০ সাল থেকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করে। তারই ধারাবাহিকতায় উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভিশন ২০৪১ সামনে রেখে পাঠ্যপুস্তকটি সময়োপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রাকৃতিক বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টির মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার বিকাশ সাধন, সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানগুলোর প্রতি শিক্ষার্থীকে আগ্রহী করে তোলা। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের নিকট সহজবোধ্য ও আনন্দদায়ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকগুলোর পাশাপাশি হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতা, কল্পনা ও অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ দেয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে এবং বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থা থেকে উত্তরণের প্রয়োজনীয় জীবনদক্ষতা ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সক্ষম হবে। বিষয়টি শিক্ষার্থীদের কাছে সহজপাঠ্য, আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য করার জন্য ২০১৭ সালে পাঠ্যপুস্তকটিতে পরিমার্জন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে।

বানানের ক্ষেত্রে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি। পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন, নমুনা প্রশ্নাদি প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
প্রথম	উন্নততর জীবনধারা	১–৩২
দ্বিতীয়	জীবনের জন্য পানি	৩৩–৫৬
তৃতীয়	হৃদ্‌যন্ত্রের যত কথা	৫৭–৮৪
চতুর্থ	নবজীবনের সূচনা	৮৬–১১৪
পঞ্চম	দেখতে হলে আলো চাই	১১৫–১২৮
ষষ্ঠ	পলিমার	১২৯–১৪৪
সপ্তম	অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার	১৪৫–১৬৪
অষ্টম	আমাদের সম্পদ	১৬৫–১৮৩
নবম	দুর্যোগের সাথে বসবাস	১৮৪–২১১
দশম	এসো বলকে জানি	২১২–২২৯
একাদশ	জীবপ্রযুক্তি	২৩০–২৫১
দ্বাদশ	প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ	২৫২–২৬৯
ত্রয়োদশ	সবাই কাছাকাছি	২৭০–২৯৪
চতুর্দশ	জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান	২৯৫–৩১০

প্রথম অধ্যায়

উন্নততর জীবনধারা

খাদ্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। দেহের বৃদ্ধি এবং বিকাশ, দেহের টিস্যুগুলোর ক্ষতি পূরণ কিংবা শক্তি উৎপাদন-এ ধরনের কাজের জন্য নিয়মিতভাবে আমাদের বিশেষ কয়েক ধরনের খাদ্যের প্রয়োজন হয়। আমাদের স্বাস্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে, যে খাদ্য আমরা খাই তার গুণগত মানের ওপর। খাদ্য আমাদের চেহারায়, কাজকর্মে, আচরণে ও জীবনের মানে পার্থক্য ঘটাতে পারে। শ্বসন ক্রিয়ার সময় খাদ্যের ভেতরকার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি হিসেবে মুক্ত হয়ে জীবদেহের জৈবিক ক্রিয়াগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকটা জীব তার পরিবেশ থেকে প্রয়োজনমতো এবং পরিমাণমতো খাদ্য গ্রহণ করে। প্রতিটি খাদ্যই আসলে এক ধরনের জটিল রাসায়নিক যৌগ। এই জটিল খাদ্যগুলো বিভিন্ন উৎসেচকের সাহায্যে আমাদের পরিপাকতন্ত্রের বিভিন্ন অংশে ভেঙে সরল খাদ্যে পরিণত হয়, এই প্রক্রিয়াকে পরিপাক বলে। পরিপাক হওয়া খাদ্য শোষিত হয়ে দেহকোষের প্রোটোপ্লাজমে সংযোজিত হয়, যাকে আত্তীকরণ বলে। পরিপাকের পর অপাচ্য খাদ্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় দেহ থেকে নির্গত হয়ে যায়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- খাদ্য উপাদান ও আদর্শ খাদ্য পিরামিড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাকৃতিক খাদ্য এবং ফাস্ট ফুডের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- ভিটামিনের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজ লবণের উৎস এবং এর অভাবজনিত প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানি ও আঁশযুক্ত খাবারের উপকারিতা বর্ণনা করতে পারব।
- বডি মাস ইনডেক্সের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খাদ্যে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার এবং এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া বলতে পারব।
- শরীরে তামাক ও ড্রাগসের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এইডস কী ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শারীরিক ফিটনেস বজায় রাখার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।

১.১ খাদ্য ও পুষ্টি

পুষ্টিবিজ্ঞান অনুসারে আমরা যা খাই তার সবই কিন্তু খাদ্য নয়। শুধু সেই সব আহার্য বস্তুকেই খাদ্য বলা যাবে, যেগুলো জীবদেহে বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ এবং ক্ষয়পূরণ করে, এক কথায় দেহের পুষ্টি সাধন করে। পুষ্টি হলো পরিবেশ থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু আহরণ করে খাদ্যবস্তুকে পরিপাক ও শোষণ করা এবং আত্তীকরণ দ্বারা দেহের শক্তির চাহিদা পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণ করা। পুষ্টির ইংরেজি শব্দ Nutrition; অপরদিকে খাদ্যের যেসব জৈব অথবা অজৈব উপাদান জীবের জীবনীশক্তির যোগান দেয়, তাদের একসঙ্গে পরিপোষক বা নিউট্রিয়েন্টস (Nutrients) বলে। যেমন: গ্লুকোজ, খনিজ লবণ, ভিটামিন ইত্যাদি হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস। পরিপোষকের পরিপাকের প্রয়োজন হয় না, প্রাণীরা খাদ্যের মাধ্যমে পরিপোষক গ্রহণ করে। আমরা বলতে পারি, খাদ্যের কাজ প্রধানত তিনটি:

১. খাদ্য দেহের গঠন, বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করে।

২. খাদ্য দেহে তাপ উৎপাদন করে, কর্মশক্তি প্রদান করে।

৩. খাদ্য রোগ প্রতিরোধ করে, দেহকে সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম রাখে।

খাদ্যের উপাদান

খাদ্যের উপাদান ছয়টি (চিত্র ১.০১), সেগুলো হলো: শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং পানি। এগুলোর মধ্যে শর্করা, আমিষ ও স্নেহ পদার্থ (বা ফ্যাট) দেহ পরিপোষক খাদ্য। খাদ্যের স্নেহ এবং শর্করাকে বলা হয় শক্তি উৎপাদক খাদ্য এবং আমিষযুক্ত খাদ্যকে বলা হয় দেহ গঠনের খাদ্য। ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি দেহ সংরক্ষক খাদ্য উপাদান, যেগুলো দেহের রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

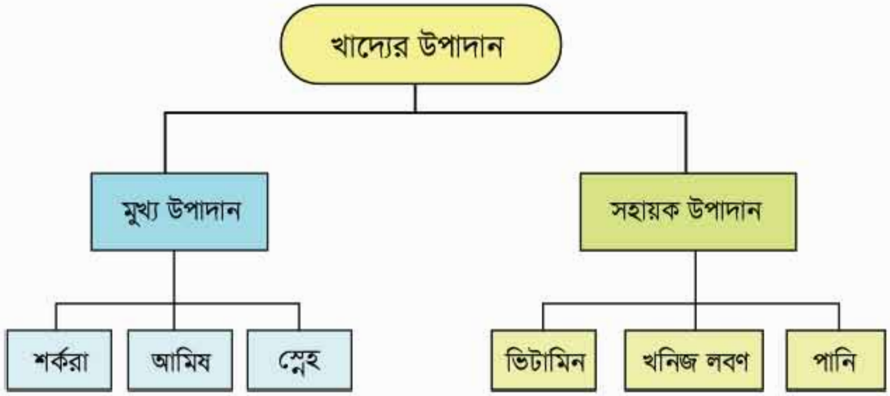

চিত্র ১.০১: খাদ্যের ছয়টি উপাদান

১.১.১ শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট

শর্করা হচ্ছে মানুষের প্রধান খাদ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নিয়ে শর্করা তৈরি হয়। শর্করা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং অল্প মিষ্টি স্বাদযুক্ত। শর্করা আমাদের শরীরে কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।

বেশ কয়েক ধরনের শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট রয়েছে এবং এদের উৎসও ভিন্ন। যেমন:

উদ্ভিজ্জ উৎস

শ্বেতসার বা স্টার্চ: ধান, গম, ভুট্টা এবং অন্যান্য শস্য দানা স্টার্চের প্রধান উৎস। এছাড়া আলু, রাঙা আলু বা কচুতেও শ্বেতসার বা স্টার্চ পাওয়া যায়।

গ্লুকোজ: এটি চিনির তুলনায় মিষ্টি কম। এই শর্করাটি আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদিতে পাওয়া যায়।

ফ্রুকটোজ: আম, পেঁপে, কলা, কমলালেবু প্রভৃতি মিষ্টি ফলে এবং ফুলের মধুতে ফ্রুকটোজ থাকে। একে ফল শর্করাও (Fruit Sugar) বলা হয়ে থাকে।

সুক্রোজ: আখের রস, চিনি, গুড়, মিছরি এর উৎস।

সেলুলোজ: বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম, শুকনো ফল এবং সব ধরনের শাক-সবজিতে সেলুলোজ থাকে।

প্রাণিজ উৎস

ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা: গরু, ছাগল এবং অন্যান্য প্রাণীর দুধে এই শর্করা থাকে।

গ্লাইকোজেন: পশু ও পাখিজাতীয় (যেমন: মুরগি, কবুতর প্রভৃতি) প্রাণীর যকৃৎ এবং মাংসে (পেশি) গ্লাইকোজেন শর্করাটি থাকে।

পুষ্টিগত গুরুত্ব

আমাদের শরীরের পুষ্টিতে শর্করার অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে। শর্করা শরীরের কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে। জীবদেহে বিপাকীয় (Metabolic) কাজের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সেটি কার্বোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্য জারণের ফলে উৎপন্ন হয়।

গ্লাইকোজেন প্রাণীদেহে খাদ্যঘাটতিতে বা অধিক পরিশ্রমের সময় শক্তি সরবরাহ করে। সেলুলোজ একটি অপাচ্য প্রকৃতির শর্করা, এটি আঁশযুক্ত খাদ্য এবং এটি আমাদের দৈনন্দিন মল ত্যাগে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এছাড়া খাদ্যে প্রোটিন কিংবা ফ্যাটের অভাব হলে শর্করা থেকে এগুলো সংশ্লেষ

বা তৈরি হয়।

শর্করার অভাবজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে আমাদের প্রতিদিন প্রয়োজনীয় শর্করাজাতীয় খাদ্য খেতে হয়। খাদ্যে শর্করার পরিমাণ আবার চাহিদার তুলনায় বেশি হলে অতিরিক্ত শর্করা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়। তখন শরীর স্থূলকায় হতে পারে; কখনো কখনো বহুমূত্র রোগও দেখা দিতে পারে।

নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা শ্বসন প্রক্রিয়ায় আমরা বাতাস থেকে যে অক্সিজেন গ্রহণ করি, সেটি ফুসফুসে আমাদের রক্তের সাথে মিশে যায়। রক্তের লোহিত কণিকা এই অক্সিজেন আমাদের শরীরের কোষে পৌঁছে দেয়, সেখানে গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে তাপশক্তি তৈরি করে এবং এই তাপশক্তি আমাদের সকল শক্তির উৎস।

খাদ্যের মধ্যে নিহিত শক্তিকে খাদ্য ক্যালরি বা কিলোক্যালরি হিসেবে মাপা হয়। ক্যালরি হচ্ছে শক্তির একক। এক গ্রাম খাদ্য জারণের ফলে যে পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে খাদ্যের ক্যালরি বলে। এক গ্রাম পানির তাপমাত্রা ১° (ডিগ্রি) সেলসিয়াস বৃদ্ধি করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ তাপশক্তি হচ্ছে এক ক্যালরি। এক হাজার ক্যালরি সমান এক কিলোক্যালরি বা এক খাদ্য ক্যালরি (One Food Calorie)। খাদ্যের ক্যালরিকে কিলোক্যালরি দিয়ে বোঝানো হয়। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায়, শর্করা এবং প্রোটিনের ক্যালরি প্রায় সমান, ৪ kcal/g। স্নেহজাতীয় খাদ্যে অর্থাৎ ফ্যাটের ক্যালরি সবচেয়ে বেশি— এর পরিমাণ ৯ kcal/g। একটা খাদ্যের খাদ্য ক্যালরি বলতে বোঝায় খাদ্যটি সম্পূর্ণভাবে জারণ হলে কতখানি শক্তি বের হবে। একজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ মানুষের দৈনিক ২৫০০ kcal এবং একজন নারীর ২০০০ kcal এর সমপরিমাণ খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

১.১.২ আমিষ বা প্রোটিন

কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেন— এ চারটি মৌলের সমন্বয়ে আমিষ তৈরি হয়। শরীরে আমিষ পরিপাক হওয়ার পর সেগুলো অ্যামাইনো এসিডে পরিণত হয়। অর্থাৎ বলা যায় একটি নির্দিষ্ট আমিষের পরিচয় হয় কিছু অ্যামাইনো এসিড দিয়ে। মানুষের শরীরে এ পর্যন্ত ২০ ধরনের অ্যামাইনো এসিডের সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এই অ্যামাইনো এসিড হচ্ছে আমিষ গঠনের একক।

উৎস দিয়ে বিবেচনা করা হলে আমিষ দুই প্রকার: প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ। প্রাণী থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা প্রাণিজ আমিষ। মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ছানা, পনির— এগুলো প্রাণিজ আমিষ। উদ্ভিদ থেকে যে আমিষ পাওয়া যায় তা উদ্ভিজ্জ আমিষ। ডাল, শিমের বিচি, মটরশুঁটি, বাদাম হচ্ছে উদ্ভিজ্জ আমিষের উদাহরণ।

২০টি অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে ৮টি অ্যামাইনো এসিডকে (লাইসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ফিনাইল অ্যালানিন ও থ্রিওনাইনকে) অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড বলা হয়। এই আটটি অ্যামাইনো এসিড ছাড়া অন্য সবগুলো অ্যামাইনো এসিড আমাদের শরীর সংশ্লেষ করতে পারে। প্রাণিজ প্রোটিনে এই অপরিহার্য আটটি অ্যামাইনো এসিড বেশি থাকে বলে এর পুষ্টিমূল্য বেশি।

উদ্ভিজ্জ খাদ্যের মধ্যে ডাল, সয়াবিন, মটরশুঁটি বীজ এবং ভুট্টার মধ্যে পুষ্টিমূল্য বেশি এমন প্রোটিন পাওয়া যায়। অন্যান্য উদ্ভিজ্জ খাদ্যে অপরিহার্য অ্যামাইনো এসিড থাকে না বলে এদের পুষ্টিমূল্য কম।

প্রাণীদেহের গঠনে প্রোটিন অপরিহার্য। দেহকোষের বেশির ভাগই প্রোটিন দিয়ে তৈরি। দেহের হাড়, পেশি, লোম, পাখির পালক, নখ, পশুর শিং— এগুলো সবই প্রোটিন দিয়ে তৈরি হয়। তোমরা জেনে অবাক হবে প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% হচ্ছে প্রোটিন।

১.১.৩ স্নেহ পদার্থ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড এবং গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত হয়। আমাদের খাবারে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। কঠিন স্নেহ পদার্থগুলোকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো কঠিন অবস্থায় থাকে। যেমন: মাছ কিংবা মাংসের চর্বি। যেসব স্নেহ পদার্থ তরল, সেগুলোকে তেল বলে, তেল হচ্ছে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড। সাধারণ তাপমাত্রায় এগুলো তরল থাকে। যেমন: সয়াবিন তেল, সরিষার তেল ইত্যাদি।

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থ দুই প্রকার। যেমন:

১. প্রাণিজ স্নেহ: চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম— এগুলো হচ্ছে প্রাণিজ স্নেহ পদার্থের উৎস।

২. উদ্ভিজ্জ স্নেহ: বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিজ্জ তেল স্নেহ পদার্থের উৎস। সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, ভুট্টা, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম প্রভৃতির তেলে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। কাজু বাদাম, পেস্তা বাদাম এবং চিনা বাদামও স্নেহ পদার্থের ভালো উৎস।

স্নেহ পদার্থের কাজ

১. খাদ্যবস্তুর মধ্যে স্নেহ পদার্থ সবচেয়ে বেশি তাপ এবং শক্তি উৎপন্ন করে।

২. দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য স্নেহ পদার্থ অতি আবশ্যক।

৩. স্নেহ পদার্থ দেহ থেকে তাপের অপচয় বন্ধ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য খাদ্যভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪. ত্বকের মসৃণতা এবং সজীবতা বজায় রাখে এবং চর্মরোগ প্রতিরোধ করে।

৫. যেসব ভিটামিন (A, D, E এবং K) স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবণীয়, সেগুলো শোষণে সাহায্য করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার

স্নেহ পদার্থের অভাবে চর্মরোগ, একজিমা ইত্যাদি দেখা দেয়। ত্বক শুষ্ক এবং খসখসে হয়ে সৌন্দর্য নষ্ট

হয়। দীর্ঘদিন স্নেহ পদার্থের অভাব হলে শরীরের সঞ্চিত প্রোটিন ক্ষয় হয় এবং দেহের ওজন কমে যায়। আবার শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ জমা হলে দেহে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং এ কারণে মেদবহুল দেহে সহজে রোগ আক্রমণ করে।

১.১.৪ খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন

খাদ্যে পরিমাণমতো শর্করা, আমিষ এবং স্নেহ পদার্থ থাকার পরেও জীবের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য বিশেষ এক ধরনের খাদ্য উপাদানের প্রয়োজন হয়। ঐ খাদ্য উপাদানকে ভিটামিন বলে।

ভিটামিন প্রাণীর স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অপরিহার্য। ভিটামিন হচ্ছে জৈব প্রকৃতির যৌগিক পদার্থ। আমরা যদি প্রতিদিন প্রচুর শাকসবজিসহ স্বাস্থ্যসম্মত খাবার খাই তাহলে আমাদের দৈনন্দিন খাবার থেকেই প্রয়োজনীয় ভিটামিন পেয়ে যেতে পারি।

কয়েকটি ভিটামিন স্নেহজাতীয় পদার্থে দ্রবীভূত হয়, আবার কয়েকটি ভিটামিন পানিতে দ্রবীভূত হয়। যেমন:

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন A, ভিটামিন D, ভিটামিন E ও ভিটামিন K।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন: ভিটামিন B কমপ্লেক্স এবং ভিটামিন C।

স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন A

প্রাণিজ উৎসের মধ্যে ডিম, গরুর দুধ, মাখন, ছানা, দই, ঘি, যকৃৎ ও বিভিন্ন তেলসমৃদ্ধ মাছে, বিশেষ করে কড মাছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন A পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসের মধ্যে ক্যারোটিন সমৃদ্ধ শাক-সবজি, যেমন- লালশাক, কচুশাক, পুঁইশাক, পাটশাক, কলমিশাক, ডাঁটাশাক, পুদিনা পাতা, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, ঢেঁড়স, বাঁধাকপি, মটরশুঁটি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন: আম, পাকা পেঁপে, কাঁঠাল ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন A রয়েছে।

কাজ : ভিটামিন A যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. দেহের স্বাভাবিক গঠন এবং বর্ধন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার কাজ নিশ্চিত করে।

২. দেহের বিভিন্ন আবরণী কলা যেমন: ত্বক, চোখের কর্নিয়া ইত্যাদিকে স্বাভাবিক ও সজীব রাখে।

৩. হাড় এবং দাঁতের গঠন এবং দাঁতের মাড়ি সুস্থ রাখে।

৪. দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে এবং রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে।

৫. দেহে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করে।

অভাবজনিত রোগ ও প্রতিকার : ভিটামিন A— এর অভাবে রাতকানা রোগ হয়। এর অভাব দীর্ঘস্থায়ী হলে চোখের কর্নিয়ায় আলসার হতে পারে— এ অবস্থাকে জেরপথ্যালমিয়া রোগ বলে। এই রোগ হলে আক্রান্ত মানুষ পুরোপুরি অন্ধ হয়ে যেতে পারে। ভিটামিন A— এর অভাবে দেহের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনেক সময় ঘা, সর্দি, কাশি, গলাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গও দেখা দেয়। ভিটামিন A— এর অভাবে ত্বকের লোমকূপের গোড়ায় ছোট ছোট গুটির সৃষ্টি হতে পারে।

ভিটামিন D

একমাত্র প্রাণিজ উৎস থেকেই ভিটামিন D পাওয়া যায়। এই ভিটামিন সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে মানুষের ত্বকে সংশ্লেষিত হয়। ডিমের কুসুম, দুধ এবং মাখন ভিটামিন D— এর প্রধান উৎস। বাঁধাকপি, যকৃৎ এবং তেলসমৃদ্ধ মাছে ভিটামিন D পাওয়া যায়।

ভিটামিন D শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে, যা হাড় তৈরির কাজে লাগে। ভিটামিন D— এর অভাবে শিশুদের রিকেট রোগ হতে পারে। দৈনিক চাহিদা থেকে বেশি পরিমাণে ভিটামিন D গ্রহণ করলে শরীরের ক্ষতি হয়। এর ফলে অধিক ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষিত হওয়ায় রক্তে এদের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যে কারণে বৃক্ক (কিডনি), হৃৎপিণ্ড, ধমনি ইত্যাদিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম জমা হতে থাকে।

ভিটামিন E

সব রকম উদ্ভিজ্জ ভোজ্য তেল বিশেষ করে পাম তেল ভিটামিন E— এর ভালো উৎস। প্রায় সব খাবারেই কমবেশি ভিটামিন E আছে। তাছাড়া শস্যদানার তেল (Corn oil), তুলা বীজের তেল, সূর্যমুখী বীজের তেল, লেটুস পাতা ইত্যাদিতে ভিটামিন E পাওয়া যায়। মানুষের শরীরে ভিটামিন E হলো এন্টি-অক্সিডেন্ট, যেটি ধমনিতে চর্বি জমা রোধ করে এবং সুস্থ ত্বক বজায় রাখে। এ ছাড়া ভিটামিন E কোষ গঠনে সাহায্য করে এবং মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ভিটামিন E— এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূণের মৃত্যুও হতে পারে। দৈনিক সুষম খাদ্য গ্রহণ করলে এই ভিটামিনের বিশেষ অভাব হয় না।

পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন

ভিটামিন B কমপ্লেক্স

পানিতে দ্রবণীয় ১২টি ভিটামিন B রয়েছে। ভিটামিনের এই গুচ্ছকে ভিটামিন B কমপ্লেক্স বলা হয়। দেহের স্বাভাবিক সুস্থতার জন্য খাবারে ভিটামিন B কমপ্লেক্স খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেহের বৃদ্ধি, স্নায়ু ও মস্তিষ্কের কাজ, দেহকোষে বিপাকীয় কাজ, প্রজনন ইত্যাদি সম্পন্ন করার জন্য খাদ্যে ভিটামিন B কমপ্লেক্সের উপস্থিতি অতি আবশ্যক।

ভিটামিন B কমপ্লেক্সভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনগুলোর উৎস এবং অভাবজনিত রোগ নিচের টেবিলে দেওয়া হলো:

ভিটামিন	উৎস	অভাবজনিত রোগ
থায়ামিন (B1)	ঢেঁকিছাঁটা চাল, আটা, ডাল, তেলবীজ, বাদাম, যকৃৎ, টাটকা ফল ও সবজি। প্রাণিজ উৎসের মাঝে রয়েছে যকৃত, ডিম, দুধ, মাছ ইত্যাদি।	দেহে থায়ামিনের চরম অভাবে বেরিবেরি রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এর অভাবে স্নায়ুর দুর্বলতা, মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি, খাওয়ায় অরুচি, ওজনহীনতা ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়।
রাইবোফ্ল্যাভিন (B2)	যকৃৎ, দুধ, ডিম, সবুজ শাক-সবজি, গাছের কচি ডগা, অঙ্কুরিত বীজ।	এর অভাবে ঠোঁটের দুপাশে ফাটল দেখা দেয়, মুখে ও জিভে ঘা হয়, ত্বক খসখসে হয়। চোখ দিয়ে পানি পড়ে। এর অভাবে তীব্র আলোতে চোখ খুলতে অসুবিধা হয়।
নিয়াসিন বা নিকোটিনিক এসিড (B5)	মাংস, যকৃৎ, আটা, ডাল, বাদাম, তেলবীজ, ছোলা, শাক-সবজি।	এর অভাবে পেলেগ্রা রোগ হয়। পেলেগ্রা রোগে ত্বকে রঞ্জক পদার্থ জমতে শুরু হয় এবং সূর্যের আলোয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ফলে ত্বকে লালচে দাগ পড়ে এবং ত্বক খস খসে হয়ে যায়। এছাড়া জিভে রঞ্জক পদার্থ জমে জিভের এট্রোফি হয়।
পিরিডক্সিন (B6)	চাল, আটা, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ছোলা, ছত্রাক, বৃক্ক, ডিমের কুসুম।	এর অভাবে খাওয়ায় অরুচি, বমিভাব ও অ্যানিমিয়া রোগ দেখা দেয়।
কোবালামিন বা সায়ানোকোবালামিন (B12)	যকৃৎ, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম, পনির, বৃক্ক প্রভৃতি।	এর অভাবে রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

ভিটামিন C (অ্যাসকরবিক এসিড)

টাটকা শাক-সবজি এবং টাটকা ফলে ভিটামিন C পাওয়া যায়। শাক-সবজির মধ্যে মুলাশাক, লেটুস পাতা, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, কাঁচা মরিচ, ফুলকপি, করলা ইত্যাদিতে ভিটামিন C আছে। ফলের মধ্যে আমলকী, লেবু, কমলালেবু, টমেটো, আনারস, পেয়ারা ইত্যাদি ভিটামিন C— এর উৎস। শুকনো ফল ও বীজে এবং টিনজাত খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে না।

ভিটামিন C শরীরে যেসব কাজ করে সেগুলো হলো:

১. ত্বক, হাড়, দাঁত ইত্যাদির কোষসমূহকে পরস্পরের সাথে জোড়া লাগিয়ে মজবুত গাঁথুনি তৈরি করে।

২. শরীরের ক্ষত পুনর্গঠনের কাজে সাহায্য করে।

৩. দাঁত ও মাড়ি শক্ত রাখে।

৪. স্নেহ, আমিষ ও অ্যামাইনো এসিডের বিপাকীয় কাজে ভিটামিন C গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৫. ত্বক মসৃণ এবং উজ্জ্বল রাখে।

৬. রোগ প্রতিরোধ করে।

ভিটামিন C— এর তীব্র অভাবে স্কার্ভি (দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া) রোগ হয়। এর অভাবে (ক) অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হতে পারে না। (খ) ত্বকে ঘা হয়, ক্ষত শুকাতে দেরি হয়। (গ) দাঁতের মাড়ি ফুলে দাঁতের ইনামেল উঠে যায়। দাঁত দুর্বল হয়ে অকালে ঝরে পড়ে। (ঘ) রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে গিয়ে সহজে ঠান্ডা লাগে।

একক কাজ

কাজ: আমরা যে ভিটামিনগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম, দেহে সেগুলোর অভাব হলে কী কী রোগ দেখা দিতে পারে তার একটা চার্ট প্রস্তুত করো।

১.১.৫ খনিজ পদার্থ এবং পানি

জীবদেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি এবং পুষ্টির জন্য ভিটামিনের মতো খনিজ পদার্থ বা খনিজ লবণও খুবই প্রয়োজনীয়। খনিজ পদার্থ প্রধানত কোষ গঠনে সাহায্য করে। প্রাণীরা প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে খনিজ পদার্থ পায়। আমরা শাকসবজি, ফলমূল, দুধ, ডিম, মাছ এবং পানীয় জলের মাধ্যমে আমাদের খনিজ পদার্থের চাহিদা পূরণ করি। নিচে শরীরের প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ খনিজ উপাদানগুলোর উৎস, পুষ্টিগত গুরুত্ব এবং অভাবজনিত সমস্যাগুলোর কথা উল্লেখ করা হলো:

লৌহ (Fe)

লৌহ রক্তের একটি প্রধান উপাদান। প্রতি ১০০ mL রক্তে লৌহের পরিমাণ প্রায় ৫০ mg। যকৃৎ, প্লীহা, অস্থিমজ্জা এবং লোহিত রক্তকণিকায় এটি সঞ্চিত থাকে। লৌহের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে ফুলকপির পাতা, নটেশাক, নিম পাতা, ডুমুর, কাঁচা কলা, ভুট্টা, গম, বাদাম, বজরা ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে মাছ, মাংস, ডিম, যকৃৎ ইত্যাদি। লৌহের প্রধান কাজ হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করা। হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ

কমে গেলে রক্তশূন্যতা রোগ হয়। রক্তশূন্যতা রোগের লক্ষণ চোখ ফ্যাকাসে হওয়া, হাত-পা ফোলা, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বুক ধড়ফড় করা ইত্যাদি।

ক্যালসিয়াম (Ca)

এটি প্রাণীদের হাড় এবং দাঁতের একটি প্রধান উপাদান। মানুষের শরীরের মোট ওজনের শতকরা দুই ভাগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থের মধ্যে দেহে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। অস্থি এবং দাঁতে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের সাথে যুক্ত হয়ে এর ৯০% শরীরে সঞ্চিত থাকে। রক্তে এবং লসিকাতে এর উপস্থিতি লক্ষণীয়। ক্যালসিয়ামের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে: ডাল, তিল, সয়াবিন, ফুলকপি, গাজর, পালংশাক, কচুশাক, লালশাক, কলমিশাক, বাঁধাকপি এবং ফল। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: দুধ, ডিম, ছোট মাছ, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি।

হাড় এবং দাঁতের গঠন শক্ত রাখার জন্য ক্যালসিয়াম একটি অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ। এ ছাড়া ক্যালসিয়াম রক্ত সঞ্চালনে, হৃৎপিণ্ডের পেশির স্বাভাবিক সংকোচনে এবং স্নায়ু ও পেশির সঞ্চালনে সাহায্য করে। ক্যালসিয়ামের অভাবের কারণে রিকেটস এবং বয়স্ক নারীদের অস্টিওম্যালেসিয়া রোগ হয়। এর অভাবে শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হয় এবং তাদের রক্ত সঞ্চালনে বিঘ্ন ঘটে।

ফসফরাস (P)

দেহে পরিমাণের দিক থেকে খনিজ লবণগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের স্থান। ফসফরাসও ক্যালসিয়ামের মতো হাড়ের একটি প্রধান উপাদান। ফসফরাস হাড়, যকৃৎ এবং রক্তরসে সঞ্চিত থাকে। নিউক্লিক এসিড, নিউক্লিয় প্রোটিন তৈরি এবং শর্করা বিপাকের দ্বারা শক্তি উৎপাদনে ফসফরাস প্রধান ভূমিকা রাখে।

ফসফরাসের উদ্ভিজ্জ উৎস হচ্ছে: দানা শস্য, শিম, বরবটি, মটরশুঁটি, বাদাম ইত্যাদি। প্রাণিজ উৎস হচ্ছে: ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা ইত্যাদি।

ক্যালসিয়ামের মতো হাড় এবং দাঁত গঠন করা ফসফরাসের প্রধান কাজ। ফসফরাসের অভাবে রিকেটস, অস্থিক্ষরতা, দন্তক্ষয়— এইসব রোগ দেখা দেয়। খাবারে পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রোটিন ও ক্যালসিয়াম থাকলে ফসফরাসের অভাব হয় না।

পানি (Water)

পানি খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। মানবদেহের জন্য পানি অপরিহার্য। দেহের গঠন এবং অভ্যন্তরীণ কাজ পানি ছাড়া চলতে পারে না। আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০%-৭৫% হচ্ছে পানি। আমাদের রক্ত, মাংস, স্নায়ু, দাঁত, হাড় ইত্যাদি প্রতিটি অঙ্গ গঠনের জন্য পানির প্রয়োজন।

২০২৫

দেহকোষ গঠন এবং কোষের যাবতীয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া পানি ছাড়া কোনোভাবেই সম্পন্ন করা সম্ভব

না। পানির মাধ্যমে শরীর গঠনের নানা প্রয়োজনীয় উপাদান শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পরিবাহিত হয়। এটি জীবদেহে দ্রাবকের কাজ করে, খাদ্য উপাদানের পরিপাক ও পরিশোষণে সাহায্য করে। বিপাকের ফলে দেহে উৎপন্ন ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত পদার্থগুলোকে পানি মূত্র ও ঘাম হিসেবে শরীর থেকে বের করে দেয়। এ ছাড়া পানি শরীর থেকে ঘাম নিঃসরণ এবং বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

শরীরে পানির উৎস :

১. খাবার পানি, পানীয় যেমন: চা, দুধ, কফি, শরবত।

২. বিভিন্ন খাদ্য যেমন: শাক-সবজি ও ফল।

শরীর থেকে মোট নির্গত পানির পরিমাণ গৃহীত পানির পরিমাণের সমান হলে শরীরে পানির সমতা বজায় থাকে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দৈনিক ২-৩ লিটার পানি পান করা উচিত, কারণ প্রায় ঐ পরিমাণ পানি প্রত্যেকদিনই আমাদের শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

গরম আবহাওয়ায়, কঠোর পরিশ্রমে দেহে পানির অভাব দেখা দেয়। এ সময় পানি পানের পরিমাণ বাড়ানো উচিত। ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণে না থাকলে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণে শরীরে পানির অভাব হতে পারে। শরীরে পানির অভাব হলে তীব্র পিপাসা হয়, রক্ত সঞ্চালনে ব্যাঘাত ঘটে, ত্বক কুঁচকে যায়। পানির অভাবে স্নায়ু ও পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। দেহে অম্ল ও ক্ষারের সমতা নষ্ট করে এসিডোসিস রোগের সৃষ্টি হয়। শরীরে পানি ১০% কমে গেলে সংজ্ঞা লোপ পায়, এমনকি মৃত্যুও ঘটতে পারে। অত্যধিক বমি, ডায়রিয়া ইত্যাদি কারণেও শরীর থেকে অনেক পানি বের হয়ে যেতে পারে। শরীরে পানির অভাব নিরসনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হয়। শরীর থেকে যে পরিমাণ পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, খাবার স্যালাইন তা পূরণ করে শরীরে পানি ও লবণের ভারসাম্য ঠিক রাখে। (বাসায় খাবার স্যালাইন না থাকলে এক চিমটি লবণ, এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং এক গ্লাস পানি মিশিয়ে খাবার স্যালাইন তৈরি করা যায়।)

১.১.৬ রাফেজ বা আঁশ

এখন পর্যন্ত যে সকল খাদ্য উপাদান নিয়ে কথা বলা হয়েছে, তার বাইরেও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ খাদ্য উপাদান হচ্ছে রাফেজ বা আঁশযুক্ত খাবার। রাফেজ প্রধানত উদ্ভিদ থেকে পাওয়া যায়। শস্যবীজ, ডাল, আলু, খোসাসমেত টাটকা ফল এবং শাক-সবজি রাফেজের প্রধান উৎস। এগুলো ছাড়াও শুকনা ফল, জিরা, ধনে, মটরশুঁটি প্রভৃতিতে বেশ ভালো পরিমাণ রাফেজ পাওয়া যায়। এই খাবারগুলোর দীর্ঘ তন্তুময় অংশকে রাফেজ বলে। রাফেজ মূলত সেলুলোজ দিয়ে তৈরি উদ্ভিদের কোষপ্রাচীর। রাফেজ আমাদের দেহে কোনো পুষ্টি যোগায় না সত্যি কিন্তু কোষ্ঠকাঠিন্য, হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধ

করতে সাহায্য করে। তবে ঠিক কীভাবে এ রোগগুলো প্রতিরোধ করে তা এখন পর্যন্ত সুস্পষ্টভাবে জানা যায়নি। রাফেজ সরাসরি খাদ্যনালির মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হতে পারে। এটি খাদ্যনালির গায়ে কোনোরূপ পিণ্ড তৈরি করে না বলে রোগ প্রতিরোধ করতে পারে।

রাফেজভুক্ত খাবারের গুরুত্ব

১. এটি পরিপাকে সহায়তা করে। রাফেজ পানি শোষণ করে এবং মলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে।

২. শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

৩. এটি শরীরের অতিরিক্ত চর্বি কমাতে সাহায্য করে।

৪. বারবার ক্ষুধার প্রবণতা কমাতে এটি কাজ করে।

৫. ধারণা করা হয়, রাফেজযুক্ত খাদ্য গ্রহণে পিত্তথলির রোগ, খাদ্যনালি ও মলাশয়ের ক্যান্সার, অর্শ, অ্যাপেন্ডিকস, হৃদ্‌রোগ ও স্থূলতা অনেকাংশে হ্রাস করে।

এ কারণে প্রতিদিন ২০-৩০ গ্রাম আঁশযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। শাক-সবজি ও ফল থেকে এ পরিমাণ আঁশ পাওয়া সম্ভব।

১.২ বডি মাস ইনডেক্স (BMI) বা দেহের ভরসূচি

শিশু জন্মগ্রহণের পর তার দেহের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং পরবর্তীকালে শৈশব, কৈশোর পার হয়ে যৌবন ও প্রাপ্তবয়স্কে উপনীত হয়। মানবদেহের বৃদ্ধি ২০-২৪ বছর পর্যন্ত ঘটে এবং তারপর আর উচ্চতার বৃদ্ধি হয় না। তখন খাদ্যের কাজ হয় শুধু দেহের ক্ষয়পূরণ এবং দেহকে সুস্থ, সবল এবং নীরোগ রাখা। প্রাপ্তবয়সে সুস্বাস্থ্যের জন্য দেহের উচ্চতার সাথে দেহের ওজনের একটা সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়। দেহের উচ্চতার সাথে ওজনের সামঞ্জস্য রক্ষা করার সূচককে বিএমআই (BMI: Body Mass Index) বা ভরসূচি বলা হয়। উচ্চতার সাথে যদি দেহের ওজনের সামঞ্জস্য থাকে, তবেই পুষ্টিগত দিক থেকে শরীর সুস্থ বলা হয়।

বিএমআইয়ের সূত্র হচ্ছে:

$$\text{দেহের ওজন (কেজি)}/[\text{দেহের উচ্চতা (মিটার)}]^2$$

অর্থাৎ দেহের ওজনকে দেহের উচ্চতার বর্গ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে, সেটি হবে সেই ব্যক্তির বিএমআই বা ভরসূচি।

উদাহরণ

ধরা যাক একজনের দেহের ওজন ৮০ কেজি এবং উচ্চতা ১.৮ মিটার তাহলে
বিএমআই = ৮০/(১.৮ × ১.৮) = ২৪.৭ (প্রায়)

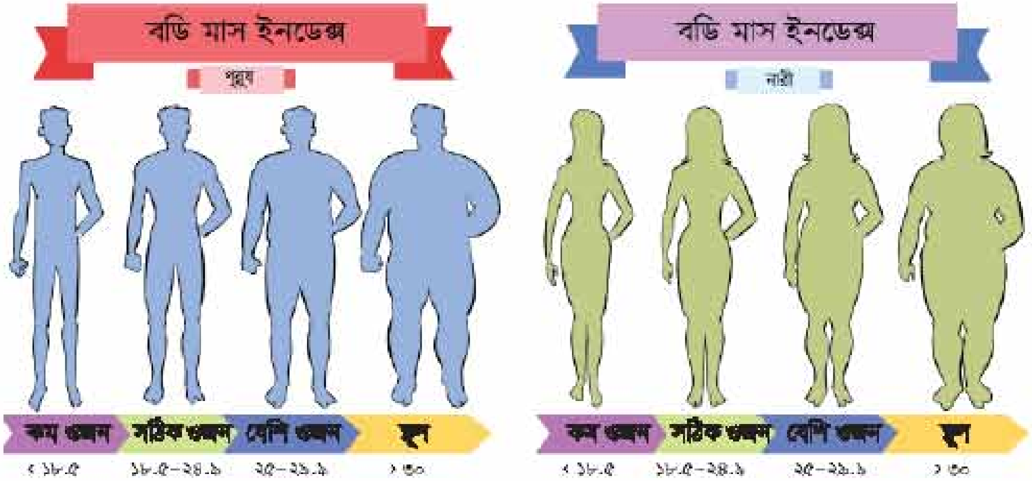

চিত্র ১.০২: বডি মাস ইনডেক্স

আমাদের দেহে চর্বির পরিমাণের নির্দেশক হচ্ছে বিএমআই। ১.০২ চিত্রে দেখানো হয়েছে ২৫ হচ্ছে সুস্থ এবং স্বাভাবিক বিএমআই। এর কম হলে একজনকে কম ওজন এবং বেশি হলে তাকে স্থূলকায় বলে বিবেচনা করা যাবে।

দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের শ্রেণির সবার বিএমআই বের করে সেটি গ্রাফে ছক (চিত্র ১.০৩) হিসেবে দেখাও। তোমাদের শ্রেণির গড় বিএমআই কত।

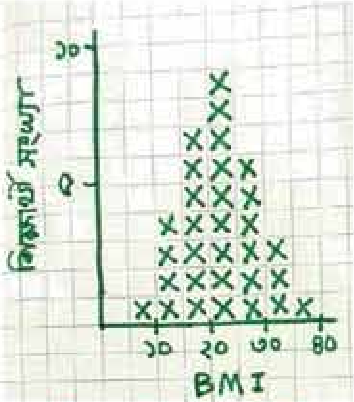

চিত্র ১.০৩: বিএমআই এবং শিক্ষার্থী সংখ্যার ছক

১.৩ দৈনিক খাবার কেমন হবে

এ অধ্যায়ে পুষ্টিগত গুরুত্ব আলোচনার সময় আমরা ক্যালরি ও কিলোক্যালরি সম্বন্ধে ধারণা পেয়েছি। একজন পূর্ণবয়সের শারীরিক পরিশ্রম করা মানুষের দৈনিক ২০০০-২৫০০ কিলোক্যালরি খাবার গ্রহণ করা উচিৎ। ভিটামিন, খনিজ লবণ এবং রাফেজ বা আঁশের জন্য এর সাথে প্রয়োজনীয় শাক-সবজি এবং ফল খাওয়া প্রয়োজন।

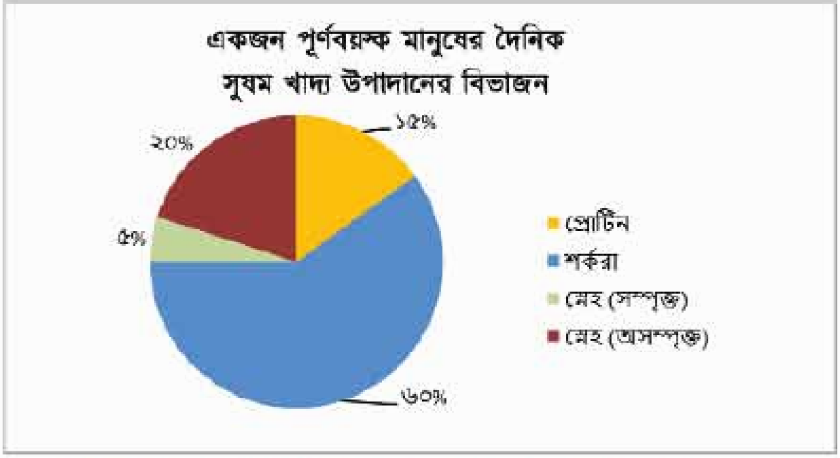

চিত্র ১.০৪: একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক সুষম খাদ্যের বিভাজন

একক কাজ

কাজ: ইলিশ মাছ, মুরগির ডিম, চর্বিযুক্ত মাংস, মসুর ডাল, দই, ভাত, গোল আলু, চিনি, তেল, মিষ্টি কুমড়া, ফুলকপি, টমেটো, ছোট মাছ, ছোলা, আইসক্রিম, রুটি, মধু, ঘি, পুঁইশাক, কাঁঠাল, আম।

উপরে আমাদের অতিপরিচিত ২১ প্রকার খাদ্য আছে। এ খাদ্যগুলো নিয়ে নিচের টেবিলে খাদ্যের উপাদানের একটি তালিকা তৈরি করো।

শর্করা	আমিষ	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন ও খনিজ লবণ	
			শাক-সবজি	ফল

এবার খাবারগুলোকে কম দাম এবং বেশি দাম হিসেবে বিভক্ত কর। তুমি একটি স্বল্পমূল্যের ও একটি অধিক মূল্যের খাদ্যতালিকা প্রস্তুত কর।

খাদ্যতালিকা

খাদ্য উপাদানের নাম	কম দামের খাদ্যের নাম	বেশি দামের খাদ্যের নাম
১. শর্করা ২. আমিষ ৩. স্নেহ ৪. ভিটামিনসমৃদ্ধ তরকারি/ ফল ৫. খনিজ লবণযুক্ত তরকারি/ ফল		

উপরের টেবিলটি থেকে তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ ভালো এবং স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হলেই যে অনেক দামি খাবার খেতে হয় সেটি সত্যি নয়। আমরা সঠিকভাবে পরিকল্পনা করে অনেক কম খরচেই অনেক স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে পারি।

১.৩.১ সুষম খাদ্য

খাদ্য কী এবং খাদ্যের উপাদানসমূহ কী কী, আমরা সেটি এর মাঝে জেনে গেছি। প্রয়োজন থেকে কম খেলে যেরকম আমাদের স্বাস্থ্যহানি হয়, ঠিক সেরকম প্রয়োজন থেকে বেশি খেলেও স্বাস্থ্যহানি হয়। বেশি খেয়ে স্থূলকার হয়ে যাওয়া উন্নত বিশ্বের মানুষের একটি বড় সমস্যা। তাই আমাদের শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য সব সময় সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন।

সুষম খাদ্য বলতে কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যবস্তুকে বোঝায় না। যে খাদ্যে ছয়টি উপাদানই গুণাগুণ অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং যে খাদ্য গ্রহণ করলে দেহে স্বাভাবিক কাজ-কর্মের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালরি পাওয়া যায়, তাকে সুষম খাদ্য (বা ব্যালান্সড ডায়েট) বলে। যেমন: একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রতিদিন প্রায় ২৫০০ এবং নারীর বেলায় ২০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন। এ শক্তি বা ক্যালরি আমরা খাদ্য থেকে পাই। সেজন্য আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় এমন ধরনের খাদ্য থাকা দরকার, যাতে সে খাদ্যের মধ্যে ছয়টি উপাদানই সঠিক পরিমাণে থাকে।

সুষম খাদ্যতালিকা তৈরির সময় মানুষের বয়স, লিঙ্গভেদ, কী রকম কাজ করে (অর্থাৎ অধিক পরিশ্রমী, মাঝারি পরিশ্রমী নাকি স্বল্প পরিশ্রমী) ইত্যাদি বিবেচনা করা দরকার। শিশু ও বৃদ্ধদের খাদ্যতালিকায়

২০২১

সহজপাচ্য এবং চর্বি বর্জিত খাদ্যের প্রাধান্য থাকতে হবে। বাড়ন্ত শিশুদের ক্ষেত্রে প্রোটিনজাতীয় খাদ্য এবং হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসসমৃদ্ধ খাদ্য থাকতে হবে। গর্ভবতী নারীদের খাদ্যতালিকায় রক্ত উৎপাদনের জন্য এবং ভ্রূণস্থ শিশুর বৃদ্ধির জন্য বাড়তি প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও আয়োডিন থাকা খুবই প্রয়োজন। কোনো নির্দিষ্ট সুষম খাদ্য প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। সুষম খাদ্য তৈরি করে নিতে হয়।

সুষম খাদ্য যেভাবে প্রস্তুত করা হয়

শর্করা	প্রোটিন	স্নেহ পদার্থ	ভিটামিন	খনিজ লবণ
ভাত	মাছ	মাখন	দুধ, ডিম	দুধ
রুটি	মাংস	তেল	ফলমূল	ডিম
চিনি/গুড়	ডিম	ঘি	মাছ, মাংস	শাক-সবজি

সুষম খাদ্য পিরামিড

যেকোনো সুষম খাদ্যতালিকায় শর্করা, শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ এবং স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তোমরা নিশ্চয়ই এর মাঝে লক্ষ করেছ যে একজন কিশোর বা কিশোরী, প্রাপ্ত বয়স্ক একজন পুরুষ বা নারীর সুষম খাদ্যতালিকা লক্ষ করলে দেখা যায় যে তালিকায় শর্করার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শর্করাকে নিচে রেখে পরিমাণ বিবেচনা করে পর্যায়ক্রমে শাক-সবজি, ফলমূল, আমিষ,

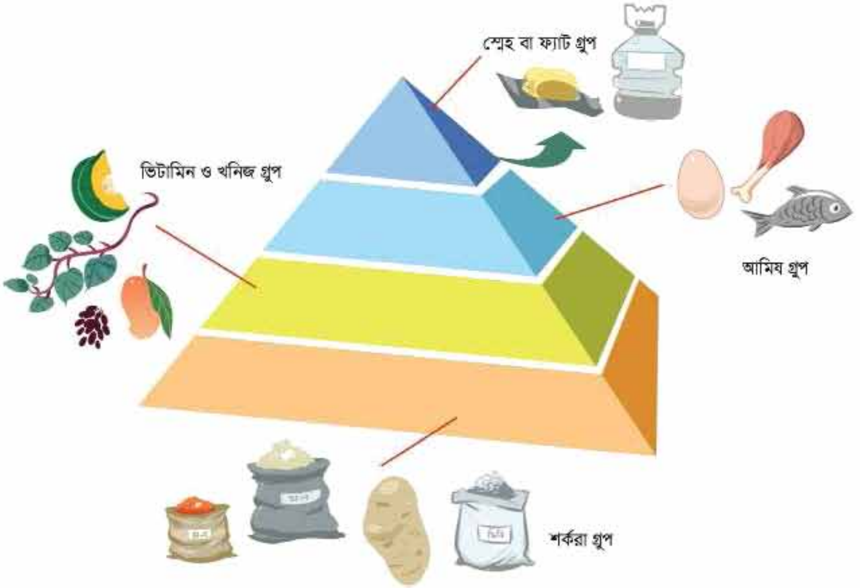

চিত্র ১.০৫: সুষম খাদ্য পিরামিড

স্নেহ ও চর্বি জাতীয় খাদ্যকে সাজালে যে কাল্পনিক পিরামিড তৈরি হয়, তাকে সুষম খাদ্য পিরামিড (চিত্র ১.০৫) বলে। এই পিরামিডের দিকে তাকালেই কোন ধরনের খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

১.৩.২ উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই

সব মানুষের খাদ্যাভ্যাস এক রকম নয়। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক কারণে খাদ্যদ্রব্যের প্রাপ্যতাও সব দেশে এক রকম নয়। শীত ও গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুসারেও খাদ্যের প্রয়োজন এবং পার্থক্য রয়েছে। সকল পরিবেশে মানিয়ে চলাই হচ্ছে জীবনের লক্ষ্য। এ জন্য দেহের গঠন ও বৃদ্ধিতে এবং শরীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো সম্পন্ন করতে মূল খাদ্য উপাদানগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে মূল উপাদানগুলোর পরিমাণ এবং ক্যালরি ভ্যালু বিচার করে উন্নত জীবনযাপনের জন্য খাদ্য উপাদান বাছাই করতে হয়।

আমরা খাদ্য পিরামিডে কোন জাতীয় খাদ্য উপাদান কতটুকু খেতে হয় সেটা দেখিয়েছি। এখন আমরা বলব এই খাদ্য উপাদান ব্যবহার করে কী কী খাদ্য তৈরি করা যায়। যেমন খাদ্য পিরামিডের দেখানো তেল কিংবা মাখন সরাসরি খাওয়া হয় না, সেটি ব্যবহার করে অন্য খাবার প্রস্তুত করা হয়।

পুষ্টি বিশারদগণ এই খাবারকে চারটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন। এগুলো হলো:

১. মাংস, মাছ, ডিম ও ডাল (মটর, ছোলা কিংবা বাদাম)।

২. পনির ও দই।

৩. সকল ভোজ্য ফল এবং খাওয়ার উপযোগী সবজি।

৪. শস্য ও শস্যদানা থেকে তৈরি খাবার যেমন: রুটি, ভাত।

সুষম খাদ্য পেতে হলে প্রতিদিন এই চার শ্রেণির খাদ্য খেতে হবে। এই চার শ্রেণি থেকে খাদ্য নির্বাচনে বৈচিত্র্য থাকা উচিত বলে পুষ্টিবিদগণ মনে করেন।

খাবার তৈরি করার সময় লক্ষ রাখতে হবে সেখানে যেন আমিষ, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ভিটামিন ও খনিজ লবণ থাকে।

সকালের খাবার আমাদের দেশে অত্যন্ত হালকা ধরনের হয়ে থাকে। আজকাল গ্রাম বা শহরে প্রায় সর্বত্রই বয়স্কদের সকালের দিকে চা পান করতে দেখা যায়। চায়ের সাথে অন্তত হালকা কিছু খাবার গ্রহণ করা উচিত। সকাল বেলায় খাবার হিসেবে রুটি, মাখন বা একটি ডিম, একটি কলা খেতে পারলে দেহের যাবতীয় পুষ্টি উপাদানগুলো সংগ্রহ করা সহজ হবে। গরমের দিনে আখের গুড়ের সাথে চিড়া ভিজিয়ে খেলে শরীর সুস্থ থাকে।

আমাদের দেশে দুপুরের খাবারকে সাধারণত প্রধান খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দুপুরের খাবারের খাদ্য উপাদান বাছাইয়ে অবশ্যই সুষম খাদ্যতালিকার সাহায্য নিয়ে সেভাবে খাদ্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। গরমের দেশে মাছ প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস। তবে শীতকালে মাছের সাথে মাংস খাবারের মাঝে বৈচিত্র্য এনে দেবে। খাওয়ার শেষে দই অথবা ফল খাদ্যতালিকায় থাকলে ভালো হয়।

আমাদের দেশে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ও চাকরিজীবীদের অনেকেরই দুপুরে খাবার সময় ঠিক থাকে না। তাই তারা বিকেলে কিছু হালকা খাবার খেয়ে থাকেন। আর্থিক অবস্থা অনুযায়ী বিকেলের জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত, যেন সকল ধরনের খাদ্য উপাদান থাকে।

রাতের খাবার সাধারণত সহজপাচ্য হওয়া উচিত। এজন্য রাতে আমিষজাতীয় খাবার কম খাওয়া ভালো। ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন রাতে শোয়ার আগে আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে দুধ বা অন্য শক্তি উৎপাদক তরল খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। এভাবে খাদ্য বাছাই করে উন্নত জীবন যাপন করা যেতে পারে।

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড হচ্ছে এমন এক ধরনের খাবার, যা স্বাস্থ্যগত উপাদানের পরিবর্তে মুখোরচক স্বাদের জন্য উৎপাদন করা হয়। এগুলো খেতে খুব সুস্বাদু মনে হতে পারে, কিন্তু বেশির ভাগ সময়েই এই খাবার শরীরের জন্য ভালো নয়। সুস্বাদু করার জন্য এতে প্রায়শই অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেগুলো অস্বাস্থ্যকর। ফাস্টফুডে সাধারণত প্রচুর পরিমাণে প্রাণিজ চর্বি ও চিনি থাকে। বার্গার, ফ্রায়েড চিকেন, পিৎজা, চিপস, মচমচে ভাজা খাবার, কেক কিংবা বিস্কুটে উচ্চমাত্রায় প্রাণিজ চর্বি থাকে। সফ্ট ড্রিংক, কোলা কিংবা লেমনের মতো প্যাসীয় পানীয়তে অতিরিক্ত চিনি থাকে। আমরা যখন অধিক পরিমাণে চর্বিজাতীয় খাবার খাই, তখন আমাদের দেহ এগুলোকে চর্বিকলায় রূপান্তরিত করে এবং অধিক পরিমাণে চিনি আমাদের দাঁত ও ত্বককে নষ্ট করে দিতে পারে। ফাস্ট ফুড কখনো সুষম খাদ্যের মধ্যে পড়ে না। ফাস্ট ফুডে আমাদের জন্য দরকারি ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের অভাব রয়েছে। ফাস্ট ফুড খাওয়ার কারণে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের দেহ স্থূলকায় হয়ে পড়ে। প্যাকেট বা কৌটাজাত খাবারের চেয়ে প্রাকৃতিক সজীব খাবার স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো।

একক কাজ

কাজ: কোনো একটি ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবার নিয়ে তার মাঝে কোন কোন খাদ্য উপাদান আছে এবং কোনটি নেই তার তালিকা করো।

১.৪ খাদ্য সংরক্ষণ

প্রাকৃতিক কারণে সব ধরনের খাদ্য সময়ের সাথে নষ্ট বা খাওয়ার অনুপযোগী হয়ে পড়ে। খাদ্য নষ্ট হওয়ার কারণগুলো হচ্ছে: জীবাণু ও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়া এবং পরিবেশের কারণে সেগুলোর দ্রুত বৃদ্ধি, খাদ্যের মধ্যে উৎসেচকের বৃদ্ধি, পরিবেশে আর্দ্রতা, তাপে অম্লের পরিমাণ বৃদ্ধি। এই কারণগুলো এককভাবে খাদ্যকে নষ্ট করে না। কয়েকটি কারণ একত্রে সংগঠিত হয়ে খাদ্য নষ্ট করে। যেমন, পরিবেশে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পেলে জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটে এবং খাবারকে নষ্ট করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে খাদ্যবস্তুর উৎসেচকের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটে খাদ্যকে নষ্ট করে দেয়।

জীবাণু বা ব্যাকটেরিয়া খাদ্য নষ্ট করে সেখানে এক ধরনের বিষাক্ত উপাদান তৈরি করে। এই বিষাক্ত উপাদানগুলোকে টক্সিন বলে। এই টক্সিনগুলো নানা ধরনের হয় এবং কোনো কোনো টক্সিনে আক্রান্ত হওয়াকে আমরা ফুড পয়জনিং বলে থাকি। টক্সিন স্নায়ুতন্ত্রকে আক্রমণ করে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটাতে পারে।

ইস্টজাতীয় ছত্রাক ফলের রস, টমেটোর সস, জেলি, মিষ্টি আচার, শরবত ইত্যাদি খাবার দ্রুত নষ্ট করে ফেলে। এতে খাবারে টক গন্ধ হয় এবং ঘোলাটে হয়ে যায়। যদি পাউরুটি কয়েক দিন খোলা স্থানে রাখা যায়, তাহলে দেখা যায় এর ওপর ধূসর বর্ণের আবরণ তৈরি হয়েছে। এটি মোলড জাতীয় ছত্রাক (যেমন: মিউকর, এসপারজিলাস) দ্বারা আক্রান্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। কমলালেবু, টমেটো, পনির, আচার প্রভৃতি টকজাতীয় খাবার এগুলোর দ্বারা সহজে নষ্ট হয়।

খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা এক ঋতুর ফল, শস্য, সবজি, মাছ এবং অন্যান্য খাদ্য অন্য ঋতুতেও পেতে পারি। বছরের কোনো একটি সময়ে ও স্থানে কোনো ফসলের উৎপাদন বেশি হলে তা সংরক্ষণের মাধ্যমে অন্য সময়ে ব্যবহার, বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর বা রপ্তানি করতে পারি। কাজেই খাদ্যের গুণগত মান ঠিক রেখে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে আমরা সংরক্ষণ করে আমরা আমাদের খাদ্যঘাটতি মেটাতে পারি।

১.৪.১ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

খাদ্য নষ্ট হয় জীবাণু বৃদ্ধি ও জীবাণু দ্বারা নিঃসৃত উৎসেচকের ক্রিয়ার কারণে। পানি ও উষ্ণতা জীবাণু বৃদ্ধি ও উৎসেচকের ক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য খুবই উপযোগী অবস্থা। ফলে এ অবস্থা খাদ্যকে দ্রুত পচনে প্রভাবিত করে। পচনের সাহায্যকারী এসব বিষয়কে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করা গেলে খাদ্য বহুদিন পর্যন্ত সংরক্ষণ করা সম্ভব।

বিশেষ কিছু ব্যবস্থা অবলম্বন করে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাত করা হয়। আমাদের বাসায় সাধারণ সংরক্ষক দ্রব্যের ও যন্ত্রপাতির ব্যবহারে খাদ্য সংরক্ষণ করা হয়। এরকম কয়েকটি

পদ্ধতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো:

১. শুষ্ককরণ: খাদ্যবস্তুকে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শুষ্ককরণ পদ্ধতিতে খাদ্যবস্তু থেকে পানি শুকিয়ে ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্ম এবং এনজাইম ক্রিয়াকে প্রতিহত করা যায়। খাদ্যকে অনেক দিন পর্যন্ত এভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

২. রেফ্রিজারেশন: রেফ্রিজারেশন পদ্ধতিতে কাঁচা শাক-সবজি, ফল, রান্না করা খাদ্য, মিষ্টিজাতীয় খাবার কিছুদিন পর্যন্ত রাখা যায়। এ পদ্ধতিতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি ও এনজাইমের ক্রিয়া, কোনোটাই দীর্ঘদিনের জন্য প্রতিরোধ করা যায় না।

৩. ফ্রিজিং: ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যকে ও খাদ্যদ্রব্যকে 0° ফারেনহাইট অথবা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়। এ পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্য দীর্ঘদিন ভালো থাকে। ফ্রিজিং পদ্ধতিতে শুধু টাটকা শাক-সবজি, ফল, ফলের রস, মাছ, মাংস সংরক্ষণ করা হয় না, এ পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত খাবার, আইসক্রিম এবং বিভিন্ন রকমের তৈরি খাবারও সংরক্ষণ করা যায়।

৪. সংরক্ষক দ্রব্য: রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যের পচন রোধ করা যায়। এগুলোকে সংরক্ষক (Preservative) বলে। খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করা এবং খাদ্যে যেন ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে না পারে সেজন্য রাসায়নিক সংরক্ষক ব্যবহার করা হয়। এগুলোর কোনো পুষ্টিগুণ নেই। সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে খাদ্যে সংরক্ষক প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রাসায়নিক সংরক্ষকের নাম নিচে উল্লেখ করা হলো: এগুলোর সঠিক পরিমাণের মাত্রা জেনে সংরক্ষণ খাদ্যে প্রয়োগ করা উচিত। রাসায়নিক সংরক্ষক পদার্থগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং ব্যবহারও বিভিন্ন রকম।

(ক) ভিনেগার আমাদের অতিপরিচিত। আচার, চাটনি, সস প্রভৃতিতে ভিনেগার ব্যবহার করে জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করা হয়। এসেটিক এসিডের ৫% দ্রবণকে ভিনেগার বলে।

(খ) সালফেটের লবণ যেমন Sodium bisulphite অথবা Potassium-meta bisulphite ব্যবহার করে ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ও অন্যান্য অণুজীবের বৃদ্ধি প্রতিরোধ করা যায়।

(গ) Sodium benzoate, এটি Benzoic Acid— এর লবণ। এটি বিশেষ করে ছত্রাক ইস্ট এর বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium benzoate খুব উপযোগী।

উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ছাড়া Propionic Acid— এর লবণ এবং Sorbic Acid— এর লবণ Sorbates ব্যবহার করে দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়।

২০২১ উপরে উল্লিখিত রাসায়নিক সংরক্ষকগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে

ব্যবহার করতে হয়। এই রাসায়নিক পদার্থগুলোকে নির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার না করে যদি যথেচ্ছ ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেগুলো মানবদেহে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।

৫. চিনি বা লবণের দ্রবণে সংরক্ষণ: চিনি ও লবণের দ্রবণ খাদ্যসংরক্ষক হিসেবে বহুবছর পূর্ব থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। লবণের দ্রবণকে ব্রাইন বলে। চিনি ও লবণের ঘন দ্রবণ বহি-অভিস্রবণের দ্বারা অণুজীবগুলোকে ধ্বংস করে খাদ্যকে পচন থেকে রক্ষা করে।

চিনি প্রয়োগ করে ফলের জ্যাম, জেলি ও মারমালেড তৈরি হয়। পেয়ারা, আপেল, আনারসজাতীয় ফলকে কেটে পরিষ্কার করে চিনির ঘণ দ্রবণে রেখে বায়ু নিরোধী করে দীর্ঘদিন রাখা যায়।

সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহারের আগে যদি খাদ্যের রঙের পরিবর্তন ঘটে অথবা খাদ্য ফুলে উঠে, খাদ্যের উপর সাদা অথবা কালো আন্তরণ সৃষ্টি হয় এবং খাদ্যের ওপরটা পিচ্ছিল হয়ে যায় তাহলে বুঝতে হবে খাদ্যে পচনক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। এ ধরনের খাদ্য গ্রহণ করা যাবে না, কারণ তাহলে ফুড পয়জনিং হতে পারে।

১.৪.২ খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া

বর্তমানে দুধ, ফল, মাছ এমনকি মাংসকে পচন থেকে রক্ষা করার জন্য যথেচ্ছ ফরমালিন নামক বিষাক্ত একটি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের জন্য এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। কিন্তু আমাদের দেশে কিছু অসাধু ও বিবেকবর্জিত ব্যবসায়ী তারপরও ফরমালিনকে খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার করছে। এর দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে বদহজম, পাতলা পায়খানা, পেটের নানা পীড়া, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার ও কিডনি নষ্ট হওয়াসহ ক্যান্সারের মতো মরণব্যাধি হতে পারে। ফরমালিন দীর্ঘমেয়াদি ব্যবহারে মেয়েদের গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ পর্যন্ত হতে পারে।

বিভিন্ন ফল যেমন: আম, টমেটো, কলা ও পেঁপে যেন দ্রুত পাকে, তার জন্য Ripen এবং Ethylene নামক রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হচ্ছে। এগুলো ফল পাকানোর জন্য ব্যবহার করলে সে ফলকে ৭-৮ দিন পর বাজারজাত করা উচিত। কিন্তু তা না করে অনেক সময় ২-৩ দিনের মধ্যে বাজারজাত করা হয়। এতে রাসায়নিক পদার্থগুলোর কার্যকারিতা থেকে যায় এবং এ ধরনের ফল খাওয়ার ফলে মানবশরীরে জটিল রোগ সৃষ্টি হতে পারে।

ফল পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড নামক এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থকে ব্যবহার করা হয়। এটি এমন ধরনের যৌগ, যা বাতাসের বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসেই উৎপন্ন করে অ্যাসিটিলিন গ্যাস, যা পরবর্তীকালে অ্যাসিটিলিন ইথানল নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এটি স্বাস্থ্যের ভয়নক ক্ষতি করে।

আম যেন দ্রুত না পাকে এবং গাছে দীর্ঘদিন থাকে, সে জন্য আমাদের দেশে কিছু আম ব্যবসায়ী কালটার (Culter) নামের হরমোন জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ গাছে স্প্রে করে। এতে ফল দ্রুত পরিপক্ব হয় এবং

না পেকে দীর্ঘদিন গাছে থাকে। এটিও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

এসব বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার প্রতিরোধ করার জন্য ভোক্তা অধিকার রক্ষায় ভোক্তা আইন আরও কঠিনভাবে প্রয়োগ করার জন্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এ ধরনের ফল না কেনার জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে। যারা এ ধরনের রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করে খাদ্য সংরক্ষণ করে এবং ফল পাকায়, তাদের বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে। এ ব্যাপারে ভ্রাম্যমাণ আদালত এবং জনগণের সচেতনতা সবচেয়ে বেশি কার্যকর প্রভাব ফেলতে পারে।

১.৫ তামাক ও ড্রাগস

তামাক গাছের পাতা ও ডাল শুকিয়ে তামাক তৈরি হয়। শুকনা তামাকপাতা কুচি কুচি করে কেটে তাকে বিশেষ কাগজে মুড়িয়ে সিগারেট এবং পাতায় মুড়িয়ে বিড়ি ও চুরুট বানানো হয়। এগুলোকে পুড়িয়ে তার ধোঁয়া ও বাষ্প সেবনকে ধূমপান বলে। তামাক থেকে নিকোটিন নামক পদার্থ বের হয়, যা মাদকদ্রব্য হিসেবে নার্ভকে যেমন সাময়িকভাবে উত্তেজিত করে, তেমনি নানাভাবে শরীরের ক্ষতি করে। ধূমপান করলে নিকোটিন ছাড়াও আরও কিছু বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করে। ধূমপানের ধোঁয়ায় উল্লেখযোগ্য বিষাক্ত গ্যাস ও রাসায়নিক পদার্থ এবং মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণ থাকে। এই পদার্থগুলো রক্তের হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন বহনক্ষমতা কমিয়ে দেয়। এছাড়া কতগুলো আঠালো পদার্থ ও হাইড্রোকার্বন প্রভৃতি এতে থাকে, যা ফুসফুসে নানা ধরনের ব্যাধি (চিত্র ১.০৬), এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করে।

১.৫.১ ধূমপানের ক্ষতিকর দিক

আমাদের সবচেয়ে পরিচিত মাদক হচ্ছে ধূমপান। ধূমপানের ফলে মানবদেহে যেসব ক্ষতিকারক অবস্থা ও রোগ দেখা দেয় সেগুলো হলো:

চিত্র ১.০৬: যেসব লোক ধূমপান করে না (বাঁয়ে) তাদের ফুসফুস এবং ধূমপায়ীদের (ডানে) ফুসফুস

১. ধূমপায়ীরা অন্যদের থেকে বেশি রোগাক্রান্ত হয়।

২. ধূমপায়ীরা কোনো না কোনো রোগে ভোগে যেমন: ফুসফুস ক্যান্সার, ঠোঁট, মুখ, ল্যারিংক্স, গলা ও মূত্রথলির ক্যান্সার, ব্রংকাইটিস, পাকস্থলীতে ক্ষত এবং হৃদ্‌যন্ত্র ও রক্তঘটিত রোগ। ফুসফুসে ক্যান্সার দেখা দিলে রোগী প্রায় ৫ বছরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করে।

৩. সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা বেশি ধূমপান করে, তাদের আয়ু কমে যায়।

৪. যেসব লোক ধূমপান করে না অথচ ধূমপায়ীদের কাছাকাছি থেকে ধূমপায়ীর নির্গত ধোঁয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তাদেরও শারীরিক ক্ষতি হয়।

১.৫.২ ধূমপান ও তামাকজাত পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে প্রচেষ্টাসমূহ

১. বাস, রেল, খোলা স্থানে, রেস্তোরাঁয়, অফিস, হাসপাতাল, রেলস্টেশন প্রভৃতি এলাকায় ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যেখানে সেখানে ধূমপান করা এখন আইনত দণ্ডনীয় এবং আমাদের দেশে এর জন্য সুনির্দিষ্ট আইনও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই আইনের সঠিক প্রয়োগ না থাকার কারণে মানুষ এখনো যেখানে সেখানে ধূমপান করে আশপাশের বায়ুকে দূষিত করে যাচ্ছে। প্রচলিত আইনকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করা আবশ্যক। এ ব্যাপারে সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে হবে।

২. বিক্রয়যোগ্য তামাকজাত পদার্থের মোড়কে "ধূমপান বিষপান" বা "ধূমপান শরীরের জন্য ক্ষতিকর" কথাগুলো ছাপানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩. তামাক ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

৪. স্কুল, কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নিকটে সিগারেট ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন ও বিক্রয় সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন।

১.৬ ড্রাগ আসক্তি

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ড্রাগের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এই সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, ড্রাগ এমন কিছু পদার্থ, যা জীবিত প্রাণী গ্রহণ করলে তার এক বা একাধিক স্বাভাবিক আচরণের পরিবর্তন ঘটে।

ড্রাগকে সাধারণ ভাষায় আমরা মাদক বলি। ক্রমাগত মাদকদ্রব্য সেবনের কারণে যখন এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় যে মাদকদ্রব্যের সাথে মানুষের এক ধরনের দৈহিক ও মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং নিয়মিতভাবে মাদক গ্রহণ না করলে শারীরিক এবং মানসিক সমস্যায় পড়ে, তখন তাকে বলে মাদকাসক্ত বা ড্রাগ নির্ভরতা (চিত্র ১.০৭)।

উল্লেখযোগ্য ড্রাগ যেগুলোর ওপর মানুষের আসক্তি সৃষ্টি হয়, সেগুলো হচ্ছে বিড়ি, সিগারেট, আফিম ও আফিমজাত পদার্থ, হেরোইন, মদ, পেথিড্রিন, বারবিচুরেট, কোকেন, ভাং, চরস, ম্যারিজুয়ানা, এলএসডি ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে হেরোইন একটি মারাত্মক ড্রাগ।

ড্রাগের ওপর কোনো ব্যক্তির আসক্তি নানাভাবে জাগতে পারে, যেমন: কৌতূহল, সঙ্গদোষ, হতাশা দূর করার প্রচেষ্টা, মানসিক যন্ত্রণা ভুলে থাকার পদ্ধতি, নিজেকে বেশি কার্যক্ষম করা, পারিবারিক অশান্তি থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা কিংবা পারিবারিক অভ্যাসগত। বাবা বা মা কোনো মাদকে আসক্ত থাকলে তার থেকে সন্তানে ওই মাদকে আসক্ত হওয়ার সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা থাকে।

চিত্র ১.০৭: মাদকাসক্তি একজনের জীবন পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়।

১.৬.১ মাদকাসক্তির লক্ষণ

যে ব্যক্তি মাদকদ্রব্যে আসক্ত, তার মধ্যে কতগুলো লক্ষণ প্রকাশ পায়। অনেকগুলো লক্ষণ সাধারণত স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে দেখা যায় না। উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলো হলো এরকম:

১. খাওয়ার প্রতি আকর্ষণ কমে যাওয়া

২. সবসময় অগোছালোভাবে থাকা

৩. দৃষ্টিতে অস্বচ্ছতা এবং চোখ লাল হওয়া

৪. কোনো কিছুতে আগ্রহ না থাকা এবং ঘুম না হওয়া

৫. কর্মবিমুখতা ও হতাশা

৬. শরীরে অত্যধিক ঘাম নিঃসরণ

৭. সবসময় নিজেকে সবার থেকে দূরে রাখা

৮. আলস্য ও উদ্বিগ্ন ভাব

৯. মনঃসংযোগ না থাকা, টাকা-পয়সা চুরি করা এমনকি মাদকের টাকার জন্য বাড়ির জিনিসপত্র সরিয়ে গোপনে বিক্রি করা ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছাড়াও কিছু সামাজিক তথা পরিবেশের কারণেও মাদকদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ জন্মাতে পারে, যেখান থেকে সে ধীরে ধীরে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

মাদকাসক্তির কতগুলো কারণ ছকে উল্লেখ করা হলো:

পরিবেশগত কারণ	পরিবারের কারণ
১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা ২. বেকারত্ব ৩. অসামাজিক পরিবেশ ৪. অল্প বয়সে স্কুল থেকে বিদায় ৫. সিনেমা বা কোনো টিভি সিরিয়াল দেখা ৬. আশপাশে ড্রাগের রমরমা ব্যবসা ৭. পেশাগত কারণ ৮. অসামাজিক কাজ ও অপরাধ বেশি হয়, সে সব স্থানে বাস করা ৯. যেখানে ড্রাগ নেওয়ার সুযোগ বা দল থাকে, তার আশেপাশে বসবাস করা	১. বাবা-মায়ের নিয়ন্ত্রণের অভাব ২. হতাশা ৩. একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা ৪. সন্তানের বেপরোয়া ভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া ৫. পরিবার থেকে বিচ্ছিন্নতা ৬. সন্তানের প্রতি যত্নহীনতা ৭. উগ্র জীবনযাত্রা বা মানসিকতা ৮. খারাপ সাহচর্য

১.৬.২ ড্রাগ আসক্তি নিয়ন্ত্রণ

কোনো ব্যক্তি ড্রাগের উপর আসক্ত হলে তা বন্ধ করা বেশ কঠিন কাজ। কারণ ড্রাগ আসক্ত মানুষ নিজের শরীরে মাদকের কুপ্রভাব বুঝতে পেরেও সেটা ছাড়তে পারে না। সঠিক চিকিৎসাব্যবস্থায় মাদকদ্রব্যে আসক্তি কমানো যায়, তবে সে ক্ষেত্রে মাদকাসক্ত ব্যক্তি যদি সহযোগিতা না করে তাহলে তেমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় না। মাদক নিরাময় হাসপাতাল অথবা কেন্দ্রে মাদকাসক্ত মানুষকে ভর্তি করতে হবে এবং যথেষ্ট সহানুভূতির সাথে তার চিকিৎসা করতে হবে।

প্রথমে আসক্ত ব্যক্তিকে তার ড্রাগ নেওয়া বন্ধুদের কাছ থেকে আলাদা করতে হয়। লক্ষ রাখতে হয় কোনোভাবেই যেন তার কাছে মাদকদ্রব্য পৌঁছাতে না পারে। এরপর তার মানসিক চিকিৎসা করা প্রয়োজন হয়, যেন সে ড্রাগের কথা মনে আনতে না পারে, তার জন্য তাকে বিশেষ কোনো কাজে যুক্ত করতে হয়। সে যে মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়, সেটি একবারে হঠাৎ করে বন্ধ না করে ধীরে ধীরে মাত্রা কমিয়ে কমিয়ে শেষে একেবারে বন্ধ করতে হয়। হঠাৎ করে বন্ধ করা শারীরিকভাবে বিপজ্জনক হতে পারে। ঘুম ঠিকমতো না হলে বা বেশি অস্থিরতা বা বিদ্রোহীভাব দেখা দিলে ডাক্তাররা স্নায়ু শিথিলকারক ঔষধ এবং ঘুমের ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা করে থাকেন।

মাদক সেবন শুধু যে ড্রাগ আসক্ত মানুষটির ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সমস্যা তা নয়, মাদক সেবন যেকোনো পরিবারে বড় রকমের সমস্যা ও বিশৃংখলা বয়ে আনে। এই সমস্যা সামগ্রিকভাবে সমাজ ও দেশের উন্নতির পরিপন্থী। মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে সমাজের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ধনী হয়, কিন্তু অন্যদিকে অনেক মানুষের এবং সমাজজীবনে ভয়াবহ দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে আসে। সম্ভাবনাময় ছাত্র-

২০২৫

ছাত্রীদের পড়ালেখা নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে সামাজিক অপরাধ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। শুধু তা-ই নয় মাদকাসক্তির কারণে অকালমৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। এ জন্য মাদকদ্রব্য সেবন ও এর ব্যবসা-বাণিজ্য কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হয়। এর জন্য ব্যক্তিগত এবং সমাজসেবামূলক সংস্থাগুলোর পাশাপাশি দেশের আইনশৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থা এবং সরকারি প্রচেষ্টা মাদক নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে ফলপ্রসূ হতে পারে।

সামাজিক প্রচেষ্টা

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা এবং তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।

২. মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে পরামর্শ দেওয়া।

৩. পুনর্বাসন করে সমাজের স্বাভাবিক স্রোতে এনে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা।

সরকারি প্রচেষ্টা

১. মাদক সেবন, বিক্রয় নিষিদ্ধ করা। এ ব্যাপারে কড়া আইন প্রণয়ন করে কঠোরভাবে সেগুলো প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

২. মাদক সেবনের কুপ্রভাবগুলো সরকারি ও বেসরকারি প্রচারমাধ্যম দ্বারা মানুষকে অবহিত করা।

৩. আমাদের দেশে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন বলবৎ আছে। আইনগুলো যথাযথভাবে প্রয়োগ হলে মাদকের বিষাক্ত ছোবল থেকে মানুষ ও দেশকে অনেকটুকু বাঁচানো সম্ভব হবে।

১.৭ এইডস (AIDS)

সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী রোগ হচ্ছে 'এইডস'। এটি একটি সংক্রামক রোগ। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আমেরিকায় AIDS চিহ্নিত হয় এবং তখন থেকে সারা বিশ্বে AIDS মরণব্যাধি হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলোতে এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশি।

প্রাকৃতিক নিয়মে সব মানুষের দেহেই রোগ-জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকে, একে ইমিউনিটি বলা হয়। আমাদের রক্তের মধ্যে এমন কিছু ব্যবস্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা প্রাকৃতিকভাবে সবরকম জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারি। রক্তের লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি প্রস্তুতের মাধ্যমে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারে। AIDS— এ আক্রান্ত ব্যক্তির নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায় এবং একসময় আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। এ জন্য রোগটির নাম দেওয়া হয়েছে 'অ্যাকুয়ার্ড ইম্যুন ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রম' যা সংক্ষেপে AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)। এক ধরনের ভাইরাস, যার নাম Human Immuno Deficiency Virus (চিত্র ১.০৮),

এবং যাকে সংক্ষেপে HIV বলা হয়, এই AIDS রোগের সংক্রমণ করে থাকে।

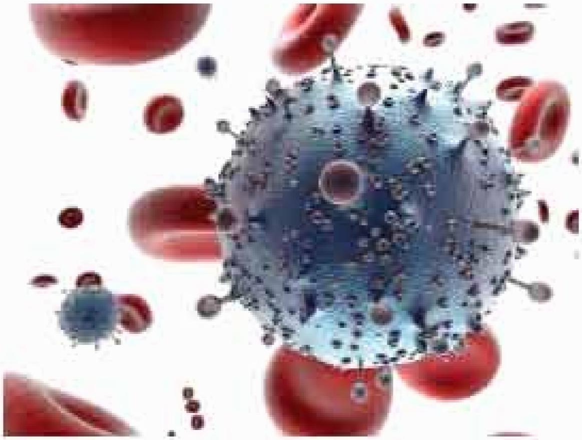

চিত্র ১.০৮: রক্তে HIV ভাইরাস

১.৭.১ AIDS রোগের কারণ

HIV দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। দেহের রক্তস্রোতে প্রবেশ করার পর HIV রক্তের শ্বেত কণিকার T- লিম্ফোসাইটকে আক্রমণ করে। এ কারণে এগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় দেহের স্বাভাবিক রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে শরীরে নানা রকমের বিরল রোগের সংক্রমণ ঘটে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে শ্বাসতন্ত্রের রোগ, মস্তিষ্কের রোগ, পরিপাকতন্ত্রের রোগ এবং টিউমার। দেখা গেছে HIV ভাইরাস সংক্রমণের পর প্রথম ৫ বছর পর্যন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না। এসব মানুষ তখন এই রোগের বাহক হিসেবে কাজ করে এবং তখন তারা অন্যকে সংক্রমিত করতে পারে।

এ রোগে কারা বেশি আক্রান্ত হতে পারে সে সম্পর্কে ইতিমধ্যে অনেক তথ্যই জানা গেছে। প্রধানত যৌন ক্রিয়ার মাধ্যমেই আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে HIV সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। সমকামী কিংবা নারী-পুরুষের মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সংযোগের মাধ্যমে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে। গর্ভবতী নারী এ রোগে আক্রান্ত হলে তার সন্তানদের মধ্যে এ রোগ দেখা দিতে পারে। মায়ের বুকের দুধের মাধ্যমে আক্রান্ত নারীর দেহ থেকে সদ্যোজাত শিশুর দেহে HIV সঞ্চারিত হতে পারে। এছাড়া রক্ত সঞ্চালনের সময় AIDS আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের মাধ্যমে কিংবা ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সঞ্চারিত হয়ে থাকে। খাদ্য, পানি, মশা বা কীটপতঙ্গ অথবা এইডস রোগীর সাধারণ স্পর্শের দ্বারা এ রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। তবে রক্ত, বীর্য, লালা, অশ্রু ইত্যাদি শারীরিক তরলের মাধ্যমে AIDS সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

AIDS প্রতিরোধ করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, HIV সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে সবাইকে শিক্ষা দেওয়া। অন্যকে সংক্রমিত না করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা এবং নিজেকে HIV সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখা। রক্তদান বা গ্রহণ, অনিয়ন্ত্রিত (unprotected) যৌন সম্পর্ক এবং ড্রাগ ব্যবহারকারীদের সিরিঞ্জের মাধ্যমে HIV সংক্রমণের ঝুঁকি সম্বন্ধে অবহিত করে AIDS রোগের বিস্তার কমানো যায়। সরকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সংস্থাগুলো মরণব্যাধি AIDS— এর সংক্রমণ কীভাবে ঘটে সে সম্বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে এ রোগ থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা যেতে পারে।

১.৮ স্বাস্থ্য রক্ষায় শরীরচর্চা এবং বিশ্রাম

শরীরই মানুষের প্রথম পরিচয়। তাই শরীরকে মানুষের জীবনসংগ্রামের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার বলা যেতে পারে। এই হাতিয়ারকে ঠিক রাখার দায়িত্ব আমাদেরই। শরীরকে ঠিক রাখার জন্য চাই সুষম খাদ্যের পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়াম। এর মধ্য দিয়েই গড়ে ওঠে মানুষের শারীরিক দৃঢ়তা।

মানুষের জীবনে নিয়মিতভাবে ঘুম, খাওয়া এবং বিশ্রাম নেওয়া আবশ্যক, এগুলো মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশকে সঠিকভাবে কাজকর্ম করতে সাহায্য করে। তবে মনে রাখতে হবে, এগুলো কোনোভাবেই শরীরের সুপ্ত সম্পদগুলোর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে না। এই বিকাশ একমাত্র নিয়মিত শরীরচর্চা বা ব্যায়ামের মধ্য দিয়েই সম্ভব হতে পারে। একটা গাছের সবকিছু নির্ভর করে তার শিকড়ের ওপর, ঠিক তেমনি মানুষের চলাফেরা, ভাবনা-চিন্তা ইত্যাদি সবকিছুই নির্ভর করে তার স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতার ওপর। সুস্থ স্নায়ুতন্ত্র গড়তে হলে নিয়মিত অঙ্গ চালনার সাহায্যে উপযুক্ত এবং পরিমিত শরীরচর্চার প্রয়োজন আছে।

আমরা সকলেই জানি, স্নায়ুতন্ত্র শরীরের মাংসপেশি নিয়ন্ত্রণ করে। তাই যদি নিয়মিত মাংসপেশির ব্যায়াম করি, তাহলে সহজেই স্নায়ুতন্ত্রকে সতেজ এবং সক্রিয় করে তোলা যাবে। এর ফলে স্নায়ুতন্ত্রের বিকাশ ঘটবে। শুধু তা-ই নয়, নিয়মিত শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যদি শরীরের বিভিন্ন দেহতন্ত্র বা জৈব তন্ত্রগুলোকে সক্রিয় করে তোলা যায়, তাহলে সেগুলোরও পর্যাপ্ত বিকাশ ঘটবে এবং যার ফলে আমাদের দৈনিক কাজকর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে। দৈনিক নিয়মিত কয়েক মিনিট শরীরচর্চার মধ্য দিয়েই শরীরের পরিপাক করার ক্ষমতা বাড়াতে পারব, রক্ত চলাচলের ক্ষমতা ভালো করতে পারব, পাচন ক্ষমতা ভালো হবে, শ্বাস-প্রশ্বাস ভালো হবে, শরীরের তাপ নিয়ন্ত্রণও আরও সুষ্ঠু হবে। এক কথায় বলা যায়, একটা সুস্থ শরীরের অধিকারী হওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, মাংসপেশির সক্রিয়তা এসব ব্যাপারে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই নিয়মিত এমন কিছু শারীরিক ক্রিয়াকলাপের চর্চা করতে হবে, যেন শরীরের প্রধান মাংসপেশিগুলো সক্রিয় এবং উত্তেজিত হওয়ার সুযোগ পায়।

বয়স, দৈহিক গঠন, সাধারণ স্বাস্থ্য প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে ব্যায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ব্যায়াম যে শুধু নিরানন্দ পরিশ্রমের একটি বিষয় তা কিন্তু নয়। সব রকম খেলাধুলা একদিকে আনন্দের ব্যাপার, অন্যদিকে এগুলো শারীরিক ব্যায়ামও বটে। আজকাল ছেলেরা এবং মেয়েরা সমানভাবে দৌড়ঝাঁপ, সাঁতার, হাঁটা, সাইকেল চালানো, কারাতে থেকে শুরু করে ফুটবল, টেনিস, হকি, ক্রিকেট এসব খেলছে। শরীর ঠিক রাখার জন্য শুধু যে নিয়ম করে ব্যায়াম করতে হয় তা নয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাও সেভাবে গড়ে তুলতে হয়। একজন মানুষ প্রতিদিন যদি ৮ থেকে ১০ হাজার পদক্ষেপ নেয়, তাহলে সে সুস্থ ও নীরোগ একটি দীর্ঘ জীবন আশা করতে পারে।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মানুষ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং শরীরের পেশিগুলো অবশ হয়ে আসে, তখন সারা শরীরকে কিছুক্ষণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রেখে আরাম করাকে আমরা বিশ্রাম বলি। ঘুমই শ্রেষ্ঠ বিশ্রাম।

দেহ-মনকে সুস্থ ও সতেজ করার জন্য প্রত্যেক মানুষের কমপক্ষে দৈনিক ৬ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন। বালক-বালিকাদের ৮/৯ ও শিশুদের ১০/১২ ঘণ্টা করে ঘুমের প্রয়োজন। যারা রাতে কাজ করে, তাদের অবশ্যই দিনের বেলায় পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া উচিত।

মনের বিশ্রাম: কেবল শরীরেরই নয়, মনেরও বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। শরীর ও মন থেকে সমস্ত রকম উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি, একেবারে দূর করে দিয়ে দেহ-মনকে একান্তভাবে নিদ্রার কোলে সঁপে দিতে পারলে তবেই দেহ মনের পক্ষে প্রকৃত বিশ্রাম হয়।

অনেক সময় দেখা যায়, এক কাজ থেকে অন্য কাজে মনোনিবেশ করেও শরীর ও মনকে বিশ্রাম দেওয়া যায়। একে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম বলা হয়। কঠিন কায়িক শ্রমের পর চিত্তবিনোদন বিশ্রামেরই নামান্তর। আবার কঠিন মানসিক পরিশ্রমের পর কর্মান্তর বিশ্রাম খোঁজার একটা উপায়।

বিখ্যাত লেখকদের মধ্যে অনেককে দেখা যায়, যারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাউনটেন পেন পরিষ্কার করে যাচ্ছেন। এতে তিনি কিন্তু আসলে তাঁর কাজের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। অনেকে ছবি আঁকেন, অনেকে বাগান পরিচর্যা, পশুপাখি পালন কিংবা শৌখিন সবজি বাগান তৈরি করে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এ সমস্ত কাজকেই বলে কর্মান্তরের মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাজরে প্রধানত কোনটি পাওয়া যায়?

(ক) গ্লুকোজ (খ) ফ্রুকটোজ
(গ) সুক্রোজ (ঘ) বিটা ক্যারোটিন

২. স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিনগুলো হলো—

i. A, D, E
ii. A, B, C
iii. A, D, K

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রহিমার ওজন ৫০ কেজি ও উচ্চতা ১.৫ মিটার। গতকাল সকাল থেকে তার বমি ও পাতলা পায়খানা হওয়ায় দেহে পানির অভাবসহ ওজন হ্রাস পেয়ে ৪৭ কেজি হয়ে গেছে।

৩. রহিমার দেহে প্রয়োজনীয় উপাদানটির অভাবে—

i. রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটে
ii. পেশি নাজুক হয়ে পড়ে
iii. লবণের ভারসাম্য বজায় থাকে

নিচের কোনটি সঠিক

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. অসুস্থ হওয়ার পর রহিমার তনুসূচি (BMI) কত হয়েছে?

(ক) ২২.৩ (প্রায়) (খ) ২০.৯ (প্রায়) (গ) ৪৯.২৫ (প্রায়) (ঘ) ৪৪.৭৫ (প্রায়)

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ১৪ বছরের তনুর ওজন ৩৫ কেজি এবং উচ্চতা ১.৫ মিটার। ইদানীং তার ত্বকে লালচে দাগ পড়ছে, খাওয়ার তেমন রুচি নেই। কিন্তু দেহের তাপমাত্রা স্বাভাবিক আছে।

(ক) ভরসূচি কী?

(খ) জেরপথ্যালমিয়া রোগ বলতে কী বুঝায়?

(গ) তনুর দুই দিনের মৌল বিপাকে কত শক্তি ব্যয় হবে?

(ঘ) তনুর সমস্যাগুলোর সমাধানের উপায় বিশ্লেষণ করো।

২. নিচের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

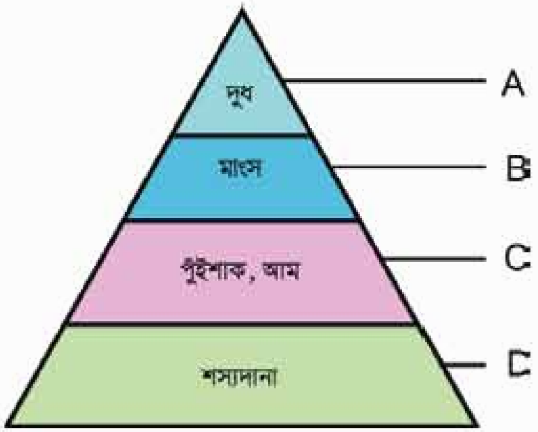

(ক) রাফেজ কী?

(খ) খাদ্যপ্রাণ বলতে কী বুঝায়?

(গ) খাদ্য পিরামিডের খাদ্যগুলোর বিকল্প খাদ্য ব্যবহার করে এক দিনের দুপুরের সুষম খাদ্য তালিকা তৈরি করো।

(ঘ) D চিহ্নিত খাদ্য উপাদানটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? বিশ্লেষণ করো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জীবনের জন্য পানি

পানির আরেক নাম জীবন। শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়, দেশের উন্নয়নের জন্যও আমাদের পানির দরকার। নানা উৎস থেকে আমরা পানি পাই। নানা কারণে আমাদের অতিপ্রয়োজনীয় এই পানির উৎস হুমকির মুখে পড়ছে। এই অধ্যায়ে আমরা এই হুমকিগুলোর কথা জানব এবং কেমন করে তার মোকাবেলা করতে পারব, সেই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- পানির ধর্ম বর্ণনা করতে পারব।
- পানির গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানির বিভিন্ন উৎস বর্ণনা করতে পারব।
- জলজ উদ্ভিদ ও জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা এবং পানির মানদণ্ড ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে পানির পুনরাবর্তন ধাপসমূহে পানির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব।
- পানি বিশুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাংলাদেশে পানির উৎসে দূষণের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিদূষণের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশের মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানিদূষণ প্রতিরোধের কৌশল ও নাগরিকের দায়িত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পানির উৎস সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা এবং কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- 'পানি প্রাপ্তি সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকার'— ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি বর্ণনা করতে পারব।
- বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার এবং সুস্থ জীবনযাপনে এর প্রভাব বিষয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ পরিচালনা করতে পারব।
- পানির সংকটের (গৃহস্থালি/কৃষি/শিল্পে ব্যবহার) কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- পানি ব্যবহার ও পানির সংরক্ষণে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পানির উৎসে পানির স্বাভাবিক প্রবাহ, দূষণ রোধ বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করব।
- "পানি নাগরিকের মৌলিক মানবিক অধিকার" বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করব।
- পানির অপচয়রোধ এবং কার্যকর ব্যবহারে সচেতন হব।

২.১ পানি

পৃথিবীতে যত ধরনের তরল পদার্থ পাওয়া যায়, পানি তার মাঝে সবচেয়ে সহজলভ্য। মানুষের শরীরের শতকরা ৬০-৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। মাছ, মাংস কিংবা শাক-সবজিতে শতকরা ৬০-৯০ ভাগ পানি থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠের শতকরা ৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য, তাই পানির আরেক নাম হচ্ছে জীবন। তাহলে পানির কিছু গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক।

২.১.১ পানির ধর্ম

গলনাংক ও স্ফুটনাংক

তোমাদের কি মনে আছে, পানির গলনাংক আর স্ফুটনাংক কত? পানি যখন কঠিন অবস্থায় থাকে সেটিকে আমরা বলি বরফ। যে তাপমাত্রায় বরফ গলে যায়, সেটিই হচ্ছে বরফের গলনাংক। বরফের গলনাংক ০° সেলসিয়াস। অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলীয় চাপে যে তাপমাত্রায় তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয়, তাকে বলে স্ফুটনাংক। পানির স্ফুটনাংক ৯৯.৯৮° সেলসিয়াস যেটা ১০০° সেলসিয়াসের খুবই কাছাকাছি। তাই সাধারণভাবে আমরা পানির স্ফুটনাংক ১০০° সেলসিয়াস বলে থাকি।

বিশুদ্ধ পানি স্বাদহীন, গন্ধহীন আর বর্ণহীন। তোমরা কি জান পানির ঘনত্ব কত? পানির ঘনত্ব তাপমাত্রার ওপর নির্ভর করে। ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানির ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি আর সেটি হচ্ছে ১ গ্রাম/সি.সি বা ১০০০ কেজি/মিটার কিউব। অর্থাৎ ১ সি.সি. পানির ভর হলো ১ গ্রাম বা ১ কিউবিক মিটার পানির ভর হলো ১০০০ কেজি।

বিদ্যুৎ বা তড়িৎ পরিবাহিতা

বিশুদ্ধ পানিতে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ পরিবাহিত হয় না, তবে এতে লবণ কিংবা এসিডের মতো তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে তড়িৎ পরিবাহিত হয়। পানির একটি বিশেষ ধর্ম হলো এটি বেশির ভাগ অজৈব যৌগ আর অনেক জৈব যৌগকে দ্রবীভূত করতে পারে। এজন্য পানিকে সর্বজনীন দ্রাবকও বলা হয়। পানি একটি উভধর্মী পদার্থ অর্থাৎ কখনো এসিড, কখনো ক্ষার হিসেবে কাজ করে। সাধারণত এসিডের উপস্থিতিতে পানি ক্ষার হিসেবে আর ক্ষারের উপস্থিতিতে এসিড হিসেবে কাজ করে। তবে বিশুদ্ধ পানি পুরোপুরি নিরপেক্ষ অর্থাৎ এর pH হলো ৭, যেটি সম্পর্কে আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা জানব।

পানির গঠন

তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জেগেছে যে আমাদের জীবনের জন্য অপরিহার্য এই পানি কী দিয়ে তৈরি? পানি দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু আর একটি অক্সিজেন পরমাণু (চিত্র ২.০১) দিয়ে গঠিত। তাই আমরা রসায়ন পড়ার সময় পানিকে H_2O লিখি অর্থাৎ এটিই হলো পানির সংকেত।

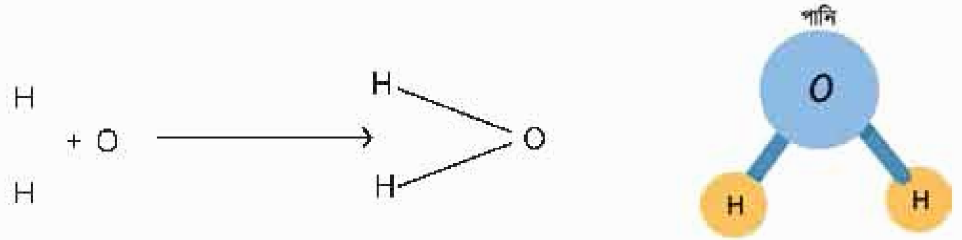

চিত্র ২.০১ একটি অক্সিজেন ও দুইটি হাইড্রোজেনের পরমাণু দিয়ে একটি পানির অণু গঠিত হয়

আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এখন আমরা জানি যে আমরা যে পানি দেখি সেখানে অনেক পানির অণু একসাথে ক্লাস্টার (Cluster) হিসেবে থাকে।

২.১.২ পানির উৎস

তোমরা কি বলতে পারবে আমাদের অতি দরকারি এই পানি আমরা কোন উৎস থেকে পাই? পানির সবচেয়ে বড় উৎস হচ্ছে সাগর, মহাসাগর বা সমুদ্র। পৃথিবীতে যত পানি আছে, তার প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরই উৎস হচ্ছে সমুদ্র। সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে এজন্য সমুদ্রের পানিকে লোনা পানিও (Marine water) বলে। লবণের কারণে সমুদ্রের পানি পানের অনুপযোগী, এমনকি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অন্য কাজেও সমুদ্রের পানি ব্যবহার করা যায় না।

পানির আরেকটি বড় উৎস হলো হিমবাহ তুষার স্রোত, যেখানে পানি মূলত বরফ আকারে থাকে। এই উৎসে প্রায় শতকরা ২ ভাগের মতো পানি আছে। উল্লেখ্য যে বরফ আকারে থাকায় এই পানিও কিছু অন্য কাজে ব্যবহারের উপযোগী নয়। ব্যবহার উপযোগী পানির উৎস হলো নদ-নদী, খাল-বিল, হ্রদ, পুকুর কিংবা ভূগর্ভস্থ পানি। ভূগর্ভস্থ পানি আমরা নলকূপের মাধ্যমে তুলে আনি। পাহাড়ের উপর জমে থাকা বরফ বা তুষার গলেও ঝর্ণা সৃষ্টি করতে পারে। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, পৃথিবীতে ব্যবহারের উপযোগী পানি মাত্র শতকরা ১ ভাগ।

বাংলাদেশে মিঠা পানির উৎস

আমরা আমাদের বাসায় রান্না থেকে শুরু করে কাপড় ধোয়া, গোসল কিংবা খাওয়ার পানি কোথা থেকে পাই? মাঠে ফসল ফলাতে কখনো কখনো (যেমন: ইরি ধানের জন্য) প্রচুর পরিমাণে পানির দরকার হয়। এ পানিই বা আমরা কোথা থেকে পাই? আমাদের দেশে ঝর্ণা তেমন একটা না থাকায় মিঠা পানির মূল উৎস হচ্ছে নদ-নদী, খাল-বিল, পুকুর, হ্রদ এবং ভূগর্ভের পানি। তবে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ করে আর্সেনিক থাকায় বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকার ভূগর্ভের পানি পানের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই ঐ সকল এলাকার মানুষ বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করার পর পরিশোধন করে সেটি পান করতে বাধ্য হয়েছে।

২.১.৩ জলজ উদ্ভিদের জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

তোমরা কচুরিপানা, ক্ষুদিপানা, গুড়িপানা, সিংগারা, টোপাপানা, শাপলা, পদ্ম, শ্যাওলা, হাইড্রিলা, কলমি, হেলেঞ্চা, কেশরদাম ইত্যাদি নানা রকম জলজ উদ্ভিদের নাম শুনেছ এবং তাদের অনেকগুলো নিজের চোখেও দেখেছ। এরা কোথায় জন্মে জান? এদের বেশির ভাগই পানিতে জন্মে (চিত্র ২.০২) এবং কিছু কিছু আছে (যেমন: কলমি, হেলেঞ্চা, কেশরদাম) যারা পানিতে আর মাটিতে দুজায়গাতেই জন্মে। অর্থাৎ পানি না থাকলে বেশির ভাগ জলজ উদ্ভিদ জন্মাতই না, কিছু কিছু হয়তো জন্মাতো কিন্তু বাঁচতে পারত না কিংবা বেঁচে থাকলেও বেড়ে উঠতে পারত না। তখন কী হতো?

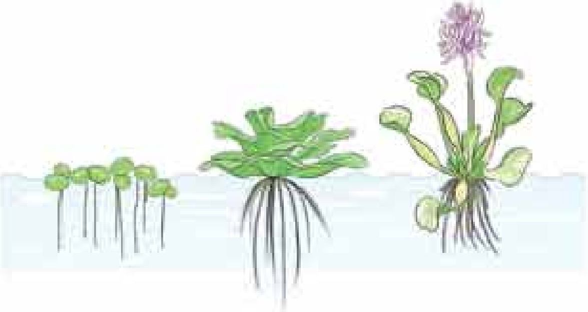

চিত্র ২.০২: ক্ষুদিপানা, টোপাপানা এবং কচুরিপানা হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের উদাহরণ।

তখন পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ঘটত। তার কারণ, এই জলজ উদ্ভিদগুলো একদিকে যেমন সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে অক্সিজেন তৈরি করে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ঠিক রাখে, অন্যদিকে এদের অনেকগুলো বিশেষ করে শ্যাওলাজাতীয় জলজ উদ্ভিদগুলো জলজ প্রাণীদের খাদ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করে। এসব জলজ উদ্ভিদ না থাকলে মাছসহ অনেক জলজ প্রাণী বাঁচতেই পারত না, যেটি পরিবেশের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতো। তোমরা জান যে উদ্ভিদগুলো সাধারণত মূলের মাধ্যমে পানি আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান সংগ্রহ করে। কিন্তু জলজ উদ্ভিদগুলো সারা দেহের মাধ্যমেই পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান বিশেষ করে খনিজ লবণ সংগ্রহ করে থাকে। তাই এদের পুরো দেহ পানির সংস্পর্শে না এলে এদের বেড়ে ওঠাই হতো না।

আরেকটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে জলজ উদ্ভিদের কাণ্ড আর অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব নরম হয়, যেটা পানির স্রোত আর জলজ প্রাণীর চলাচলের সঙ্গে মানানসই। পানি ছাড়া শুকনো মাটিতে এদের জন্ম হলে এরা ভেঙে পড়ত এবং বেড়ে উঠতে পারত না এমনকি বাঁচতেও পারত না।

তোমরা কি জান জলজ উদ্ভিদ কীভাবে বংশবিস্তার করে? জলজ উদ্ভিদগুলো সাধারণত অঙ্গজ উপায়ে বংশবিস্তার করে। পানি না থাকলে এই বংশবিস্তার বাধাগ্রস্ত হতো। তাই আমরা বলতে পারি, আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জলজ উদ্ভিদগুলোর জন্ম খুবই জরুরি এবং তাদের বেড়ে উঠার জন্য পানির ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পানি না থাকলে জলজ উদ্ভিদগুলো জন্মাতে পারত না, জন্মালেও বাঁচতে পারত না, তার ফলে পরিবেশের ভয়াবহ একটি বিপর্যয় ঘটত।

২০২৩

২.১.৪ জলজ প্রাণীর জন্য পানির প্রয়োজনীয়তা

হাজার হাজার জলজ প্রাণীর মাঝে আমাদের সবচেয়ে পরিচিত জলজ প্রাণী হচ্ছে মাছ। মাছ ধরে পানির বাইরে রেখে দিলে কী হয়? তোমরা সবাই দেখেছ যে মাছ মরে যায়। কেন মরে যায়? কারণ আমরা যেরকম বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারি না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাই, মাছের বেলাতেও তাই ঘটে। মাছ অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুলকা দিয়ে আর ফুলকা এমনভাবে তৈরি যে এটি শুধু পানি থেকেই অক্সিজেন নিতে পারে, বাতাস থেকে নয়। যদি পানি না থাকত তাহলে কোনো মাছ বাঁচতে পারত না। শুধু মাছ নয়, যেসব প্রাণী ফুলকা দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে শ্বাসকার্য চালায়, তাদের কোনোটাই বাঁচতে পারত না। ফলে পরিবেশ হুমকির মধ্যে পড়ত আর আমাদেরও বেঁচে থাকা কঠিন হয়ে যেত। তোমরা আগের অধ্যায় থেকে জেনেছ যে প্রোটিন আমাদের বেড়ে ওঠার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপাদান। আমাদের প্রয়োজনীয় প্রোটিনের প্রায় শতকরা ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। কাজেই পানি না থাকলে আমরা প্রয়োজনীয় প্রোটিন পেতাম না, যার ফলে আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি এবং অন্যান্য কোনো জৈবিক প্রক্রিয়াই ঠিকভাবে ঘটতো না।

২.২ পানির মানদণ্ড

পানি অত্যন্ত মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে নদ-নদীর পানি আমাদের পরিবেশের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ, এটি জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীর আশ্রয়স্থল (Habitat)। শুধু তা-ই নয়, এই পানি কৃষিকাজে সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়। একইভাবে জাহাজের নাবিকেরা, লঞ্চ, নৌযান বা ট্রলার দিয়ে যারা জীবিকা নির্বাহ করে, তারা সবাই নদ-নদী বা সমুদ্রের পানিই প্রক্রিয়া করে পান করে, তাদের অন্যান্য কাজেও ব্যবহার করে থাকে। তাই পানির নির্দিষ্ট মান যদি বজায় না থাকে তাহলে এটি জীববৈচিত্র্য বা পরিবেশের জন্য যেমন ক্ষতিকর হবে, তেমনি অন্যান্য কাজেও এর ব্যবহার ব্যাহত হবে। এবার তাহলে পানির মানদণ্ড সম্পর্কে একটা ধারণা নেওয়া যাক:

পানির মানদণ্ড নির্ভর করে সেটি কোন কাজে ব্যবহার করব তার ওপর। প্রথমে নদ-নদী, খাল-বিল কিংবা সমুদ্রের পানির মানদণ্ড কেমন হওয়া উচিত সেটা জেনে নিই।

বর্ণ ও স্বাদ: তোমরা জান যে বিশুদ্ধ পানি বর্ণহীন আর স্বাদহীন হয়, তাই পানিতে বসবাসকারী প্রাণী আর উদ্ভিদের জন্য নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির পানি বর্ণহীন আর স্বাদহীন হওয়াই উত্তম।

ঘোলার পরিমাণ

পানি ঘোলাটে হলে সেটি পানিতে বসবাসকারী প্রাণী আর উদ্ভিদের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। তার কারণ, পানি ঘোলা হলে সূর্যের আলো পানির নিচে থাকা উদ্ভিদ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে

না, যার ফলে সালোকসংশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়। এতে একদিকে পানিতে থাকা উদ্ভিদের খাবার তৈরিতে ব্যাঘাত ঘটে, যেটা তাদের বৃদ্ধিকে কমিয়ে দেয়, অন্যদিকে সালোকসংশ্লেষণের ফলে যে অক্সিজেন তৈরি হতো, সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। পানি ঘোলা হলে মাছ বা অন্য প্রাণী ঠিকমতো খাবার সংগ্রহ করতে পারে না।

পানি ঘোলা হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে প্রাকৃতিক কারণ, অর্থাৎ নদীভাঙন, পলি মাটি ইত্যাদি। আবার মানব সৃষ্ট কারণেও পানি ঘোলা হয়, যেমন তেল, গ্রিজ ও অন্যান্য অদ্রবণীয় পদার্থের উপস্থিতি। পানিতে এসব পদার্থ, বিশেষ করে মাটি আর বালি বেড়ে গেলে তা এক পর্যায়ে নদ-নদীর তলায় জমা হতে থাকে। ফলে নাব্যতা হ্রাস পায় এবং নৌযান চলাচলে অসুবিধা ঘটে। তোমরা সংবাদপত্র বা টেলিভিশনে নিশ্চয়ই লঞ্চ, স্টিমার ডুবো চরে আটকে পড়ার খবর দেখে থাকবে। কেন এগুলো আটকে পড়ে? নাব্যতা কমে যাওয়াই এর প্রধান কারণ।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি

নদ-নদীর পানিতে কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকলে সেটা জলজ উদ্ভিদ আর প্রাণীর দেহে ক্যান্সারের মতো রোগ সৃষ্টি করতে পারে। তাই নদ-নদীর পানি পুরোপুরি তেজস্ক্রিয়তামুক্ত হতে হবে।

ময়লা-আবর্জনা

নদ-নদীসহ সকল প্রাকৃতিক পানি অবশ্যই ময়লা-আবর্জনামুক্ত হতে হবে। কারণ ময়লা-আবর্জনা থেকে জীবন ধ্বংসকারী সব ধরনের জীবাণু তৈরি হয়।

দ্রবীভূত অক্সিজেন

আমাদের নিঃশ্বাসের জন্য যে রকম অক্সিজেনের দরকার হয়, ঠিক সেরকম পানিতে বসবাসকারী প্রাণীদেরও শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য অক্সিজেনের দরকার হয়। এই অক্সিজেন তারা কোথা থেকে পায়? তারা এই অক্সিজেন পায় পানিতে দ্রবীভূত হয়ে থাকা অক্সিজেন থেকে। কোনো কারণে যদি এই অক্সিজেন নির্দিষ্ট মাত্রার চেয়ে কমে যায়, তাহলে জলজ প্রাণীগুলোর সমস্যা হতে থাকে। যদি পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন না থাকে, তাহলে মাছসহ অন্যান্য প্রাণী বাঁচতেই পারে না। জলজ প্রাণীদের বেঁচে থাকার জন্য ১ লিটার পানিতে কমপক্ষে ৫ মিলিগ্রাম অক্সিজেন থাকা দরকার।

তাপমাত্রা

তাপমাত্রা পানির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। পানির তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে গেলে, একদিকে যেমন দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, অন্যদিকে জলজ প্রাণীর প্রজনন থেকে শুরু করে সব ধরনের শারীরবৃত্তীয় কাজেরও সমস্যা সৃষ্টি হয়।

pH

pH হলো এমন একটি রাশি, যেটি দ্বারা বোঝা যায় পানি বা অন্য কোনো জলীয় দ্রবণ এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ হলে pH হয় ৭, এসিডিক হলে ৭-এর কম, আর ক্ষারীয় হলে ৭-এর বেশি। এসিডের পরিমাণ যত বাড়বে, pH-এর মান তত কমে, অন্যদিকে ক্ষারের পরিমাণ যত বাড়ে, pH-এর মানও তত বাড়ে। নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির জন্য pH-এর মান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত নদ-নদীর পানি ক্ষারীয় হয়। গবেষণা করে দেখা গেছে নদ-নদীর পানির pH যদি ৬-৮ এর মধ্যে থাকে, তাহলে সেটা জলজ উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য কোনো অসুবিধার সৃষ্টি করে না। তবে pH-এর মান যদি এর চাইতে কমে যায় বা বেড়ে যায়, তাহলে ঐ পানিতে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী আর উদ্ভিদের মারাত্মক ক্ষতি হয়। মাছের ডিম, পোনা মাছ পানির pH খুব কম বা বেশি হলে বাঁচতে পারে না। পানিতে এসিডের পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে, অর্থাৎ pH-এর মান খুব কমে গেলে জলজ প্রাণীদের দেহ থেকে ক্যালসিয়ামসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ বাইরে চলে আসে, যার ফলে মাছ সহজেই রোগাক্রান্ত হতে শুরু করে।

লবণাক্ততা

তোমরা কি জান আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে কেন? ইলিশ সামুদ্রিক মাছ অর্থাৎ লবণাক্ত পানির মাছ হলেও প্রজননের সময় অর্থাৎ ডিম ছাড়ার সময় মিঠা পানিতে আসে কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ থাকে, যা ডিম নষ্ট করে ফেলে, ফলে ঐ ডিম থেকে আর পোনা মাছ তৈরি হতে পারে না। তাই প্রকৃতির নিয়মেই ইলিশ মাছ ডিম ছাড়ার সময় হলে মিঠা পানিতে আসে। তবে সব মাছের জন্য এটি প্রযোজ্য নয়। কিছু মাছ এবং জলজ প্রাণী লবণাক্ত পানিতেই প্রজনন করতে পারে।

২.৩ পানির পুনরাবর্তন ও পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা

পানির পুনরাবর্তন

এর আগে তোমরা দেখেছ যে ভূপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই পানি দ্বারা আবৃত; কিন্তু বেশির ভাগ পানিই (শতকরা ৯৭ ভাগ) লবণাক্ত, তাই সেই পানি সরাসরি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যায় না। আমাদের যে শতকরা ১ ভাগ মিঠা পানি (Fresh water) সঞ্চিত আছে, তার একটি অংশবিশেষ করে নদ-নদী, খাল-বিল ও হ্রদের পানি নানাভাবে প্রতিনিয়ত দূষিত হয়ে চলেছে। এমনকি ভূগর্ভের যে পানি আমরা কূপ বা নলকূপ থেকে পাই এবং খাওয়া থেকে শুরু করে নানা কাজে ব্যবহার করি, সেটিও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ (যেমন: আর্সেনিক) দিয়ে দূষিত হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। যদিও আমাদের পানিসম্পদ প্রচুর, কিন্তু ব্যবহার করার উপযোগী পানির পরিমাণ খুবই অল্প আর সীমিত। তাই পানি ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সাশ্রয়ী হতে হবে এবং একই পানি কীভাবে বারবার ব্যবহার করা ২০২৫

যায়, সেটিও চিন্তা করতে হবে।

প্রকৃতিতে পানির কি পুনরাবর্তন ঘটছে? হ্যাঁ, ঘটছে। সপ্তম শ্রেণিতে তোমরা পানিচক্রে দেখেছ যে দিনের বেলা সূর্যের তাপে ভূপৃষ্ঠের সমুদ্র, নদ-নদী, খাল-বিলের পানি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে। একপর্যায়ে বাষ্প ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘ পরে বৃষ্টির আকারে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে। এই বৃষ্টির পানির বড় একটি অংশ নদ-নদী, খাল-বিল ও সমুদ্রে গিয়ে পড়ে এবং আবার বাষ্পীভূত হয় ও আবার বৃষ্টির আকারে ফিরে আসে। পানির এই পুনরাবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পুনরাবর্তন না হলে কী ধরনের সমস্যা হতো বলতে পারবে? এই পুনরাবর্তন না হলে বৃষ্টি হতো না, যার ফলে পুরো পৃথিবী মরুভূমি হয়ে যেত। প্রচণ্ড খরা হতো, ফসল উৎপাদন কমে যেত। বৃষ্টি হলো প্রাকৃতিকভাবে পানির পুনরাবর্তন।

আমরা যদি ব্যবহারের পর বর্জ্য পানি সংগ্রহ করে সেটি পরিশোধন করে আবার ব্যবহার করি তাহলে সেটিও কিন্তু হবে এক ধরনের পুনরাবর্তন।

পরিবেশ সংরক্ষণে পানির ভূমিকা

যেহেতু পরিবেশের প্রায় প্রতিটি উপাদান ও প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পানির উপর নির্ভর করে, তাই পরিবেশকে টিকিয়ে রাখতে হলে পানির ভূমিকা অপরিহার্য। পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাবে না, ফসল উৎপাদন হবে না। এক কথায় পানি না থাকলে পুরো পরিবেশের সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্বও ধ্বংস হয়ে যাবে।

মানসম্মত পানির প্রয়োজনীয়তা: সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই আমরা কী করি? হাত-মুখ ধুই। এ কাজ পানি ছাড়া কি সম্ভব? না, সম্ভব নয়। হাত-মুখ ধোয়া থেকে শুরু করে গোসল, রান্নাবান্না, কাপড় ধোয়া এবং সর্বোপরি খাওয়ার জন্য পানি অপরিহার্য। এই পানি যদি মানসম্মত না হয় তাহলে প্রত্যেকটা কাজেই সমস্যা হবে। উদাহরণ দেয়ার জন্য বলা যায় খাওয়ার পানিতে যদি গন্ধ থাকে বা সেটি যদি লোনা হয়, তাহলে কি আমরা সেটা খেতে পারব? না, পারব না। এর বাস্তব প্রমাণ হলো আমাদের দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় নদী আর ভূগর্ভের পানি লোনা হওয়ায় তারা ঐ পানি খেতে তো পারছেই না, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের বেশির ভাগ কাজে ব্যবহারও করতে পারছে না। তারা বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে পরিশোধন করে তারপর সেটি পান করছে আর অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। আবার খাওয়ার পানি যদি মানসম্মত না হয়, বিশেষ করে এতে যদি রোগ-জীবাণু থাকে, তাহলে সেটা থেকে মারাত্মক স্বাস্থ্য বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। সমুদ্রের লোনা পানি কি কৃষিকাজে বা শিল্প-কারখানায় ব্যবহার করা যায়? না, সেটাও যায় না। তার কারণ সমুদ্রের পানিতে প্রচুর লবণ থাকে, যেটা শিল্প-কারখানায় ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির (যেমন-বয়লার) ক্ষয়সাধন করে নষ্ট করে ফেলে। একইভাবে আমাদের বেশিরভাগ ফসলও লবণাক্ত পানিতে জন্মাতে পারে না। অর্থাৎ লবণাক্ত পানি কৃষিকাজের জন্যও উপযোগী নয়।

এক কথায় বলা যায়, শিল্প-কারখানা থেকে শুরু করে কৃষিকাজ আর দৈনন্দিন জীবনের প্রত্যেকটা কাজেই মানসম্মত পানির দরকার হয়। তা না হলে একদিকে যেমন মানুষের স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও দেশের মারাত্মক ক্ষতিসাধন হতে পারে।

২.৪ পানি বিশুদ্ধকরণ

ভূপৃষ্ঠে যে পানি পাওয়া যায় তাতে নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ, এমনকি রোগ সৃষ্টি করতে পারে এরূপ জীবন ধ্বংসকারী জীবাণুও থাকে। তাই ব্যবহারের আগে পানি বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। ভূগর্ভের পানি সাধারণত রোগ-জীবাণু মুক্ত, কিন্তু এই পানিতে আর্সেনিকের মতো নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতির কথা এখন আমরা সবাই জানি।

পানি কীভাবে বিশুদ্ধকরণ করা হবে, সেটি নির্ভর করে এটি কোন কাজে ব্যবহার করা হবে, তার ওপর। স্বাভাবিকভাবেই খাওয়ার জন্য অত্যন্ত বিশুদ্ধ পানি লাগলেও জমিতে সেচকাজের জন্য তত বিশুদ্ধ পানির দরকার হয় না। সাধারণত যেসব প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়, সেগুলো হলো পরিস্রাবণ, ক্লোরিনেশন, স্ফুটন, পাতন ইত্যাদি। নিচে এই প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করা হলো:

পরিস্রাবণ

ষষ্ঠ শ্রেণিতে তোমরা পরিস্রাবণ সম্পর্কে জেনেছ। পরিস্রাবণ হলো তরল আর কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে কঠিন পদার্থকে আলাদা করার একটি প্রক্রিয়া। পানিতে অদ্রবণীয় ধুলা-বালির কণা থেকে শুরু করে নানারকম ময়লা-অ্যাবর্জনার কণা থাকে। এদেরকে পরিস্রাবণ করে পানি থেকে দূর করা হয়। এটি করার জন্য পানিকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করা হয়, তখন পানিতে অদ্রবণীয় ময়লার কণাগুলো বালির স্তরে আটকে যায়। বালির স্তর ছাড়াও খুব সূক্ষ্মভাবে তৈরি কাপড় ব্যবহার করেও পরিস্রাবণ করা যায়। বর্তমান সময়ে আমাদের অনেকের বাসায় আমরা যেসব ফিল্টার ব্যবহার করি, সেখানে আরো উন্নতমানের সামগ্রী দিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়।

ক্লোরিনেশন

যদি পানিতে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু থাকে, তবে তা অবশ্যই দূর করতে হবে এবং সেটি করা হয় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে। নানারকম জীবাণুনাশক পানি বিশুদ্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়। এদের মাঝে অন্যতম হচ্ছে ক্লোরিন গ্যাস (Cl_2)। এছাড়া ব্লিচিং পাউডার [$(Ca(OCl)Cl$] এবং আরও কিছু পদার্থ, যার মাঝে ক্লোরিন আছে এবং জীবাণু ধ্বংস করতে পারে, সেগুলো ব্যবহার করা হয়।

আমাদের দেশে বন্যার সময় পানি বিশুদ্ধ করার জন্য যে ট্যাবলেট বা কিট ব্যবহার করা হয়, সেটি কী? সেটি হলো মূলত সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড ($NaOCl$)। এর মাঝে যে ক্লোরিন থাকে, সেটি পানিতে ২০২১

থাকা রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে ফেলে। ক্লোরিন ছাড়াও ওজোন (O_3) গ্যাস দিয়ে অথবা অতিবেগুনি রশ্মি দিয়েও পানিতে থাকা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করা যায়। বোতলজাত পানির কারখানায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে পানিকে রোগ-জীবাণুমুক্ত করা হয়।

স্ফুটন

পানির স্ফুটনের কথা তোমরা সবাই জান। এ প্রক্রিয়ায় কি পানিকে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব? হ্যাঁ, অবশ্যই সম্ভব। পানিকে খুব ভালোভাবে ফুটালে এতে উপস্থিত জীবাণু ধ্বংস হয়ে যায়। প্রশ্ন হতে পারে, জীবাণুমুক্ত করার জন্য কতক্ষণ পানি ফুটাতে হয়? স্ফুটন শুরু হওয়ার পর ১৫-২০ মিনিট ফুটালে সেই পানি জীবাণুমুক্ত হয়। বাসা-বাড়িতে খাওয়ার জন্য এটি একটি সহজ এবং সাশ্রয়ী প্রক্রিয়া।

পাতন

পাতন প্রক্রিয়ার কথা তোমরা ষষ্ঠ শ্রেণিতে জেনেছ। যখন খুব বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়, তখন পাতন প্রক্রিয়ায় পানি বিশুদ্ধ করা হয়। যেমন: ঔষধ তৈরির জন্য, পরীক্ষাগারে রাসায়নিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানির প্রয়োজন হয়। এই প্রক্রিয়ায় একটি পাত্রে পানি নিয়ে তাপ দিয়ে সেটাকে বাষ্পে পরিণত করা হয়। পরে ঐ বাষ্পকে আবার ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করা পানিতে অন্য পদার্থ থাকার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে।

২.৫ বাংলাদেশের পানির উৎস দূষণের কারণ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর সব দেশেই পানির প্রায় সব উৎস, বিশেষ করে ভূপৃষ্ঠের পানি, প্রতিনিয়ত নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। এবার আমরা সেই দূষণের কারণগুলো আলোচনা করব।

গোসলের পানি, পায়খানার বর্জ্যপানি কিংবা অন্যান্য কাজে ব্যবহারের পর সেই পরিত্যক্ত পানি কোথায় যায়, সেটা কি তোমরা জান? বর্জ্যপানির বড় একটি অংশ নর্দমার নলের ভেতর দিয়ে নিয়ে নদ-নদীতে ফেলা হয় এবং সেগুলো পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে। এই বর্জ্যপানিতে রোগ-জীবাণু থেকে শুরু করে নানারকম রাসায়নিক বস্তু থাকে, যার কারণে পানি দূষিত হয়।

আমাদের বাসায় যেসব কঠিন বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, সেগুলো আমরা কী করি? সাধারণত বাড়ির পাশে রাখা ডাস্টবিন বা অনেক সময় অবিবেচকের মতো খোলা জায়গায় ফেলে দিই। এসব বর্জ্য পদার্থ ১-২ দিনের মধ্যে পচতে শুরু করে। বৃষ্টি হলে সেই পচা বর্জ্য— যেখানে রোগ-জীবাণুসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে, বৃষ্টির পানির সাথে মিশে নদ-নদী, খাল-বিল বা লেকের পানিকে দুষিত করে।

তোমরা সবাই জান, কৃষিকাজে মাটির উর্বরতা বাড়ানোর জন্য রাসায়নিক সার, জৈব সার আর পোকামাকড়

মারার জন্য কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। এসব থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। বৃষ্টি হলে অথবা বন্যার সময় কৃষিজমি প্লাবিত হলে কৃষিজমিতে ব্যবহার করা রাসায়নিক আর জৈব সার এবং কীটনাশক বৃষ্টি বা বন্যার পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে।

শিল্প-কারখানা থেকে কি পানি দূষিত হতে পারে? হ্যাঁ, পারে। নদ-নদীর পানিদূষনের সবচেয়ে বড় একটি কারণ হলো শিল্প-কারখানায় সৃষ্ট বর্জ্য। তোমরা কি কেউ বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়েছ? গেলে দেখবে এর পানিতে দুর্গন্ধ এবং এর রং কুচকুচে কালো। এর কারণ হলো, বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে এক সময় গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের অন্যতম রপ্তানি দ্রব্য চামড়া তৈরির কারখানা। এই চামড়ার কারখানা থেকে প্রচুর বর্জ্য বুড়িগঙ্গা নদীতে গিয়ে পড়ার ফলে এর পানি দূষিত হচ্ছে।

সংবাদপত্র আর টেলিভিশনে বুড়িগঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ে প্রায়ই প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বুড়িগঙ্গার মতো বাংলাদেশের বেশির ভাগ নদীর পানি টেক্সটাইল মিল, ডাইং, রং তৈরির কারখান, সার কারখানা, কাগজ তৈরির কারখানা ইত্যাদি নানারকম শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ দিয়ে দূষিত হচ্ছে। নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার বা জাহাজ থেকে ফেলা মলমূত্র আর তেলজাতীয় পদার্থের মাধ্যমেও নদ-নদী আর সমুদ্রের পানি দূষিত হয়। নদীর ভাঙন, ঝড়-তুফান দিয়েও মাটি, ধূলিকণা বা অন্যান্য পদার্থ পানিতে মিশে পানিকে দূষিত করে। পরীক্ষাগার থেকে পরিত্যক্ত পানি যেখানে এসিড, ক্ষারসহ নানারকম রাসায়নিক পদার্থ থাকে, সেগুলোও পানিকে দূষিত করে। রাসায়নিক পদার্থ যেমন, আর্সেনিক দিয়ে ভূগর্ভের পানিদূষণের কথা এখন আমাদের সবারই জানা।

২.৫.১ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং মানুষের উপর পানিদূষণের প্রভাব

নদ-নদী, ডোবা-পুকুর, খাল-বিল এবং ভূগর্ভের উৎসের পানি দূষিত হলে সেটি উদ্ভিদ, প্রাণী আর মানুষের উপর নানারকম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে, এমনকি কখনো কখনো সেগুলো মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। পানিদূষণের এই সকল ক্ষতিকর দিকগুলো এবার তাহলে একটুখানি দেখে নেওয়া যাক।

তোমরা কি জান, টাইফয়েড, কলেরা, আমাশয়, সংক্রামক হেপাটাইটিস বি— এসবই পানিবাহিত রোগ? হ্যাঁ, এই সকল জীবন ধ্বংসকারী রোগসহ অনেক রোগ পানির মাধ্যমে ছড়ায়, এমনকি সতর্ক না হলে এই রোগগুলো মহামারী আকারও ধারণ করতে পারে। এসব রোগের জীবাণু নানাভাবে পানিতে প্রবেশ করে, বিশেষ করে মলমূত্র, পচা জিনিস দিয়ে সহজেই এটা ঘটে। সেই পানিতে গোসল করলে, সেই পানি পান করলে, কিংবা সেই পানি দিয়ে খাবার রান্না করলে বা ধোয়াধুয়ি করলে অথবা অন্য যেকোনোভাবে সেই দূষিত পানির সংস্পর্শে এলে সেটি মানুষ কিংবা অন্যান্য প্রাণীর দেহে সংক্রমিত হয়।

শুধু তা-ই নয়, কিছু কিছু জৈব পদার্থ আছে, যেমন- গোবর, গাছপালার ধ্বংসাবশেষ, খাদ্যের বর্জ্য সেগুলো পচনের সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। তোমরা বল তো এর ফলে

কী হতে পারে? বুঝতেই পারছ এর ফলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়। যদি ঐ সকল পদার্থ খুব বেশি থাকে, তাহলে পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ একেবারে শূন্যে নেমে আসতে পারে। তখন পানিতে বসবাসকারী মাছসহ সকল প্রাণী অক্সিজেনের অভাবে মারা যাবে। এ অবস্থা বেশি দিন চলতে থাকলে এক সময় ঐ সকল নদ-নদী, খাল-বিল প্রাণীশূন্য হয়ে পড়বে।

চিত্র ২.০৩

আমেরিকার উত্তর ওহাইও অঙ্গরাজ্যে ইরি (Erie) নামের একটি হ্রদ আছে, যাকে ১৯৬০ সালের দিকে মৃত হ্রদ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এর কারণ হলো, ঐ হ্রদের চারপাশে বেশ কয়েকটি ডিটারজেন্ট তৈরির কারখানা থেকে সৃষ্ট বর্জ্য ঐ হ্রদে ফেলার ফলে সেখানে ফসফেটের মাত্রা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। পানিতে ফসফেট আর নাইট্রোজেন খুব বেড়ে গেলে তা প্রচুর শ্যাওলা জন্মাতে সাহায্য করে। এই শ্যাওলাগুলো যখন মরে যায়, তখন পানিতে থাকা দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। এর ফলে পানিতে অক্সিজেনের অভাব দেখা দেয়। যার ফলে মাছসহ সকল প্রাণী মরে গিয়ে একপর্যায়ে ইরি "মৃত" একটি হ্রদে পরিণত হয়।

এ ঘটনার পর আমেরিকার সরকার আইন করে বিশুদ্ধকরণ ছাড়া শিল্প-কারখানার বর্জ্যপানি হ্রদে ফেলা নিষিদ্ধ করে দেয়। ডিটারজেন্ট কারখানাগুলো তারপর থেকে বর্জ্যপানি ফসফরাসমুক্ত করার পরে হ্রদে ফেলা শুরু করে এবং আশ্চর্যজনকভাবে, প্রায় দশ বছর পরে ইরি হ্রদে আবার প্রাণীর অস্তিত্ব ধরা পড়তে শুরু করে।

আমাদের বুড়িগঙ্গা নদীতে এখন কি মাছ পাওয়া যায়? না, পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এর অবস্থা অনেকটাই ইরি হ্রদের মতো। শুধু বুড়িগঙ্গা নদী নয়, আমাদের দেশের অনেক নদ-নদীর পানিই শিল্প-কারখানার সৃষ্ট বর্জ্যপানির কারণে দূষিত হয়ে পড়ছে, যার কারণে এদের অবস্থা ইরি হ্রদের মতো হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে আমাদের এখনই সতর্ক না হলে এটি ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। আশার কথা, বুড়িগঙ্গা এবং অন্যান্য নদীর পানি দূষণমুক্ত করার জন্যে নানা ধরনের পরিকল্পনা করে কাজ শুরু হয়েছে।

ময়লা-আবর্জনাসহ, শ্যাওলা জাতীয় উদ্ভিদ মরে গেলে একদিকে যেমন অক্সিজেন স্বল্পতার সৃষ্টি হয়, অন্যদিকে তেমনি পানিতে প্রচণ্ড দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। এতে করে পানিতে সাঁতার কাটা, মাছ ধরা, নৌকাভ্রমণসহ সব ধরনের বিনোদনমূলক কাজে ব্যাঘাত ঘটে।

তোমরা আগেই জেনেছ যে অজৈব পদার্থগুলো (যেমন- এসিড, ক্ষার, লবণ) পানিতে বসবাসকারী উদ্ভিদ

আর প্রাণীর জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পানিতে যদি ক্ষতিকর ধাতব পদার্থ (যেমন: পারদ, সিসা, আর্সেনিক ইত্যাদি) থাকে, তাহলে ঐ পানি পান করলে মানুষের শরীরে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। পারদ, সিসা আর আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব এরকম:

পারদ: মস্তিষ্ক বিকল হওয়া, ত্বকের ক্যান্সার, বিকলাঙ্গ হওয়া।

সিসা: বিতৃষ্ণাবোধ বা খিটখিটে মেজাজ, শরীরে জ্বালাপোড়া, রক্তশূন্যতা, কিডনি বিকল হওয়া, পরিমাণে খুব বেশি হলে মস্তিষ্ক বিকল হওয়া।

আর্সেনিক: আর্সেনিকোসিস, ত্বক এবং ফুসফুসের ক্যান্সার, পাকস্থলীর রোগ।

কৃষিজমিতে ব্যবহার করা অজৈব সার (নাইট্রেট ও ফসফেট) দিয়ে পানি দূষিত হলেও মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যেমন- ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, সিজিয়াম, রেডন প্রভৃতি দ্বারা পানি দূষিত হলে তা একদিকে যেমন জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য হুমকিস্বরূপ, অন্যদিকে তেমনি মানুষের জন্য মারাত্মক বিপজ্জনক। তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবদেহে নানা প্রকার ক্যান্সার আর শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি বলতে পারবে পানিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থ কীভাবে আসতে পারে? এর একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হলো (১১ মার্চ, ২০১১ সালে) জাপানের ফুকুশিমা শহরে ঘটে যাওয়া তেজস্ক্রিয় দুর্ঘটনা। ঐ দুর্ঘটনায় সুনামির কারণে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা থেকে প্রচুর তেজস্ক্রিয় পদার্থ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এতে পানি থেকে শুরু করে খাদ্যদ্রব্যেও প্রচুর তেজস্ক্রিয়তা পাওয়া গেছে।

এছাড়া পানিতে অদ্রবণীয় বস্তু থাকলে পানি ঘোলাটে হয়; এর ফলে কী ধরনের সমস্যা হয় সেটা তোমরা আগেই জেনেছ।

২.৬ বৈশ্বিক উষ্ণতা

২.৬.১ মিঠা পানিতে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি

বৈশ্বিক উষ্ণতা হলো বিশ্বের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা, যা বিভিন্ন কারণে দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বেড়ে গেলে পানির তাপমাত্রাও বেড়ে যাবে। প্রায় ১০০

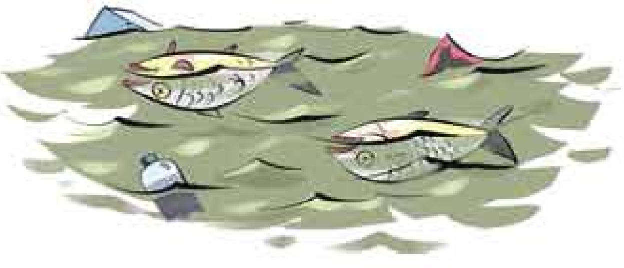

চিত্র ২.০৪

বছর আগে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা প্রায় ১° সেলসিয়াস কম ছিল। তোমরা হয়তো ভাবছ, ১০০ বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা মাত্র ১° সেলসিয়াস বেড়েছে, এটি আর এমনকি ব্যাপার! কিন্তু আসলে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার কারণ, তাপমাত্রা অল্প একটু বেড়ে গেলেই মেরু অঞ্চলসহ নানা জায়গায় সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করে। এ বরফ গলা পানি কোথায় যাবে? শেষ পর্যন্ত এই পানি সমুদ্রে গিয়েই পড়বে। এর ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। ফলে পৃথিবীর যে সকল দেশ নিচু, সেগুলো পানির নিচে তলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ হচ্ছে সেরকম নিচু এলাকার একটি দেশ!

লবণাক্ততা

সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি নদ-নদী, খাল- বিল, পুকুর, ভূগর্ভস্থ পানি আর হ্রদের পানিতে মিশে যাবে। এর কথায় পানির সকল উৎসই লবণাক্ত হয়ে পড়বে। পানির সকল উৎস লবণাক্ত হলে কী কী অসুবিধা হবে? প্রথমত মিঠা পানিতে বসবাসকারী জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীসমূহ মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এবং এক পর্যায়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তার কারণ, পানির তাপমাত্রা বাড়লে যেরকম পানির দ্রবীভূত অক্সিজেন কমে যায়, ঠিক সেরকম লবণাক্ততা বাড়লেও দ্রবীভূত অক্সিজেন অনেক কমে যাবে, যার ফলে জলজ প্রাণীরা আর বেঁচে থাকতে পারবে না। জলজ উদ্ভিদের বড় একটি অংশ লবণাক্ত পানিতে জন্মাতেও পারে না, বেড়ে উঠতেও পারে না, যে কারণে পানির জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়বে।

বৃষ্টিপাত

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ও ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটতে পারে। এ সংক্রান্ত কম্পিউটার মডেলিং থেকে ধারণা করা যায়, কোনো কোনো এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, আবার কোনো কোনো এলাকায়, বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাবে। বৃষ্টিপাত কমে গেলে খরা সৃষ্টি হয়, এমনকি বিস্তীর্ণ এলাকা মরুভূমিতেও পরিণত হতে পারে। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আর ধরন পরিবর্তন হলে নদ-নদী, খাল-বিলে পানির পরিমাণ এবং প্রবাহ পরিবর্তিত হবে, যা অনেক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। কম্পিউটার মডেলিং থেকে এটাও অনুমান করা যায়, কোনো এলাকায় শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে, যা থেকে অসময়ে বন্যা হতে পারে।

২.৬.২ বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব

বাংলাদেশে বৈশ্বিক উষ্ণতার একটি বড় প্রমাণ হলো, এখন গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ে, এমনকি মাঝে মাঝে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা ৪৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যায় যেটি আগে কখনো হয়নি। তাপমাত্রার উপাত্ত থেকে এটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল- দুই সময়েই তাপমাত্রা আগের তুলনায় বেশি

থাকে। অর্থাৎ বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাব স্পষ্টভাবেই বাংলাদেশে পড়তে শুরু করেছে। বাংলাদেশের মিঠা পানিতে এর প্রভাব কী হবে? তোমরা আগেই জেনেছ যে বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে পৃথিবীতে সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করবে এবং সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে যাবে। এর প্রভাব বাংলাদেশে অনেক বেশি তীব্র হবে, যার কারণে বঙ্গোপসাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে আমাদের দেশের প্রায় এক তৃতীয়াংশে অংশে পানির নিচে চলে যাবে। সাগরের লবণাক্ত পানি মূল ভূখন্ডে ঢোকার কারণে নদ-নদী, খাল-বিল আর ভূগর্ভের পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে। যার ফলে দেশে মিঠা পানি বলতে আর কিছু থাকবে না। তোমরা হয়তো জান যে, সাতক্ষীরাসহ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জেলায় চিংড়ি চাষের জন্য নালা কেটে লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে আনা হয়। এ কারণে ঐ সকল এলাকার ভূগর্ভের পানিসহ মিঠা পানির অন্যান্য উৎসও লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে খাওয়ার এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহার উপযোগী পানির তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। বলতে গেলে ঐ সকল এলাকার মিঠা পানির একমাত্র উৎস এখন বৃষ্টির পানি। এমনও দেখা গেছে যে প্রায় ১০-১৫টি গ্রামের মানুষ সবাই মিলে একটি পুকুরে বৃষ্টির পানি ধরে রাখে এবং সারা বছর সেই পানি ব্যবহার করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে পানি আনার জন্য গৃহবধূদের অনেক সময় ৭-৮ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পুকুরে ধরে রাখা পানি আনতে হয়। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে প্রায় পুরো বাংলাদেশেই এ অবস্থা হতে পারে।

ইতোমধ্যেই কয়েকটি দেশের অংশ বিশেষ (যেমন: মালদ্বীপ, ভারতের কিছু অংশে) বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে সাগরের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় পানির নিচে ডুবে গেছে এবং ঐ সকল দেশের জনসংখ্যার বড় একটি অংশ "জলবায়ু শরণার্থীতে" পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতার ফলে বৃষ্টিপাতের ধরন পাল্টে গিয়ে নদ-নদীতে পানির প্রবাহ আর গতিপথও পাল্টে যেতে পারে, যার প্রভাব হবে সুদূরপ্রসারী।

চিত্র ২.০৫

২.৭ বাংলাদেশে পানিদূষণ প্রতিরোধের কৌশল এবং নাগরিকের দায়িত্ব

পানি কীভাবে দূষিত হয় আমরা মোটামুটিভাবে সেটা জেনেছি। পানিদূষণ প্রতিরোধ করতে হলে দূষণের কারণগুলো জেনে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করাটাই হবে দূষণ প্রতিরোধের বড় কৌশল। পানিদূষণ প্রতিরোধে কী কী কৌশল অবলম্বন করা যায়, সেগুলো একটু দেখে নিই।

জলাভূমি রক্ষা

আজকাল আমাদের দেশে জলাভূমি ভরাট করে ঘর-বাড়ি, আবাসন এলাকা, শপিং মল ইত্যাদি তৈরি করা শুরু হয়েছে। তোমরা কি জান যে নিচু জলাভূমি পানি ধারণ করা ছাড়াও যে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে? জলাভূমি একদিকে পানি ধারণ করে যেমন বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে, অন্যদিকে তেমনি ক্ষতিকর পদার্থ শোষণ করে, ভূগর্ভে এবং নদীতে বিশুদ্ধ পানি সঞ্চালন করে এবং বন্যপ্রাণীদের সাহায্য করে। বনভূমিও কিন্তু ভূগর্ভে পানি সঞ্চালনে সাহায্য করে এবং একই সাথে বন্যপ্রাণীদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। এগুলো ধ্বংস হলে স্বাভাবিকভাবেই নদীর দূষণ বেড়ে যায়। জলাভূমি, বনভূমি রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হলে পানির দূষণ অনেক খানি কমে যাবে। এক্ষেত্রে নাগরিক সমাজও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এখন আমাদের দেশেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা বৃক্ষরোপণ করে, জলাভূমি, হ্রদ ও সমুদ্রের তীরে পরিচ্ছন্নতার কাজ করে পানির দূষণ রোধে জনসচেতনতামূলক কাজ করে যাচ্ছে- সেটি অনেক আশার কথা।

চিত্র ২.০৬

বৃষ্টির পানি নিয়ন্ত্রণ

শহরাঞ্চলে পানিদূষণের একটি বড় কারণ বৃষ্টির পানির প্রবাহ। তোমরা জান, শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটসহ বেশিরভাগ এলাকা পাকা হওয়ায় বৃষ্টির পানি এখন এর ভেতর দিয়ে ভূগর্ভে যেতে পারে না। ফলে বৃষ্টির পানি যাবতীয় ময়লা-আবর্জনা আর অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ নিয়ে নর্দমা আর নালা দিয়ে নদী, জলাশয় বা হ্রদে গিয়ে সেখানকার পানিকে দূষিত করে। কীভাবে এটি বন্ধ করা যায়?

বাসার ছাদে বৃষ্টির পানি কি সংগ্রহ করা সম্ভব? অবশ্যই এটি সম্ভব এবং খুব সহজেই তা করা যায়।

এভাবে সংগ্রহ করা পানি আমরা বাগান বা ফুলের টবে ব্যবহার করতে পারি, এমনকি কাপড়-চোপড় ধোয়া বা পায়খানায় শৌচ কাজেও ব্যবহার করতে পারি। এতে একদিকে যেমন পানির দূষণ বন্ধ হবে, অন্যদিকে তেমনি পানি সরবরাহের উপর চাপও কম পড়বে। তোমরা অনেকেই জান যে ঢাকা শহরে গ্রীষ্মকালে অনেক এলাকাতে পানির প্রচণ্ড অভাব থাকে। এমনও দেখা গেছে যে কোনো কোনো এলাকায় ৩-৪ দিন একটানা কোনো পানি পাওয়া যায় না। এরকম অবস্থায় বৃষ্টির পানি ধরে রেখে ব্যবহার করলে পুরো পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনায় সেটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। এক্ষেত্রে সরকার, সিটি কর্পোরেশন অথবা নাগরিক সমাজ সবাই নিজেদের মতো করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বাসা-বাড়ি ছাড়া অন্যান্য জায়গায় বৃষ্টির পানির দূষণ কীভাবে প্রতিরোধ করা যেতে পারে? আমরা কংক্রিটের বদলে কোনো ধরনের ছিদ্রযুক্ত পদার্থ ব্যবহার করতে পারি, যার ভিতর দিয়ে বৃষ্টির পানি ভূগর্ভে জমা হতে পারে। গ্রাভেল (Gravel) এরকম একটি পদার্থ, যা কংক্রিটের বদলে ব্যবহার করা যায়। আবার সম্ভব হলে বড় গর্ত বা খাল তৈরি করে সেখানেও বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা যায়। পৃথিবীর অনেক বড় শহরেই এ রকম ব্যবস্থা আছে।

জনসচেতনতা বৃদ্ধি

তোমরা কি বুঝতে পারছ যে শহরাঞ্চলে পানিদূষণকারী ক্ষতিকর বর্জ্যগুলোর বড় একটি অংশ আসে আমাদের বাসা-বাড়ি থেকে? আমরা অ্যারোসল, পেইন্টস, পরিষ্কারক, কীটনাশক নানারকম ক্ষতিকারক পদার্থ অহরহ ব্যবহার করি এবং ব্যবহারের পর অবিবেচকের মতো খালি কৌটা যেখানে-সেখানে ফেলে দিই বা রেখে দিই, যেগুলো একপর্যায়ে এসে পানি দূষণ করে। এগুলো এভাবে না ফেলে আমরা যদি যথাযথভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলি, তাহলেও কিন্তু পানিদূষণ অনেক কমে যাবে। এসব পদ্ধতিতে দূষণ কমানোর জন্য জনসচেতনতা বাড়ানোর কোনো বিকল্প নেই। এ জন্য রেডিও-টেলিভিশনে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান আর সতর্কবার্তা প্রচার করা যেতে পারে। এমনকি তোমরা স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা পানির প্রয়োজনীয়তা, অপ্রতুলতা এবং দূষণ প্রতিরোধ বিষয়ে পোস্টার তৈরি করে মানুষকে সচেতন করতে পার। ইউরোপ আমেরিকার মতো উন্নত দেশেও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সরকারিভাবে নানা ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

শিল্প-কারখানার দ্বারা পানির দূষণ প্রতিরোধ

শিল্প-কারখানার সৃষ্ট বর্জ্যপানি নদীর পানিদূষণের প্রধান একটি কারণ। এই দূষণ প্রতিরোধের সবচেয়ে ভালো উপায় হচ্ছে, সৃষ্ট বর্জ্যপানি পরিশোধন করে তারপর নদীতে ফেলা। এ পরিশোধন কাজের জন্য দরকার বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (Effluent Treatment Plant: ETP) বা ইটিপি। ইটিপি কীভাবে তৈরি করা হবে, সেটা নির্ভর করে বর্জ্যপানিতে কী ধরনের ক্ষতিকর পদার্থ আছে তার ওপর। যেহেতু একেক ধরনের শিল্প-কারখানা থেকে একেক ধরনের বর্জ্যপানি বের হয়, তাই একটি সাধারণ ইটিপি দিয়ে সব কারখানার বর্জ্যপানি পরিশোধন করা সম্ভব নয়। তবে একই ধরনের শিল্প-কারখানা দিয়ে

একটি শিল্পাঞ্চল গড়ে তুলে সব কারখানার বর্জ্যপানি একত্র করে একটি বড় ইটিপিতে পরিশোধন করা যেতে পারে।

কৃষিজমি থেকে মাটির ক্ষয়জনিত দূষণ প্রতিরোধ

একটি জমিতে বছরের পর বছর ফসল চাষ করলে ধীরে ধীরে তার উর্বরতা নষ্ট হয়, আর উর্বরতা নষ্ট হলে মাটির ক্ষয় অনেক বেড়ে যায়। আমরা যদি জৈব সার ব্যবহার করে মাটির উর্বরতা বাড়াই, তাহলে সেটি মাটির ক্ষয়রোধ করতে সাহায্য করে। তোমরা কি বলতে পার এটি কীভাবে সম্ভব?

মাটিতে জৈব সার থেকে আসা জৈব পদার্থ বেশি থাকে বলে সেটি বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে, বৃষ্টি হলে খুব সহজেই সেটি প্রবাহিত হয়ে যায় না বা মাটির কণা সহজে বাতাসে উড়ে গিয়ে নদীর পানি দূষিত করে না। এতে করে মাটির কণা ছাড়াও অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থ যেমন: কীটনাশক, নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের যৌগ ইত্যাদি দ্বারা দূষণও কমে যায়। আবাদি জমির চারপাশে পুকুর খনন করেও পানির দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

তোমরা কি জান ক্ষেত থেকে ফসল কাটার পর ফসলের যে অবশিষ্ট অংশ জমিতে থেকে যায়, সেগুলো পানির দূষণ রোধ করে? ফসলের ধরন পরিবর্তন করেও পানিদূষণ রোধ করা যায়। যখন-তখন সার প্রয়োগ না করে ঠিক সময়ে বিশেষ করে বৃষ্টিপাতের আগ মুহূর্তে সার প্রয়োগ না করে দূষণ প্রতিরোধ করা যায়।

উন্নয়ন কার্যক্রমে পানির ভূমিকা

আমাদের দেশ এখনো কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন অসম্ভব। আর সেই কৃষিকাজে সেচের জন্য দরকার পানি অর্থাৎ পানি ছাড়া কোনোভাবেই উন্নয়ন সম্ভব নয়। ঘর-বাড়ি কি পানি ছাড়া তৈরি হয়? না, অসম্ভব। আবার উন্নত বিশ্বের প্রতিটি দেশ শিল্পে অত্যন্ত উন্নত, এমন কোনো শিল্প কারখানা কি আছে, যেখানে পানির প্রয়োজন নেই? না, নেই। সকল শিল্প-কারখানায় কোনো না কোনো পর্যায়ে পানি ব্যবহার করতেই হয়। তাহলে আমরা বলতে পারি, উন্নয়ন এবং পানি একে অপরের পরিপূরক।

২.৮ বাংলাদেশে পানির উৎসে হুমকি

বাংলাদেশে যে সকল পানির উৎস রয়েছে (নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, হ্রদ) তোমরা কি মনে কর সেগুলো কোনো ধরনের হুমকির মধ্যে রয়েছে? হ্যাঁ, আমাদের পানির উৎসগুলো নিশ্চিতভাবেই বেশ কয়েকটি হুমকির মুখে রয়েছে। প্রথমেই বলা যায়, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে হুমকি। আমরা ইতোমধ্যে

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তনে আমাদের দেশে পানির উৎস কীভাবে হুমকির মাঝে পড়তে পারে সেটি আলোচনা করেছি। এখন অন্য কারণগুলো আলোচনা করা যাক।

বন্যা ও মাটির ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্ট হুমকি

বাংলাদেশ ভৌগোলিক কারণে বন্যাপ্রবণ একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি নদ-নদীই খরস্রোতা, যার একটি ফল হলো নদীভাঙন। নদীভাঙনের ফলে সৃষ্ট মাটি কোথায় যায় বলতে পারো? এই মাটি পানির স্রোতে মিশে যায় এবং এক পর্যায়ে নদীর তলায় জমা হয় ও ধীরে ধীরে নদী ভরাট হয়ে যায়। এতে একদিকে যেমন নদীর গতিপথ পাল্টে যায়, অন্যদিকে তেমনি নদী শুকিয়ে যেতে পারে বা মরেও যেতে পারে।

তোমরা কি জান, আমাদের দেশের অনেক নদী ইতোমধ্যেই মরে গেছে? করতোয়া, বিবিয়ানা, শাখা বরাক— এসব নদীই এখন মরা নদী। এমনকি একসময়ের খরস্রোতা পদ্মা নদীর অবস্থাও এখন সংকটাপন্ন। পদ্মা নদীর ওপর নির্মিত পাকশী ব্রিজের নিচে গরুর গাড়ি চলার দৃশ্য তোমরা অনেকেই দেখে থাকবে। এর কারণ হলো, নদী ভরাট হয়ে যাওয়া। নদী শুকিয়ে যাওয়ার অর্থই হলো পানিসম্পদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

নদী দখল

আজকাল নদী দখল করে নানা রকম স্থাপনা, এমনকি আবাসিক এলাকা পর্যন্ত গড়ে তোলা হচ্ছে। এর ফলে কী ঘটছে? নদীর গতিপথ সরু হয়ে যাচ্ছে এবং পানি ধারণক্ষমতা কমে যাচ্ছে। যে কারণে একটু ভারী বর্ষণ হলেই বন্যা হয়ে যাচ্ছে। বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যাসহ বেশ কয়েকটি নদী এভাবে দখল হয়ে যাওয়ার ফলে এখন এরা প্রায় মরতে বসেছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এগুলোও মরা নদীতে পরিণত হবে।

নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ

তোমরা কি অনুমান করতে পার যে,বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধও আমাদের পানিসম্পদের জন্য একটি হুমকি হতে পারে? হ্যাঁ, আসলেও কিন্তু ঠিক তাই। পদ্মা, যমুনাসহ বেশ কয়েকটি নদীতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ দেওয়ার ফলে এদের শাখা-প্রশাখায় পানির প্রবাহ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। মনোজ, বড়াল এবং কুমার নদ এ কারণে শুকিয়ে মরে গেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের মরিছাপ, হামকুড়া আর হরিহর নদীও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাধের জন্য মরে গেছে। কাজেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ আমাদের পানিসম্পদের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি।

অপরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

তোমরা কি জান, শুধু ঢাকা শহরে দৈনিক কি পরিমাণ কঠিন বর্জ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়? এর পরিমাণ দৈনিক প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন। এর মাত্র অর্ধেক পরিমাণ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে ব্যবস্থাপনার

আওতায় নিয়ে আসে এবং বাকি অর্ধেক নর্দমা বা নালা দিয়ে বা অন্য কোনো উপায়ে নদীতে গিয়ে পড়ে।

এছাড়া ঢাকার আশপাশের প্রায় সব শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্যও নদীতে ফেলা হয়। এর পরিনাম কী? নদী এসব বর্জ্য দিয়ে ভরে উঠছে, নদীর পানি বিষাক্ত হয়ে পড়ছে। এ অবস্থা চলতে থাকলে শিগগিরই বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষা ও বালু নদী মরে যাবে। চট্টগ্রাম শহরের আশেপাশের নদীগুলোরও একই অবস্থা।

পানির গতিপথ পরিবর্তন

১৯৭৫ সালে ভারত সরকার ফারাক্কা বাধ দিয়ে গঙ্গার পানির গতিপথ পরিবর্তন করে। ১৯৭৭ সালে গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে ভারতের সাথে বাংলাদেশের একটি চুক্তি হয়। পরবর্তীকালে পানির ন্যায্য হিস্যা পাওয়ার জন্য ১৯৯৬ সালে আরেকটি চুক্তি হয়। গঙ্গার পানির এই গতিপথ পরিবর্তনের কারণেই বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অনেক নদী পানিশূন্য হয়ে পড়েছে, যা ঐ অঞ্চলকে অনেকটা মরুভূমিতে পরিণত করেছে। শুধু তা-ই নয়, ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে ভারতও কাঙ্খিত ফল পায়নি বরং নানা ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সম্মুখিন হয়েছে। এছাড়া ভারত ব্রক্ষ্মপুত্র নদের পানির গতিপথও পরিবর্তন করে শিলিগুড়ি করিডর দিয়ে পশ্চিমাঞ্চলে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। এটি বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশের প্রায় ৩০০ বর্গকিলোমিটার হাওর এলাকাসহ পুরো দক্ষিণাঞ্চলে পানিসম্পদে বিপর্যয় নেমে আসবে। সম্প্রতি ভারত টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে, তাতেও বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলের বিশাল এলাকা পানিশূন্য হয়ে যেতে পারে। অতএব এ কথা বলা যায় যে পানির গতিপথ পরিবর্তন পরিবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ হুমকি।

পানি একটি মৌলিক অধিকার

পানি প্রকৃতির এমন একটি দান, যা প্রায় সব জীবের জন্য অপরিহার্য। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ খাওয়া, গোসল, রান্নাসহ অন্যান্য সকল কাজে পানি ব্যবহার করে আসছে। মানুষের পাঁচটি মৌলিক অধিকার হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা এবং চিকিৎসা। এর প্রত্যেকটিই পানির ওপর নির্ভরশীল। তাই পানি হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। আর যেহেতু এটি প্রাকৃতিক সম্পদ, কোনো দেশ বা জাতি এটি সৃষ্টি করেনি, তাই পানির প্রতিটি ফোঁটার উপর পৃথিবীর সব মানুষের অধিকার রয়েছে। কাজেই আমরা যখন পানি ব্যবহার করি, তখন মনে রাখতে হবে যে আমরা পৃথিবীর সকল মানুষের একটি সম্পদ ভোগ করছি এবং এটি কোনোমতেই অপচয় করা উচিত হয়। অপচয় করার অর্থই হলো অন্যের অধিকার খর্ব করা, যেটি আমরা কিছুতেই করতে পারি না।

পানির উৎস সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

আমরা সবাই জানি, আমাদের বিশাল একটি পানিসম্পদ আছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে ব্যবহারযোগ্য পানিসম্পদের পরিমাণ কিন্তু খুবই সীমিত। এ অবস্থায় আমরা যদি পানির উৎস সংরক্ষণে সজাগ না

হই, তাহলে একসময় হয়তো ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করতে হবে। যেকোনো ধরনের উন্নয়নকাজে, সেটি শিল্প-কারখানা, রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি বা নগরায়ণ— যা-ই হোক না কেন সবকিছুতেই পানির প্রয়োজন রয়েছে। আবার এই সকল উন্নয়নের কারণে যদি পানির উৎসগুলোই হুমকির মুখে পড়ে যায়, তাহলে প্রকৃতপক্ষে সব ধরনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই থমকে যাবে। কাজেই যেখানে-সেখানে শিল্প-কারখানা, নগরায়ণ না করে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপায়ে সেগুলো করতে হবে, যেন কোনোভাবেই পানির উৎসগুলো ক্ষতিগ্রস্থ না হয়।

২.৯ পানিপ্রবাহের সর্বজনীনতা এবং আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি

তোমরা কি জান, পৃথিবীর সব সাগর-মহাসাগর একটির সাথে আরেকটির সংযোগ আছে? হ্যাঁ, আমাদের সাগর-মহাসাগর বা সমুদ্র— সবগুলোই একটির সাথে আরেকটি সংযুক্ত। আবার পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে সৃষ্ট নদী এক সময়ে সাগরে গিয়ে পড়ে। অর্থাৎ একটি নদী বা সাগর যেখানেই থাকুক না কেন, যে দেশেই এর উৎপত্তি হোক না কেন বা যেখান দিয়েই এটি প্রবাহিত হোক না কেন, আসলে সেগুলো সারা পৃথিবীর সম্পদ। যার অর্থ পানিসম্পদ অবশ্যই একটি সর্বজনীন বিষয়। এটি কোনো জাতি-গোষ্ঠী, দেশ বা মহাদেশের সম্পদ নয়, এটি সবার সম্পদ। বিভিন্ন দেশের মাঝে সৃষ্ট রাজনৈতিক রেষারেষি, উন্নয়ন প্রতিযোগিতা, স্বার্থপর আচরণ এবং অসহিষ্ণু মনোভাবের কারণে পানিসম্পদের এই সর্বজনীনতা অনেক সময়েই মানা হচ্ছে না। তবে জাতিসংঘ ১৯৯৭ সালে বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীগুলোর ক্ষেত্রে পানির বণ্টন নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি তৈরি করে, যদিও চুক্তিটি এখন পর্যন্ত খুব একটা কার্যকর হয়নি। এছাড়া পানিসম্পদ-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো।

রামসার কনভেনশন

১৯৭১ সালের ২ ফেব্রুয়ারিতে ইরানের রামসারে ইউনেস্কোর উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে নেওয়া জলাভূমি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো হচ্ছে রামসার কনভেনশন। বাংলাদেশ ১৯৭৩ সালে এই সমঝোতা চুক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে স্বাক্ষর করে। পরবর্তী সময়ে ১৯৮২ ও ১৯৮৭ সালে রামসার কনভেনশন সংশোধন এবং পরিমার্জন করা হয়।

আন্তর্জাতিক নদী কনভেনশন (International Water Course Convention)

আন্তর্জাতিক আইন সমিতি (The International Law Association) ১৯৬৬ সালে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত তাদের ৫২তম সম্মেলনে আন্তর্জাতিক নদীগুলোর পানির ব্যবহার সম্পর্কে একটি কমিটি রিপোর্ট গ্রহণ করে। এটি হেলসিংকি নিয়ম নামে পরিচিত। পরবর্তী সময়ে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক

আইন কমিশন আন্তর্জাতিক পানির ব্যবহারের জন্য একটি চুক্তি তৈরি করে, যা ১৯৯৭ সালের ২১ মে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় কনভেনশন হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এই কনভেনশন অনুযায়ী একের অধিক দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীর পানি কোনো দেশই অন্য দেশের অনুমতি ছাড়া একতরফাভাবে ব্যবহার করতে পারবে না। এই রীতি অনুযায়ী দেশগুলো ন্যায়সঙ্গত এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে নিজ নিজ দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত অংশের পানি ব্যবহার করতে পারে, তবে অন্য দেশের অংশে পানিপ্রবাহে যাতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে সেটি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

আমরা কী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে এই নিয়মগুলো মেনে চলতে দেখছি?

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন উদ্ভিদটি পানিতে এবং স্থলে উভয় জায়গায় জন্মে?

(ক) শ্যাওলা (খ) সিংগারা

(গ) কলমি (ঘ) ক্ষুদিপানা

২. পানির pH-এর মান খুব কমে গেলে জলজ প্রাণীর—

i. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঠিকভাবে বিকশিত হবে না

ii. দেহাভ্যন্তরে খনিজ পদার্থ কমে যাবে

iii. রোগব্যাধি সৃষ্টি হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

অনিক ও তুষার দুজনে দুটি পুকুরে মাছ চাষ করে। অনিকের পুকুরের মাছের বৃদ্ধি সন্তোষজনক। আর তুষারের পুকুরের মাছগুলো দুর্বল; এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো সঠিকভাবে বিকশিত হয়নি। পরীক্ষা করে দেখা গেল অনিকের পুকুরের পানির pH ৭.৫ ও তুষারের পুকুরের পানির pH ৫.৫।

৩. অনিকের পুকুরের পানি কোন ধরনের?

(ক) এসিডিক (খ) ক্ষারীয়
(গ) নিরপেক্ষ (ঘ) ক্যালসিয়াম-সমৃদ্ধ

৪. তুষারের পুকুরের পানিতে নিচের কোনটি প্রয়োগ করা উচিত?

(ক) এসিড (খ) ক্ষার
(গ) ক্যালসিয়াম (ঘ) ফসফরাস

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. পাশের চিত্রটি দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

(ক) পানিতে দ্রবীভূত কোন গ্যাসের সাথে গ্লুকোজ বিক্রিয়া করে?
(খ) পানির পুনরাবর্তন বলতে কী বোঝায়?
(গ) নদীটি কোন ধরনের নদীতে পরিণত হতে পারে? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) তুমি কি মনে কর নদীটিকে জলজ প্রাণী বসবাসের উপযোগী করা সম্ভব? যুক্তিসহ মতামত দাও।

২. জমিলা খাতুন বাড়ির পাশের পুকুরের ঘোলা পানিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রান্নার উপযোগী করেন। অপরদিকে রতন সাহেব তার পানি বোতলজাতকরণ কারখানায় ও ঔষধ তৈরির কারখানার পানিকে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করেন।

(ক) পানির স্ফুটনাঙ্ক কাকে বলে?
(খ) জলজ উদ্ভিদ পানির স্রোতে ভেঙে যায় না কেন?
(গ) জমিলা খাতুন পুকুরের পানিকে কীভাবে রান্নার উপযোগী করেন? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) রতন সাহেব তার দুই করখানার কাজে ব্যবহার করা পানি কি একইভাবে জীবাণুমুক্ত ও বিশুদ্ধ করেন? যুক্তিসহ মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

হৃদ্‌যন্ত্রের যত কথা

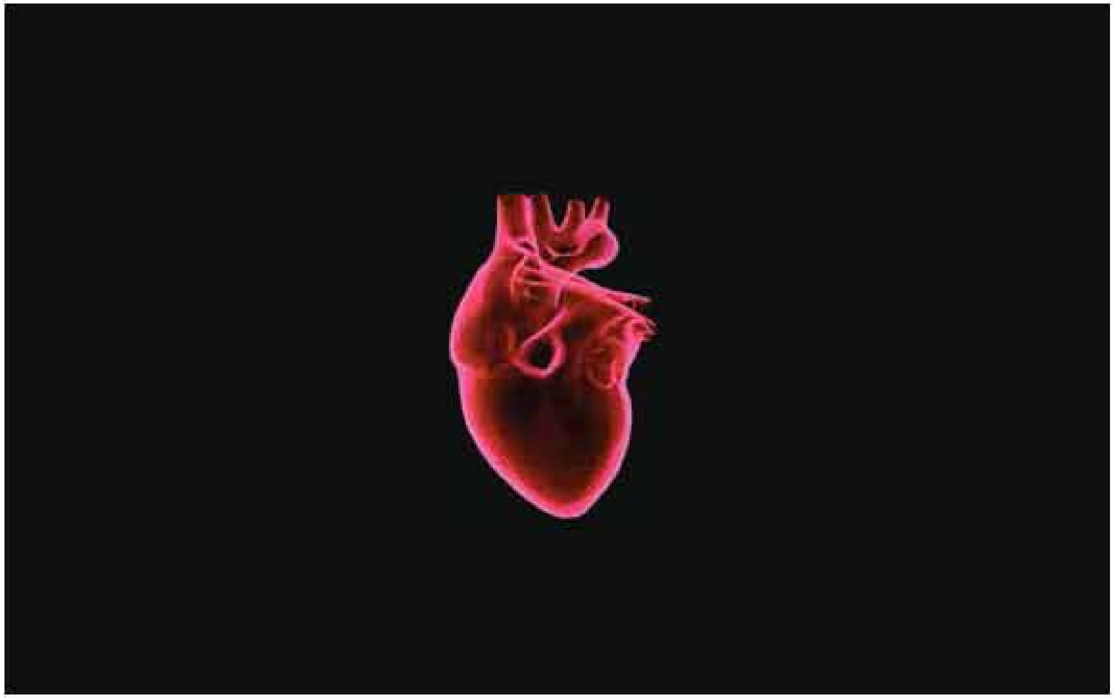

মানুষ ও অন্যান্য উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের দেহে যেসব তন্ত্র আছে, তার মধ্যে রক্ত সংবহনতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। কারণ, এই তন্ত্রের মাধ্যমে দেহের যাবতীয় বিপাকীয় কাজের রসদ সারা শরীরে পরিবাহিত হয়। রক্ত সংবহনতন্ত্র গঠিত হয়েছে রক্ত, হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহিকা নিয়ে। হৃৎপিণ্ড হচ্ছে হৃৎপেশি দিয়ে তৈরি ত্রিকোণাকার ফাঁপা প্রকোষ্ঠযুক্ত পাম্পের মতো একটি অঙ্গ। এর সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে সারা দেহে রক্ত সরবরাহিত হয়। আকার, আকৃতি ও কাজের ভিত্তিতে রক্তবাহিকা তিন রকম— ধমনি, শিরা ও কৈশিক জালিকা। রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতর দিয়ে সঞ্চালনের জন্য হৃৎপিণ্ড মানব ও অন্য সকল প্রাণীদেহে পাম্পের মতো কাজ করে। ধমনি দিয়ে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে সারা দেহে বাহিত হয়। সাধারণত কার্বন ডাই-অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে শিরার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে। ধমনি ও শিরার সংযোগস্থল জালিকাকারে বিন্যস্ত হয়ে কৈশিক জালিকা গঠন করে। আমরা এ অধ্যায়ে রক্ত এবং রক্ত সঞ্চালনের যাবতীয় বিষয় সম্বন্ধে জানতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- রক্তের উপাদান এবং এদের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের গ্রুপের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তের স্থানান্তরের নীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্ত গ্রহণে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে বিঘ্নতা/বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ এবং এর ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালন কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আদর্শ রক্তচাপ, হার্টবিট, হার্টরেট এবং পালসরেটের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারব।
- রক্তচাপজনিত শারীরিক সমস্যা সৃষ্টির কারণ ও প্রতিরোধের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- শরীরে রক্ত সঞ্চালনে কোলেস্টেরলের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারব।
- কোলেস্টেরলকে প্রত্যাশিত সীমায় রাখার প্রয়োজনীয়তা ও উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রক্তে সুগারের ভারসাম্যতার কারণ, প্রতিরোধ ও প্রতিকারে করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- হৃদযন্ত্রকে ভালো রাখার উপায় বর্ণনা করতে পারব।

৩.১ রক্ত (Blood)

প্রাণীদেহের রক্ত একধরনের লাল বর্ণের অস্বচ্ছ, আন্তঃকোষীয় লবণাক্ত এবং খানিকটা ক্ষারধর্মী তরল যোজক টিস্যু। একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ মানুষের দেহে প্রায় ৫-৬ লিটার রক্ত থাকে, যেটি মানুষের দেহের মোট ওজনের প্রায় ৮%। মানুষ এবং অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদেহের রক্ত লাল রঙের। রক্তের রসে লাল রংয়ের হিমোগ্লোবিন নামে লৌহ-ঘটিত প্রোটিন জাতীয় পদার্থ থাকায় রক্তের রং লাল। হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অক্সিহিমোগ্লোবিন যৌগ গঠন করে অক্সিজেন পরিবহন করে। কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড হিমোগ্লোবিনের সাথে যুক্ত হয়ে ফুসফুসে পরিবাহিত হয়, তবে কার্বন ডাই-অক্সাইডের সিংহভাগ বাইকার্বনেট আয়ন হিসেবে রক্ত দ্বারা ফুসফুসে পরিবাহিত হয়।

রক্তের উপাদান ও এদের কাজ:

রক্তের প্রধান উপাদানগুলো হলো রক্তরস বা প্লাজমা এবং রক্তকণিকা (চিত্র ৩.০১)। সমগ্র রক্তের ৫৫% রক্তরস এবং বাকি ৪৫% রক্তকণিকা। রক্তরসকে আলাদা করলে এটি হলুদ বর্ণের দেখায় এবং রক্তকণিকাগুলো এই রক্তরসে ভাসমান থাকে।

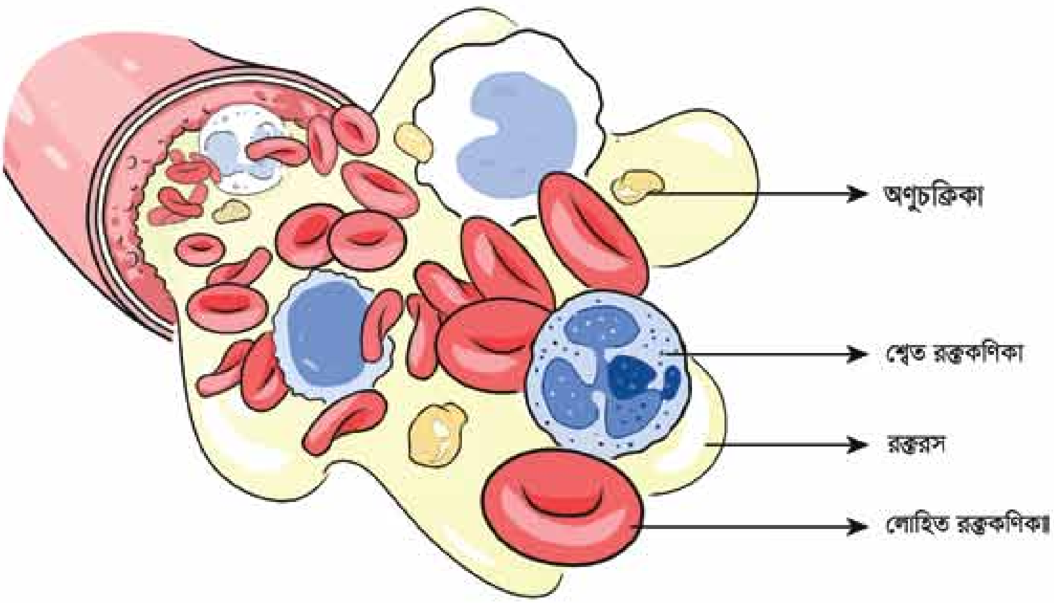

চিত্র ৩.০১: মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদান

৩.১.১ রক্তরস বা প্লাজমা

রক্তের তরল অংশকে প্লাজমা বলে। রক্তরসের প্রায় ৯০% পানি, বাকি ১০% দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে বিভিন্ন রকমের জৈব এবং অজৈব পদার্থ। অজৈব পদার্থগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খনিজ পদার্থের আয়ন, যেমন, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ, আয়োডিন এবং O_2, CO_2 এবং N_2 জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ। জৈব পদার্থগুলো হলো:

১. খাদ্যসার: গ্লুকোজ, অ্যামিনো এসিড, স্নেহপদার্থ, ভিটামিন ইত্যাদি।

২. রেচন পদার্থ: ইউরিয়া, ইউরিক এসিড, অ্যামোনিয়া, ক্রিয়েটিনিন ইত্যাদি।

৩. প্রোটিন: ফাইব্রিনোজেন, গ্লোবিউলিন, অ্যালবুমিন, প্রোথ্রম্বিন ইত্যাদি।

৪. প্রতিরক্ষামূলক দ্রব্যাদি: অ্যান্টিটক্সিন, অ্যাগ্লুটিনিন ইত্যাদি।

৫. অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন।

৬. কোলেস্টেরল, লেসিথিন, বিলিরুবিন ইত্যাদি নানা ধরনের যৌগ।

রক্তরসের কাজগুলো হচ্ছে:

১. রক্তকণিকাসহ রক্তরসে দ্রবীভূত খাদ্যসার দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত করা।

২. টিস্যু থেকে বর্জ্য পদার্থ নির্গত করে, সেগুলো রেচনের জন্য বৃক্কে পরিবহন করা।

৩. শ্বসনের ফলে কোষের সৃষ্ট CO_2 কে বাইকার্বনেট হিসেবে ফুসফুসে পরিবহন করা।

৪. রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো পরিবহন করা।

৫. হরমোন, এনজাইম, লিপিড প্রভৃতি দেহের বিভিন্ন অংশে বহন করা।

৬. রক্তের অম্ল-ক্ষারের ভারসাম্য রক্ষা করা।

সিরাম:

রক্ত থেকে রক্তকণিকা এবং রক্ত জমাট বাঁধার জন্য যে প্রয়োজনীয় প্রোটিন আছে, সেটাকে সরিয়ে নেওয়ার পর যে তরলটি রয়ে যায়, তাকে সিরাম বলে। অন্যভাবে বলা যায়, রক্ত জমাট বাঁধার পর যে হালকা হলুদ রংয়ের স্বচ্ছ রস পাওয়া যায়, তাকে সিরাম বলে। রক্তরস বা প্লাজমা এবং সিরামের মাঝে পার্থক্য হলো রক্তরসে রক্ত জমাট বাঁধার প্রয়োজনীয় প্রোটিন থাকে, সিরামে সেটি থাকে না।

৩.১.২ রক্তকণিকা

রক্তরসের মধ্যে ছড়ানো বিভিন্ন রকমের কোষকে রক্তকণিকা বলে। রক্তকণিকাগুলো প্রধানত তিন রকমের, যথা:

(ক) লোহিত রক্তকণিকা বা এরিথ্রোসাইট

(খ) শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট এবং

(গ) অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট।

লোহিত রক্তকণিকা

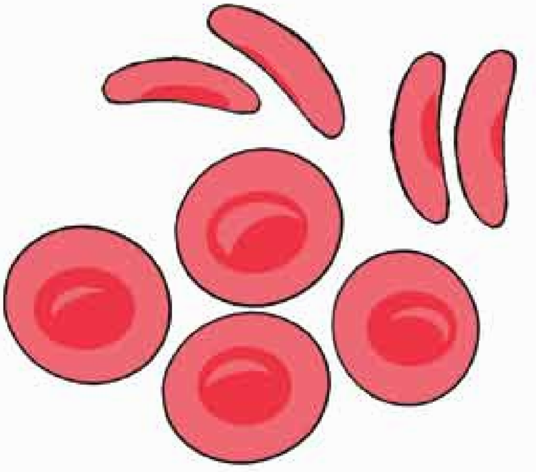

চিত্র ৩.০২: লোহিত রক্ত কণিকা

মানবদেহের পরিণত লোহিত রক্তকণিকা দ্বি-অবতল এবং চাকতি আকৃতির (চিত্র ৩.০২)। এতে হিমোগ্লোবিন নামে রঞ্জক পদার্থ থাকার কারণে দেখতে লাল বর্ণের হয়। এজন্য এদেরকে Red Blood Cell বা RBC বলে। অন্যভাবে বলা যায়, লোহিত কণিকা প্রকৃতপক্ষে হিমোগ্লোবিন ভর্তি চ্যাপ্টা আকৃতির ভাসমান ব্যাগ। এ কারণে লোহিত কণিকা অধিক পরিমাণ অক্সিজেন পরিবহন করতে পারে। লোহিত কণিকাগুলোর বিভাজন হয় না। এ কণিকাগুলো সর্বক্ষণই অস্থিমজ্জার ভিতরে উৎপন্ন হতে থাকে এবং উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে চলে আসে। মানুষের লোহিত কণিকার আয়ু প্রায় চার মাস অর্থাৎ ১২০ দিন। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের লোহিত রক্তকণিকাগুলো উৎপন্ন হওয়ার পর রক্তরসে আসার পূর্বে নিউক্লিয়াসবিহীন হয়ে যায়। অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্ষেত্রে এরকম ঘটে না অর্থাৎ এদের লোহিত কণিকাগুলোতে নিউক্লিয়াস থাকে। লোহিত কণিকা প্লীহা (Spleen) তে সঞ্চিত থাকে এবং তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে প্লীহা থেকে লোহিত কণিকা রক্তরসে সরবরাহ হয়।

বিভিন্ন বয়সের মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে গড়ে লোহিত কণিকার সংখ্যা ভিন্ন। যেমন ভ্রূণ দেহে: ৮০-৯০ লাখ; শিশুর দেহে: ৬০-৭০ লাখ; পূর্ণবয়স্ক পুরুষ দেহে: ৪.৫-৫.৫ লাখ এবং পূর্ণবয়স্ক নারীর দেহে: ৪.০-৫.০ লাখ।

লোহিত কণিকার কাজ

লোহিত রক্তকণিকার প্রধান কাজ হলো:

১. দেহের প্রতিটি কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করা।

২. নিষ্কাশনের জন্য কিছু পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইডকে টিস্যু থেকে ফুসফুসে বহন করা।

৩. হিমোগ্লোবিনের সাহায্যে রক্তের অম্ল-ক্ষারের সমতা বজায় রাখার জন্য বাফার হিসেবে কাজ করা।

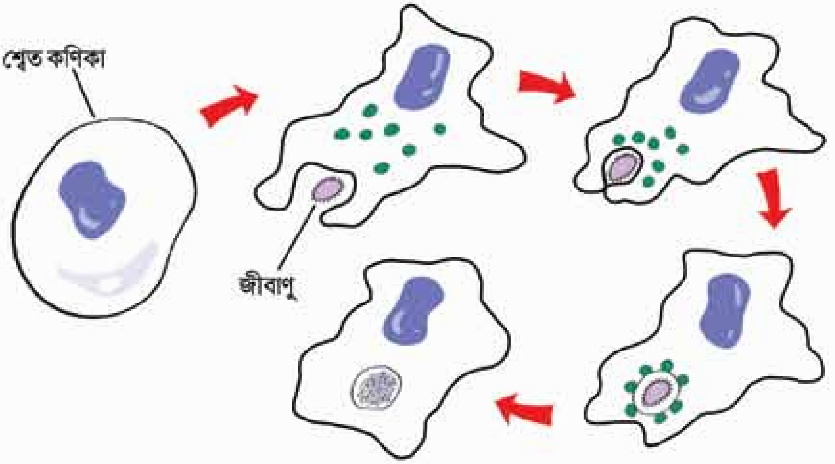

চিত্র ৩.০৩: শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় জীবাণুকে ধ্বংস করছে।

শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট

শ্বেত কণিকার নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই। এগুলো হিমোগ্লোবিনবিহীন এবং নিউক্লিয়াসযুক্ত বড় আকারের কোষ। শ্বেত কণিকার গড় আয়ু ১-১৫ দিন। হিমোগ্লোবিন না থাকার কারণে এদের শ্বেত রক্তকণিকা, ইংরেজিতে White Blood Cell বা WBC বলে। শ্বেত কণিকার সংখ্যা RBC-এর তুলনায় অনেক কম। এরা অ্যামিবার মতো দেহের আকারের পরিবর্তন করে। ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় (চিত্র ৩.০৩) এটি জীবাণুকে ধ্বংস করে। শ্বেত কণিকাগুলো রক্তরসের মধ্য দিয়ে নিজেরাই চলতে পারে। রক্ত জালিকার প্রাচীর ভেদ করে টিস্যুর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। দেহ বাইরের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে দ্রুত শ্বেত কণিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে ৪-১০ হাজার শ্বেত রক্তকণিকা থাকে। অসুস্থ মানবদেহে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। শ্বেত রক্ত কণিকায় DNA থাকে।

প্রকারভেদ: গঠনগতভাবে এবং সাইটোপ্লাজমে দানার উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি অনুসারে শ্বেত কণিকাকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৩.০৪), যথা (ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট বা দানাবিহীন এবং (খ) গ্রানুলোসাইট বা দানাযুক্ত।

(ক) অ্যাগ্রানুলোসাইট

এ ধরনের শ্বেত কণিকাগুলোর সাইটোপ্লাজম দানাহীন ও স্বচ্ছ। অ্যাগ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকা দুই রকমের; যথা-লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। দেহের লিম্ফনোড, টনসিল, প্লীহা ইত্যাদি অংশে এরা তৈরি হয়। লিম্ফোসাইটগুলো বড় নিউক্লিয়াসযুক্ত ছোট কণিকা। মনোসাইট ছোট, ডিম্বাকার ও বৃক্কাকার নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট বড় কণিকা। লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি গঠন করে এবং এই অ্যান্টিবডির দ্বারা দেহে

প্রবেশ করা রোগ-জীবাণু ধ্বংস করে। এভাবে দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়ায় রোগ-জীবাণুকে ধ্বংস করে।

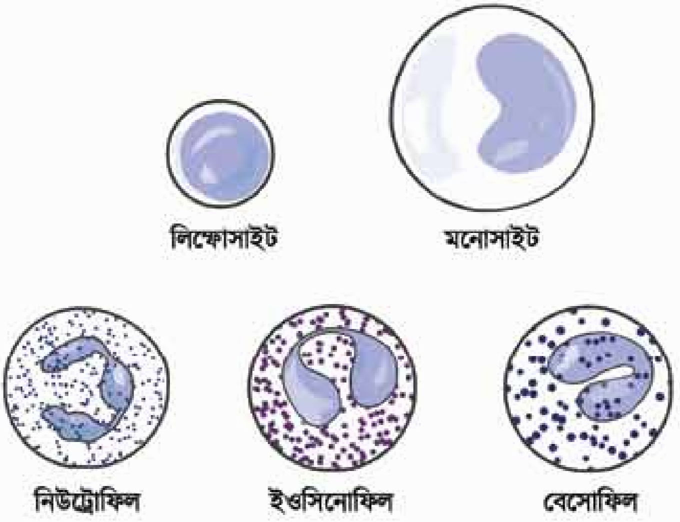

চিত্র ৩.০৪: বিভিন্ন প্রকার শ্বেত কণিকা

(খ) গ্রানুলোসাইট

এদের সাইটোপ্লাজম সূক্ষ্ম দানাযুক্ত। গ্রানুলোসাইট শ্বেত কণিকাগুলো নিউক্লিয়াসের আকৃতির ভিত্তিতে তিন প্রকার যথা: নিউট্রোফিল, ইওসিনোফিল এবং বেসোফিল।

নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস প্রক্রিয়া জীবাণু ভক্ষণ করে। ইওসিনোফিল ও বেসোফিল হিস্টামিন নামক রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত করে দেহে এলার্জি প্রতিরোধ করে। বেসোফিল হেপারিন নিঃসৃত করে রক্তকে রক্তবাহিকার ভেতরে জমাট বাঁধতে বাধা দেয়।

অণুচক্রিকা বা থ্রম্বোসাইট

ইংরেজিতে এদেরকে প্লেইটলেট (Platelet) বলে। এগুলো গোলাকার, ডিম্বাকার অথবা রড আকারের হতে পারে। এদের সাইটোপ্লাজম দানাদার এবং সাইটোপ্লাজমে কোষ অঙ্গাণু- মাইটোকন্ড্রিয়া, গলগি বস্তু থাকে; কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে না। অনেকের মতে, অণুচক্রিকাগুলো সম্পূর্ণ

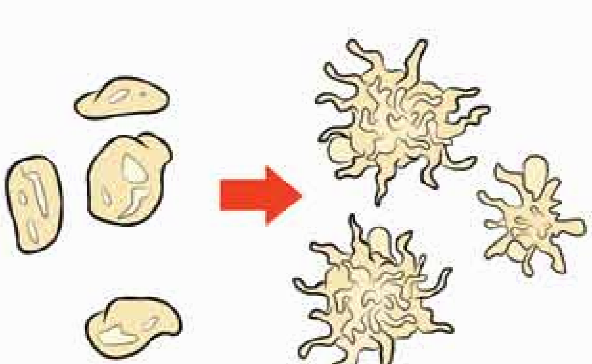

চিত্র ৩.০৫: অণুচক্রিকা এবং তার আকার পরিবর্তন

কোষ নয়; এগুলো অস্থিমজ্জার বৃহদাকার কোষের ছিন্ন অংশ। অণুচক্রিকাগুলোর গড় আয়ু ৫-১০ দিন। পরিণত মানবদেহে প্রতি ঘনমিলিমিটার রক্তে অণুচক্রিকার সংখ্যা প্রায় আড়াই লাখ। অসুস্থ দেহে এদের সংখ্যা আরো বেশি হয়।

অণুচক্রিকার প্রধান কাজ হলো রক্ত তঞ্চন করা বা জমাট বাঁধানোতে (blood clotting) সাহায্য করা। যখন কোনো রক্তবাহিকা বা কোনো টিস্যু আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কেটে যায়, তখন সেখানকার অণুচক্রিকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে অনিয়মিত আকার ধারণ করে (চিত্র ৩.০৫) এবং থ্রম্বোপ্লাসটিন (Thromboplastin) নামক পদার্থ তৈরি করে। এ পদার্থগুলো রক্তের প্রোটিন প্রোথ্রমবিনকে থ্রমবিনে পরিণত করে। থ্রমবিন পরবর্তী কালে রক্তরসের প্রোটিন- ফাইব্রিনোজেনকে ফাইব্রিন জালকে পরিণত করে রক্তকে জমাট বাধায় কিংবা রক্তের তঞ্চন ঘটায়। ফাইব্রিন একধরনের অদ্রবণীয় প্রোটিন, যা দ্রুত সুতার মতো জালিকা প্রস্তুত করে। এটি ক্ষত স্থানে জমাট বাঁধে এবং রক্তক্ষরণ বন্ধ করে। তবে রক্ত তঞ্চন প্রক্রিয়াটি আরও জটিল, এ প্রক্রিয়ার জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ এবং ভিটামিন K ও ক্যালসিয়াম আয়ন জড়িত থাকে।

একক কাজ

কাজ: লোহিত কণিকা, শ্বেত কণিকা এবং অণুচক্রিকার মধ্যে পার্থক্যগুলো ছকে লিখ।

৩.১.৩ রক্তের সাধারণ কাজ

১. শ্বাসকার্য: রক্ত অক্সিজেনকে ফুসফুস থেকে টিস্যু কোষে এবং টিস্যু কোষ থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডকে ফুসফুসে পরিবহন করে। লোহিত কণিকা ও রক্তরস প্রধানত এ কাজটি করে।

২. হরমোন পরিবহন: অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হরমোন দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

৩. খাদ্যসার পরিবহন: দেহের সঞ্চয় ভান্ডার থেকে এবং পরিপাককৃত খাদ্যসার দেহের টিস্যু কোষগুলোতে বহন করে।

৪. বর্জ্য পরিবহন: নাইট্রোজেনঘটিত বর্জ্য পদার্থগুলোকে কিডনি বা বৃক্ক পরিবহন করে।

৫. উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ: দেহে তাপের বিস্তৃতি ঘটিয়ে দেহের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।

৬. রোগ প্রতিরোধ: দেহে রোগজীবাণু প্রবেশ করলে মনোসাইট ও নিউট্রোফিল জাতীয় শ্বেত কণিকা ফ্যাগোসাইটোসিস পদ্ধতিতে জীবাণুকে গ্রাস করে ধ্বংস করে। লিম্ফোসাইট-জাতীয় শ্বেত কণিকা অ্যান্টিবডি গঠন করে দেহের ভিতরের জীবাণুকে ধ্বংস করে এবং বাইরের থেকে জীবাণুর আক্রমণকে প্রতিহত করে।

প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের স্বাভাবিক মান:

১. লোহিত রক্তকণিকা: (পুরুষ) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪.৫-৫.৫ লাখ
(নারী) প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪-৫ লাখ

২. শ্বেত কণিকা: প্রতি ঘনমিলিমিটারে ৪০০০-১০,০০০

(i) নিউট্রোফিল: ৪০-৭৫%
(ii) ইওসিনোফিল: ১-৬%
(iii) মনোসাইট: ২-১০%
(iv) লিম্ফোসাইট: ২০-৪৫%
(v) বেসোফিল: ০-১%

} সর্বমোট স্বাভাবিক WBC এর মানের শতকরা হার।

৩. হিমোগ্লোবিন } পুরুষ: ১৪-৪৬ g/dL
নারী: ১২-১৪ g/dL

৪. অণুচক্রিকা: ১ প্রতি ঘনমিলিমিটার ৫০,০০০-৪,০০,০০০

অন্যান্য জৈব পদার্থ :

(i) সিরাম ইউরিয়া: ১৫-৪০ mg/dL

(ii) সিরাম ক্রিয়েটিনিন: ০.৫-১.৫ mg/dL

(iii) কোলেস্টেরল: ০-২০০ mg/dL

(iv) বিলিরুবিন: ০.২-১.০ mg/dL

(v) রক্ত শর্করা (আহারের পূর্বে) স্বাভাবিক সীমা: ৪-৬ mmol/L

(dL = ডেসিলিটার)

৩.১.৪ রক্ত উপাদানের অস্বাভাবিক অবস্থা

মানুষের রক্তের বিভিন্ন উপাদানের তারতম্য ঘটলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাকে রক্তের অস্বাভাবিক অবস্থা বলা হয়। যেমন:

১. পলিসাইথিমিয়া: লোহিত রক্তকণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বৃদ্ধি পাওয়া।

২. অ্যানিমিয়া: লোহিত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যাওয়া অথবা হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় কমে যাওয়া।

৩. লিউকেমিয়া: নিউমোনিয়া, প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি রোগে শ্বেত কণিকার সংখ্যা বেড়ে যায়। কিন্তু যদি শ্বেত কণিকার সংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে ৫০,০০০-১,০০০,০০০ হয়, তাহলে তাকে লিউকেমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার বলে।

৪. লিউকোসাইটোসিস: শ্বেত কণিকার সংখ্যা স্বাভাবিক অবস্থার মান থেকে বেড়ে যদি ২০,০০০-৩০,০০০ হয়, তাকে লিউকোসাইটোসিস বলে। নিউমোনিয়া, হুপিং কাশি ইত্যাদি রোগে এ অবস্থা হয়।

৫. থ্রম্বোসাইটোসিস: এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় বেড়ে যায়। রক্তনালির অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়াকে থ্রম্বোসিস বলে। হৃৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালির রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থম্বোসিস এবং গুরু মস্তিষ্কের রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে।

৬. পারপুরা: ডেঙ্গুজ্বরে আক্রান্ত হলে এ অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় অণুচক্রিকার সংখ্যা স্বাভাবিকের তুলনায় কমে যায়।

৭. থ্যালাসেমিয়া: থ্যালাসেমিয়া একধরনের বংশগত রক্তের রোগ। এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয়। হিমোগ্লোবিনের অস্বাভাবিকতার কারণে লোহিত রক্তকণিকা ভেঙে যায়, ফলে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়। এ রোগটি মানুষের অটোজোমে অবস্থিত প্রচ্ছন্ন জিনের দ্বারা ঘটে। যখন মাতা ও পিতা উভয়ের অটোজোমে এ জিনটি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাদের সন্তানদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন জিন দুটি একত্রিত হয়ে এই রোগের প্রকাশ ঘটায়। সাধারণত শিশু অবস্থায় থ্যালাসেমিয়া রোগটি শনাক্ত হয়। এ রোগের জন্য রোগীকে প্রতি ৩ মাস অন্তর রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তশূন্যতার হার কমে যায়।

৩.২ রক্তের গ্রুপ

৩.২.১ অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি

একজনের রক্তের সাথে আরেকজনের রক্ত মেশানো হলে কেন সেটি কখনো কখনো স্বাভাবিকভাবে মিশে যায় আবার কেন কখনো কখনো গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায় সেটি বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের দুটি বিষয় বুঝতে হবে, একটি হচ্ছে অ্যান্টিজেন, অন্যটি হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন হচ্ছে বহিরাগত কোনো বস্তু বা প্রোটিন, যেটি আমাদের রক্তে প্রবেশ করলে আমাদের শরীরের নিরাপত্তাব্যবস্থা (Immune System) সেটাকে শরীরের জন্য ক্ষতিকর মনে করে তাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের রক্ত যে পদার্থ তৈরি করে, সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিবডি। অ্যান্টিজেন এবং তাকে

২০২৫

প্রতিরোধ করার জন্য সৃষ্ট অ্যান্টিবডি যখন একই দ্রবণে থাকে, তখন একটি বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে। অ্যান্টিজেনকে আক্রমণ করার এই বিক্রিয়াকে অ্যান্টিবডি-অ্যান্টিজেন বিক্রিয়া বলা যায় এবং রক্তের মাঝে এই বিক্রিয়ার কারণে রক্ত কণিকাগুলো গুচ্ছবদ্ধ হয়ে যায়।

১৯০০ সালে ড. কার্ল ল্যান্টস্টেইনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন, বিভিন্ন মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় দুই ধরনের অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই এই দুইটি অ্যান্টিজেনকে প্রতিরোধ করার জন্য বিভিন্ন মানুষের সিরামে (যে তরলে লোহিত কণিকা ভাসমান থাকে) দুটি অ্যান্টিবডি পাওয়া যায়। লোহিত কণিকায় থাকা এই দুটি অ্যান্টিজেনকে A এবং B নাম দেওয়া হয়েছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ একজন মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় যদি A অ্যান্টিজেন থাকে তাহলে কোনোভাবেই তার রক্তে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকতে পারবে না- যদি থাকে তাহলে এই অ্যান্টিবডি নিজেই নিজের রক্তের লোহিত কণিকাকে আক্রমণ করে মৃত্যুর কারণ হয়ে যাবে। A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি না থাকলেও, B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি থাকে। একইভাবে যে রক্তের লোহিত কণিকায় B অ্যান্টিজেন আছে সেখানে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।

অ্যান্টিজেন এবং তার অ্যান্টিবডির বিষয়টি বুঝে থাকলে আমরা মানুষের রক্ত কীভাবে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে সেটি বুঝতে পারব।

যদি লোহিত রক্ত কণিকায় A এবং B এই দুটি অ্যান্টিজেন থাকা সম্ভব হয় তাহলে আমরা রক্তকে নিচের চারভাগে ভাগ করতে পারি:

গ্রুপ A	রক্তে অ্যান্টিজেন A	সিরামে A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই। B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ B	রক্তে অ্যান্টিজেন B	সিরামে B অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি নেই, শুধু A অ্যান্টিজেনের অ্যান্টিবডি আছে।
গ্রুপ AB	রক্তে অ্যান্টিজেন A এবং B দুটোই আছে।	সিরামে A কিংবা B কারো অ্যান্টিবডি নেই থাকা সম্ভব নয়।
গ্রুপ O	রক্তে A কিংবা B কোনো অ্যান্টিজেন নেই।	সিরামে A এবং B দুটো অ্যান্টিজেনেরই অ্যান্টিবডি আছে।

এখন তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে কোন মানুষের কোন গ্রুপের রক্ত দেওয়া সম্ভব।

O গ্রুপের রক্তের লোহিত কণিকায় যেহেতু কোনো অ্যান্টিজেনই নেই তাকে যেকোনো গ্রুপেই দেওয়া সম্ভব। সেই গ্রুপে যে অ্যান্টিবডিই থাকুক, কোনো ক্ষতি করা সম্ভব নয়। এজন্য O গ্রুপকে বলা হয়

ইউনিভার্সাল ডোনার।

আবার অন্যদিকে AB গ্রুপের রক্ত, নিজের গ্রুপ ছাড়া অন্য কোনো গ্রুপকে দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ অন্য সব গ্রুপেই কোনো না কোনো অ্যান্টিবডি আছে এবং AB গ্রুপ দুটো অ্যান্টিজেনই থাকার কারণে যে কোনো একটি বা দুটি অ্যান্টিবডিই লোহিত কণিকাকে আক্রান্ত করে গুচ্ছবদ্ধ করে দেয়।

A গ্রুপ এবং B গ্রুপের রক্ত নিজের গ্রুপ ছাড়া শুধু AB গ্রুপকে দেওয়া যেতে পারে, কারণ AB গ্রুপে কোনো অ্যান্টিবডি নেই, তাই A কিংবা B অ্যান্টিজেনকে আক্রান্ত করতে পারবে না।

আবার আমরা যদি গ্রহীতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি তাহলে উল্টোটা দেখতে পাব। O গ্রুপ কারো রক্তই নিতে পারবে না, কারণ অন্য কোনো গ্রুপের সিরামে দুই ধরনের অ্যান্টিবডিই আছে। অন্যদিকে AB গ্রুপ সবার রক্তই নিতে পারবে কারণ তার সিরামে কোনো ধরনের অ্যান্টিবডিই নেই। এজন্য AB কে বলা হয় Universal Acceptor.

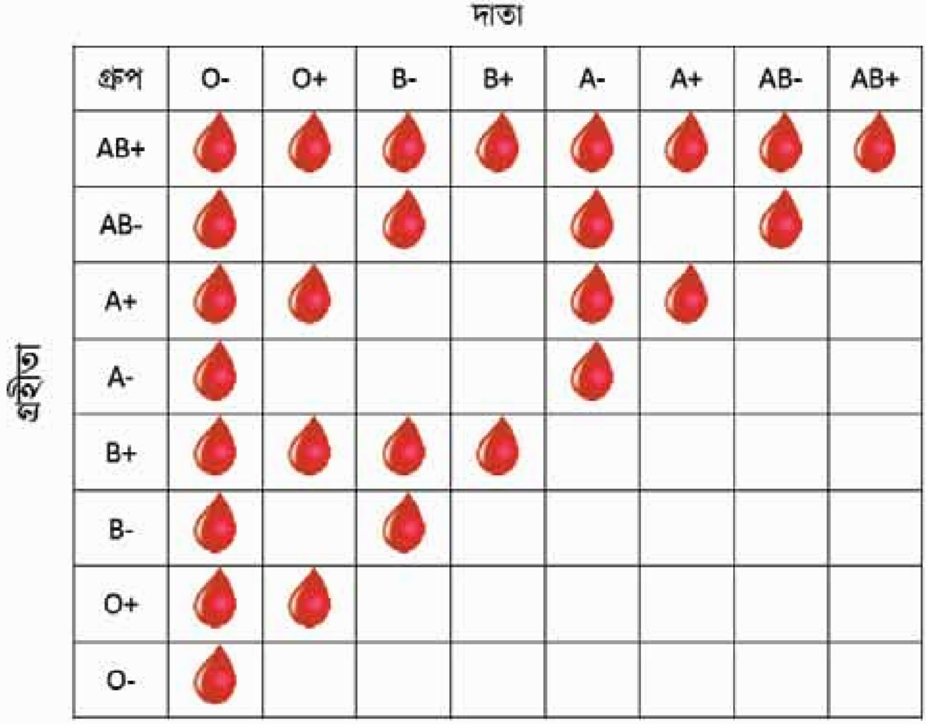

চিত্র ৩.০৬: কোন গ্রুপের রক্ত কাকে দেওয়া যাবে।

৩.২.২ Rh ফ্যাক্টর

এতক্ষণ পর্যন্ত যে বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে, সেটি কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ এখন পর্যন্ত রক্তের গ্রুপের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাজনের কথা বলা হয়নি। তোমরা যারা রক্ত গ্রুপের সাথে পরিচিত, তারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, রক্তের গ্রুপ বোঝানোর সময় শুধু A, B, AB কিংবা O বলা হয় না, সবসময়েই এর পর একটি প্লাস বা মাইনাস যুক্ত করা হয় (যেমন A+, O- ইত্যাদি)। এই প্লাস বা মাইনাস চিহ্নটি কোথা থেকে আসে?

রেসাস নামের বানরের লোহিত রক্তকণিকায় এক ধরনের অ্যান্টিজেন রয়েছে যেটি অনেক মানুষের রক্তের লোহিত কণিকায় পাওয়া যায়। এই বানরের নাম অনুসারে এটাকে Rhesus Factor বা সংক্ষেপে Rh ফ্যাক্টর বলে। যাদের শরীরে এই অ্যান্টিজেন পাওয়া যায়, তাদের রক্তকে Rh+ এবং যাদের শরীরে এটি নেই, তাদের রক্তকে Rh- বলা হয়। রক্তের গ্রুপের পিছনে যে প্লাস এবং মাইনাস চিহ্নটি থাকে, সেটি এই Rh ফ্যাক্টর ছাড়া অন্য কিছু নয়।

তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ Rh- রক্ত সবসময়ই Rh+ বিশিষ্ট রক্তের মানুষকে দেওয়া সম্ভব (চিত্র ৩.০৬) কিন্তু উল্টোটা এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে । Rh- রক্তবিশিষ্ট মানুষকে Rh+ বিশিষ্ট রক্ত দিয়ে প্রথমবার গ্রহীতার কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না কিন্তু ধীরে ধীরে গ্রহীতার রক্ত রসে Rh+ অ্যান্টিজেনের বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। কাজেই দ্বিতীয়বার Rh+ বিশিষ্ট রক্ত দেওয়া হলে এই অ্যান্টিবডি Rh+ রক্তের লোহিত কণিকার সাথে বিক্রিয়া করে রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেবে। তবে একবার Rh+ বিশিষ্ট রক্ত গ্রহণ করার পর যদি গ্রহীতা আর ঐ রক্ত গ্রহণ না করে তাহলে ধীরে ধীরে তার শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি নষ্ট হয়ে যায় এবং গ্রহীতা তার স্বাভাবিক রক্ত ফিরে পায়।

সন্তানসম্ভবা মায়েদের জন্য এই Rh ফ্যাক্টরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি মায়ের রক্ত Rh- এবং বাবার রক্ত Rh+ হয় তাহলে তাদের সন্তান হবে Rh+ বিশিষ্ট, কারণ Rh+ একটি 'প্রকট' বৈশিষ্ট্য (অর্থাৎ এটি Dominate করে)। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ প্ল্যাসেন্টা বা 'অমরা'-এর মাধ্যমে মায়ের জরায়ুর সাথে যুক্ত থাকে। সন্তানের Rh+ রক্ত প্ল্যাসেন্টার মাধ্যমে মায়ের রক্তে পৌঁছাবে এবং মায়ের রক্তরসে Rh+ এর বিপরীত অ্যান্টিবডি তৈরি হবে। যেহেতু এই অ্যান্টিবডি খুব ধীরে ধীরে তৈরি হয়, তাই প্রথম সন্তানের বেলায় মায়ের রক্তের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের দেহে পৌঁছে তার রক্তের কোনো ক্ষতি করতে পারে না এবং একজন সুস্থ সন্তান জন্ম নেয় (চিত্র ৩.০৭)।

তবে দ্বিতীয় সন্তান গর্ভধারণ করার পর মায়ের শরীরের Rh+ এর অ্যান্টিবডি সন্তানের রক্তে প্রবেশ করতে থাকে এবং ভ্রূণের লোহিত কণিকা ধ্বংস করে, ভ্রূণ বিনষ্ট হয়, অনেক সময় গর্ভপাত হয়। সন্তান জীবিত জন্ম নিলেও তার প্রচন্ড রক্তস্বল্পতা থাকে এবং জন্মের পর জন্ডিস রোগ দেখা দেয়।

এজন্য বিয়ের আগেই হবু বর-কনের রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে নেওয়া উচিত এবং প্রয়োজনে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

২০২৫

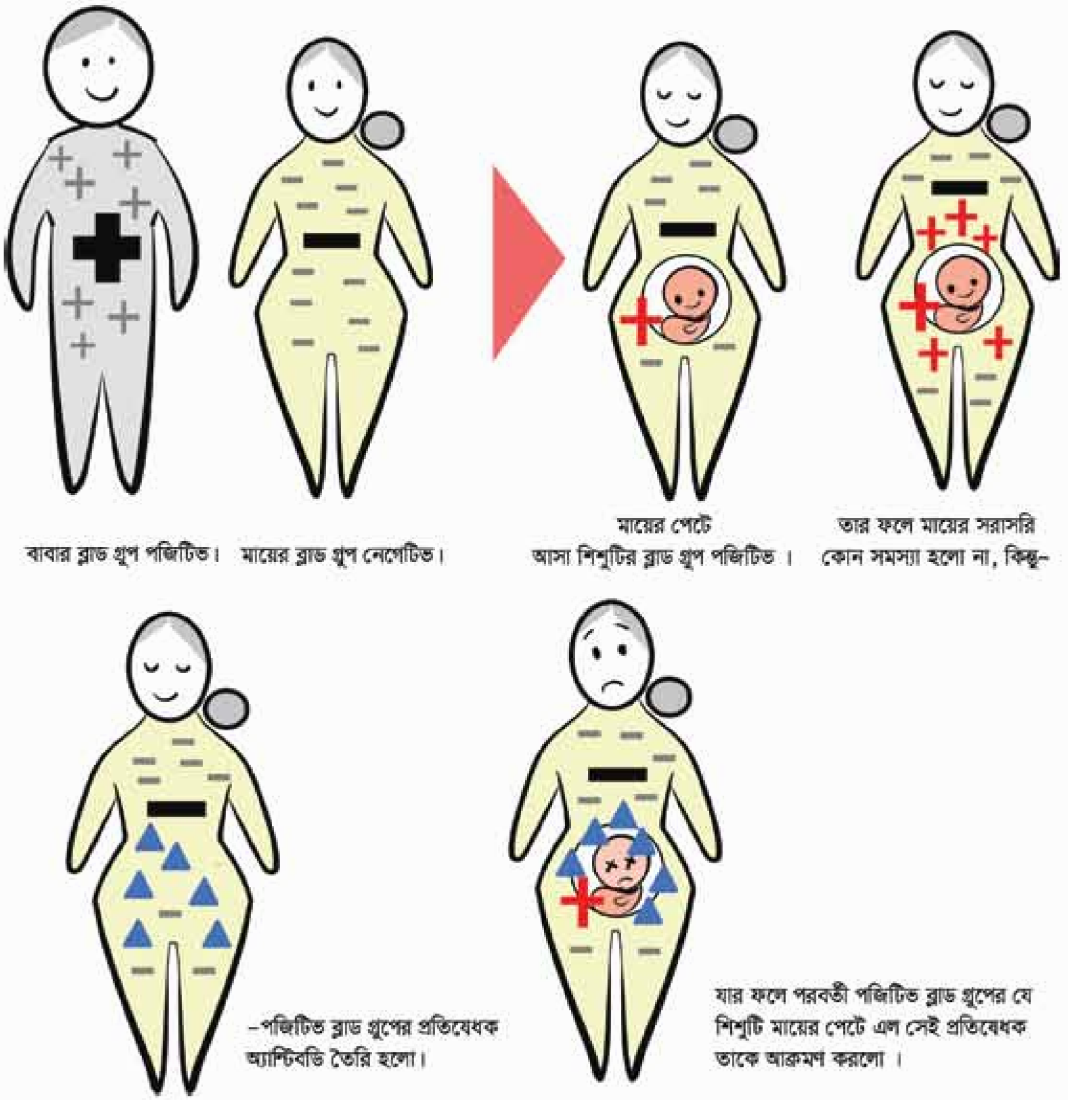

চিত্র ৩.০৭: মায়ের রক্ত Rh– এবং বাবার রক্ত Rh+ হলে সন্তানের জটিলতা হতে পারে।

একক কাজ

কাজ: কোন গ্রুপের রক্ত কোন গ্রুপ নিতে পারবে, সেই তথ্য ব্যবহার করে পরের ছকে গ্রহীতার গ্রুপ বের করো।

২০২৫

	দাতা								
	Type	A+	A-	B+	B-	AB+	AB-	O+	O-
গ্রহীতা		√	√					√	√
				√	√				√
									√
			√		√		√		√
		√	√	√	√	√	√	√	√
								√	√
			√						√
									√

৩.২.৩ রক্তের শ্রেণিবিভাগের গুরুত্ব

১. কোনো দাতার রক্ত গ্রহীতার দেহে দেওয়ার আগে সবসময়েই দুজনের রক্তের গ্রুপ জানার জন্য পরীক্ষা করে নেওয়া খুব জরুরি। ভুল গ্রুপের রক্ত দেওয়া হলে গ্রহীতার রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে প্রাণহানির কারণ হতে পারে। খুবই জরুরি অবস্থায় যদি গ্রহীতার রক্তের গ্রুপ জানা সম্ভব না হয়, তাহলে O এবং Rh নেগেটিভ রক্ত দেয়াই সবচেয়ে নিরাপদ।

২. কোনো শিশুর পিতৃত্ব নির্ণয়ে জটিলতা দেখা দিলে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করে অনেক সময় তার সমাধান করা যায়।

৩. রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের মাধ্যমে বিশেষ প্রক্রিয়ায় অপরাধীদের শণাক্তকরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

রক্ত নীতি

মানুষের অসুস্থতা কিংবা দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত রক্তের ঘাটতি দেখা দিলে অন্য মানুষের শরীর থেকে রক্ত দেওয়ার বা রক্ত সঞ্চারণের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে অবশ্যই জীবাণুমুক্ত এবং সঠিক গ্রুপের রক্ত নিশ্চিত করে নিতে হয়। রক্ত সঞ্চারণের আগে রক্তে এইডস, জন্ডিস— এধরনের জটিল রোগের জীবাণু আছে কি না তাও পরীক্ষা করে নিতে হয়। ডাক্তার অবশ্য রোগী ও দাতার রক্তে A, B, O ও Rh ব্লাড গ্রুপ পরীক্ষা করে গ্রুপ ম্যাচ করার মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে রক্ত সঞ্চারনের উদ্যোগ নেন। সঠিকভাবে গ্রুপ ম্যাচ না করে রক্ত সঞ্চারণ করা হলে মানুষের শরীরে বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে।

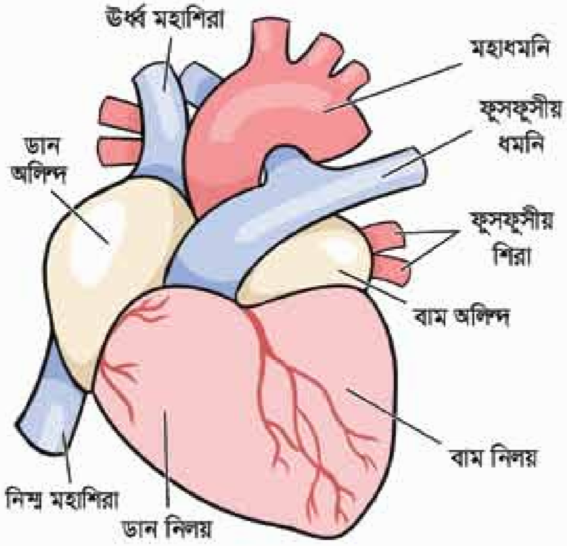

চিত্র ৩.০৮: হৃৎপিণ্ড

৩.৩ রক্ত সঞ্চালন

এ অধ্যায়ের শুরুতে আমরা জেনেছি যে রক্তসংবহনতন্ত্রের দ্বারা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়। মানবদেহে রক্ত সংবহনতন্ত্রের প্রধান অংশগুলো হলো: হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা। এগুলোর কাজ সম্পর্কে জানার আগে এগুলোর গঠন সম্পর্কে জানা দরকার, তাই প্রথমে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক:

৩.৩.১ হৃৎপিণ্ড (Heart)

হৃৎপিণ্ড রক্ত সংবহনতন্ত্রের অন্তর্গত একরকমের পাম্প। হৃৎপিণ্ড অনবরত সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায়।

মানুষের হৃৎপিণ্ড বক্ষগহ্বরে ফুসফুস দুটির মাঝখানে এবং মধ্যচ্ছদার ওপরে অবস্থিত। হৃৎপিণ্ডের প্রশস্ত প্রান্তটি ওপরের দিকে এবং চুঁচালো প্রান্তটি নিচের দিকে বিন্যস্ত থাকে (চিত্র: ৩.০৮)।

হৃৎপিণ্ডটি দ্বিস্তরী পেরিকার্ডিয়াম পর্দা দিয়ে বেষ্টিত থাকে। উভয় স্তরের মাঝে পেরিকার্ডিয়াল ফ্লুইড থাকে, যেটি হৃৎপিণ্ডকে সংকোচনে সাহায্য করে। মানুষের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত। ওপরের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান এবং বাম অলিন্দ (Atrium) এবং নিচের প্রকোষ্ঠ দুটিকে যথাক্রমে ডান ও বাম নিলয় (Ventricles) বলে। দুটি অলিন্দের ভেতরকার প্রাচীর পাতলা কিন্তু নিলয় দুটির প্রাচীর পুরু এবং পেশিবহুল। ডান অলিন্দের সঙ্গে একটি ঊর্ধ্ব মহাশিরা এবং একটি নিম্ন মহাশিরা যুক্ত থাকে।

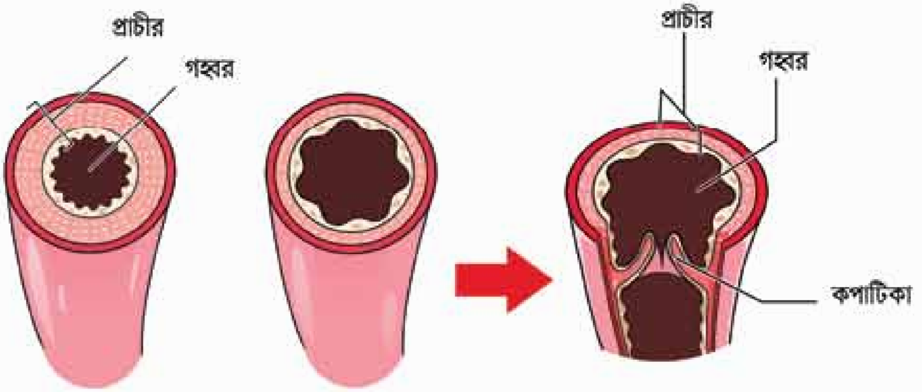

চিত্র ৩.০৯: ধমনি এবং শিরার প্রস্থচ্ছেদ

বাম নিলয়ের সঙ্গে চারটি পালমোনারি শিরা যুক্ত থাকে। ডান নিলয় থেকে ফুসফুসীয় ধমনি এবং বাম নিলয় থেকে মহাধমনি উৎপত্তি হয়েছে।

ধমনি

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে বাহিত হয়, তাকে ধমনি বা আর্টারি বলে। ধমনির প্রাচীর পুরু এবং তিনটি স্তরে গঠিত। এদের গহ্বর ছোট (চিত্র ৩.০৯)। ধমনিতে কোনো কপাটিকা থাকে না। ফলে ধমনি দিয়ে রক্ত বেগে প্রবাহিত হয়।

ধমনির স্পন্দন আছে। ধমনি শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয় এবং এদের শাখা ধমনি এবং অ্যার্টেরিওল বলে। এগুলো ক্রমশ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে অবশেষে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কৈশিক জালিকায় শেষ হয়। ধমনির মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত পরিবাহিত হয়। তবে ফুসফুসীয় ধমনি এর ব্যতিক্রম, এই রক্তনালি দিয়ে হৃৎপিণ্ড ফুসফুসে রক্ত প্রেরণ করে বলে এটিকে ধমনি (Pulmonary Artery) বলা হলেও এটি কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত পরিবহন করে।

শিরা

যেসব রক্তনালির মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড-পূর্ণ রক্ত দেহের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে, তাদের শিরা বলে। তবে পালমোনারি শিরা এর ব্যতিক্রম। এর মাধ্যমে রক্ত হৃৎপিণ্ডে ফিরে আসে বলে এটিকে শিরা বলা হয়। তবে এই শিরা ফুসফুস থেকে অক্সিজেন-সমৃদ্ধ রক্ত

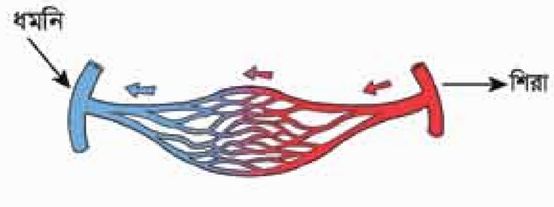

চিত্র ৩.১০: কৈশিক জালিকা

হৃৎপিণ্ডে নিয়ে আসে। শিরার প্রাচীর ধমনির মতো ৩টি স্তরে গঠিত হলেও প্রাচীর বেশ পাতলা এবং গহ্বরটি বড় (চিত্র ৩.০৯)। শিরায় কপাটিকা থাকায় শিরা দিয়ে রক্ত ধীরে ধীরে একমুখে প্রবাহিত হয়।

ধমনি প্রান্তের কৌশিক জালিকাগুলো ক্রমশ একত্রিত হয়ে প্রথমে সূক্ষ্ম শিরা বা উপশিরা গঠন করে। উপশিরাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে পরে শিরা গঠন করে। কতগুলো শিরা মিলে মহাশিরা গঠন করে। এভাবে শিরা কৈশিক জালিকা থেকে শুরু হয় এবং হৃৎপিণ্ডে শেষ হয়।

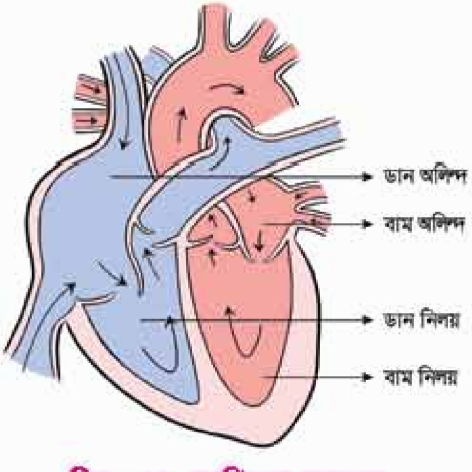

চিত্র ৩.১১: হৃৎপিণ্ডের লম্বচ্ছেদ

কৈশিক জালিকা

ধমনি ও শিরার সংযোগস্থলে অবস্থিত কেবল এক স্তরবিশিষ্ট এন্ডোথেলিয়াম দিয়ে গঠিত যেসব সূক্ষ্ম রক্তনালি জালকের আকারে বিন্যস্ত থাকে, সেগুলোকে কৈশিক জালিকা বলে (চিত্র ৩.১০)। কৈশিক জালিকার রক্ত ও কোষের মধ্যে ব্যাপন প্রক্রিয়ার দ্বারা পুষ্টিদ্রব্য, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রেচন পদার্থ ইত্যাদির আদান-প্রদান ঘটে।

৩.৩.২ হৃৎপিণ্ডের কাজ

আমরা পূর্বে জেনেছি, মানুষের রক্ত সংবহনতন্ত্র হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা এবং কৈশিক জালিকা নিয়ে গঠিত। মানুষের হৃৎপিণ্ড অবিরাম সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে ধমনি ও শিরার মাধ্যমে রক্ত সংবহন করে। হৃৎপিণ্ড পাম্পের মতো নির্দিষ্ট তালে ও ছন্দে সংকুচিত এবং প্রসারিত হয়ে সারা দেহে রক্ত সঞ্চালন ঘটায় (চিত্র ৩.১১)।

হৃৎপিণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত সংকোচনকে সিস্টোল (systole) এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রসারণকে ডায়াস্টোল (diastole) বলে। উল্লেখ্য, অলিন্দে যখন সিস্টোল হয়, নিলয় তখন ডায়াস্টোল অবস্থায় থাকে।

মানবদেহের রক্ত সংবহন ৩.১২ চিত্রে দেখানো হয়েছে।

হার্ট-বিট

আমরা আগেই বলেছি, হৃৎপিণ্ড একটি স্বয়ংক্রিয় পাম্পের মতো দেহের ভিতরে সারাক্ষণ ছন্দের তালে স্পন্দিত হয়। হৃৎপিণ্ডের এই স্পন্দনকে হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিট বলে। এই হৃৎস্পন্দনের মাধ্যমে হৃৎপিণ্ড আমাদের শরীরে রক্ত প্রবাহিত করে।

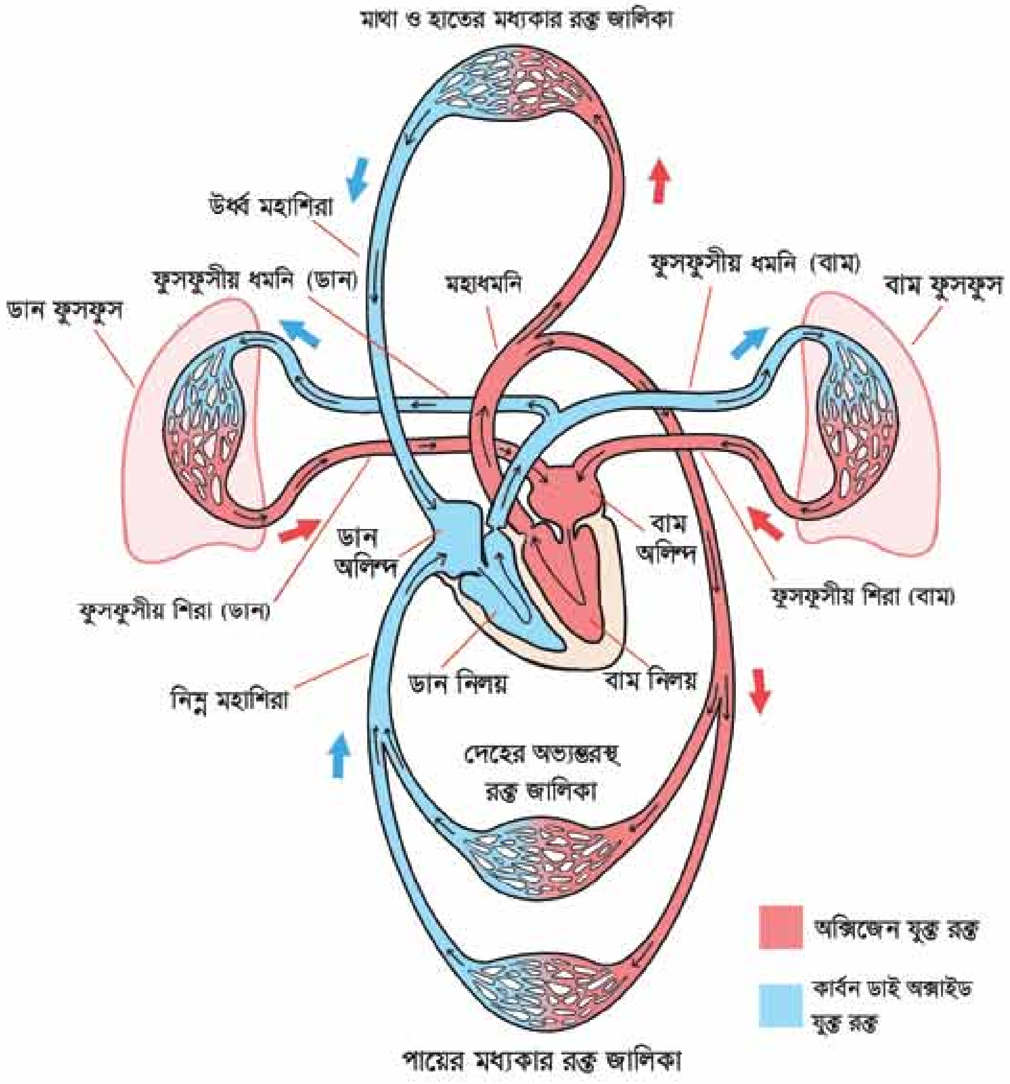

চিত্র ৩.১২: মানবদেহের রক্ত সংবহন

হার্ট-বিট বা হৃৎস্পন্দন একটি জটিল বিষয়। মানুষের হৃৎপিণ্ড মায়োজনিক (myogenic) অর্থাৎ বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়া হৃদপেশি নিজে থেকে সংকোচন ও প্রসারণের দ্বারা হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে। একটি হৃৎস্পন্দন হৃৎপিণ্ডে পর পর সংঘটিত ঘটনার সমষ্টিকে কার্ডিয়াক চক্র বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রক্ত দেহের ভেতর গতিশীল থাকে। কার্ডিয়াক চক্র চারটি ধাপে (চিত্র ৩.১৩: ক, খ, গ, এবং ঘ) সম্পন্ন হয়:

২০২৫

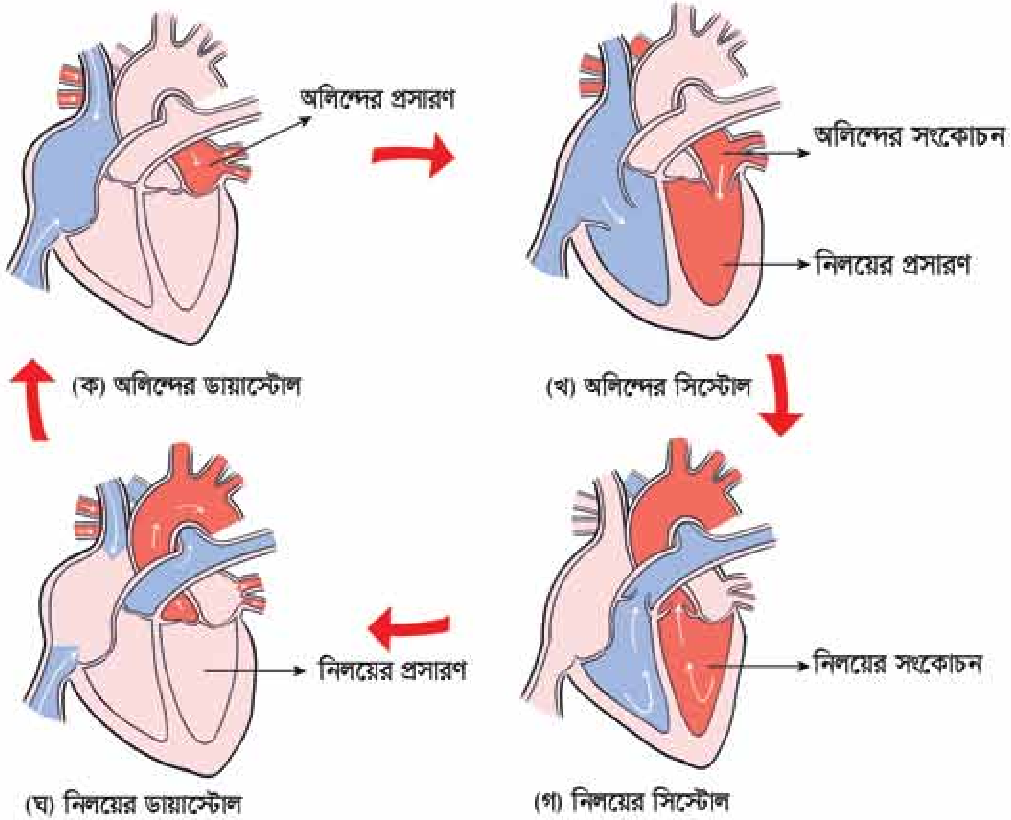

চিত্র ৩.১৩: কার্ডিয়াক চক্র

(ক) অলিন্দের ডায়াস্টোল: এ সময় অলিন্দ দুটি প্রসারিত অবস্থায় থাকে। ফলে সারা শরীরের CO_2 যুক্ত রক্ত ঊর্ধ্ব এবং নিম্ন মহাশিরা দিয়ে ডান অলিন্দে এবং ফুসফুস থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে প্রবেশ করে।

(খ) অলিন্দের সিস্টোল: অলিন্দ দুটি রক্তপূর্ণ হলে এ দুটি সংকুচিত হয়। ডান অলিন্দ থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ডান নিলয় এবং বাম অলিন্দ থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে আসে।

(গ) নিলয়ের সিস্টোল: নিলয় দুটি রক্তপূর্ণ অবস্থায় সংকুচিত হয়। এ সময় ট্রাইকাসপিড ও বাইকাসপিড কপাটিকা বন্ধ থাকে এবং সেমিলুনার কপাটিকা খোলা থাকে। নিলয়ের সিস্টোলের সময় কপাটিকাগুলো বন্ধের সময় হৃৎস্পন্দনের প্রথম যে শব্দের সৃষ্টি হয়, তাকে 'লাব' বলে।

এ সময় বাম নিলয় থেকে বিশুদ্ধ রক্ত (O_2 যুক্ত রক্ত) মহাধমনি এবং ডান নিলয় থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনিতে প্রবেশ করে। মহাধমনি থেকে রক্ত বিভিন্ন ধমনি ও শাখা দিয়ে দেহস্থ

বিভিন্ন জালকে ছড়িয়ে পড়ে এবং কলাকোষকে পুষ্টিদ্রব্য ও অক্সিজেন সরবরাহ করে। অপরপক্ষে ফুসফুসীয় ধমনি থেকে CO_2 যুক্ত রক্ত ফুসফুসীয় জালকে প্রবেশ করে। ফুসফুস থেকে রক্ত অক্সিজেন গ্রহণ করে ফুসফুসীয় শিরা দিয়ে বাম অলিন্দে আসে। অপরপক্ষে সারা দেহস্থ রক্ত জালক থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড-যুক্ত রক্ত (দূষিত রক্ত) উপশিরা, শিরা ও মহাশিরা দিয়ে পুনরায় অলিন্দে ফিরে আসে।

(ঘ) নিলয়ের ডায়াস্টোল: নিলয়ে সিস্টোলের পর পরই নিলয়ের ডায়াস্টোল শুরু হয়। এই সময় আবার অলিন্দ থেকে রক্ত এসে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিলয় পূর্ণ হতে থাকে। এই সময় এখানকার সেমিলুনার ভালভ বন্ধের সময় যে দ্বিতীয় শব্দের সৃষ্টি হয় তাকে 'ডাব' বলে।

সুতরাং হৃৎপিণ্ডের শব্দগুলো হলো:

নিলয়ের সিস্টোল = লাব
নিলয়ের ডায়াস্টোল = ডাব

চিত্র ৩.১৪: নাড়ি বা পালস দেখা

একটি সিস্টোল ও একটি ডায়াস্টোলের সমন্বয়ে একটি হৃৎস্পন্দন সম্পন্ন হয় এবং সময় লাগে প্রায় ০.৮ সেকেন্ড। একজন সুস্থ মানুষের হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে ৬০-১০০ বার হয়। এটাকে হার্ট-বিট বলা হয়। আমাদের হাতের কবজির রেডিয়াল ধমনিতে এই স্পন্দন গোনা যায় আবার বুকের বাম দিকে নির্দিষ্ট স্থানে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে শব্দ শোনা যায়। হাতের কবজিতে হৃৎস্পন্দন অনুভব করাকে পালস বলে। স্টেথোস্কোপের সাহায্যে হৃৎস্পন্দনের যে শব্দ শোনা যায়, তাকে হার্টসাউন্ড বলে। হৃৎস্পন্দন বা হার্ট-বিটকে যখন প্রতি মিনিটে হাতের কবজিতে গণনা করা হয়, তখন তাকে পালস রেট বলে।

৩.৩.৩ হার্ট-বিট বা পালসরেট গণনার পদ্ধতি

রোগীর হাতের কবজিতে হাতের তিন আঙুল যেমন: অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জনি দিয়ে চাপ দিলে হৃৎস্পন্দন প্রতি মিনিটে কতবার হয় তা অনুভব করা যায়। হাতের তিন আঙুল এমনভাবে রাখতে হবে যেন তর্জনি থাকে হৃৎপিণ্ডের দিকে, মধ্যমা মাঝখানে এবং অনামিকা হাতের আঙুলের দিকে (চিত্র ৩.১৪)। মধ্যমা আঙুল দিয়ে বোঝা যাবে হাতের রেডিয়াল ধমনি কত বার ধুকধুক করছে। এক মিনিটে কতোবার স্পন্দিত হচ্ছে, সেটাই হচ্ছে পালস রেট বা পালসের গতি। পালসকে আমরা সাধারণভাবে নাড়ি বলে থাকি।

কবজিতে পালস না পাওয়া গেলে কণ্ঠনালির পাশে হৃৎস্পন্দন দেখা যেতে পারে অথবা সরাসরি বুকে

কান পেতেও হার্ট সাউন্ড শোনার চেষ্টা করা যেতে পারে। যেকোনো সাধারণ মানুষের পালসের গতি প্রতি মিনিটে কতবার হচ্ছে তা দেখা যায় উপরের বর্ণনা অনুসারে ব্যবস্থা নিলে। ঘড়ি ধরে পালসের গতি দেখতে হয়। সাধারণত পালসের গতি দ্রুত হয় পরিশ্রম করলে, ঘাবড়ে গেলে, ভয় পেলে, তীব্র যন্ত্রণা হলে কিংবা জ্বর হলে। পালসের স্বাভাবিক গতি হলো প্রতি মিনিটে ৬০ থেকে ১০০ বার। শিশুদের জন্য এটি বেশি প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১৪০ বার। পূর্ণবয়স্ক মানুষের পালস রেট প্রতি মিনিটে ১০০-এর অধিক হয় জ্বর ও শক্ (অচেতনতা) অথবা থাইরয়েড গ্রন্থির অতি কার্যকারিতার কারণে। ১° ফারেনহাইট তাপ বৃদ্ধির জন্য পালসের গতি প্রতি মিনিটে ১০ বার করে বাড়ে। পালসের গতি খুব দ্রুত, খুব মন্থর বা অনিয়ন্ত্রিত হলে বুঝতে হবে যে হৃৎপিণ্ডের সমস্যা আছে। প্রতি মিনিটে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে হার্ট ব্লকের বা জন্ডিসের কারণে।

স্বাভাবিকভাবে মানসিক উত্তেজনা, ব্যায়াম, সন্ধ্যার দিকে পালসের গতি বেড়ে যায়। এ অবস্থায় পালসের গতি অধিক হলেও তা স্বাভাবিক ভাবতে হবে। ঘুমানো অবস্থায় এবং রাতে সুনিদ্রার পর সকালে পালসের গতি ৬০-এর কম হতে পারে। এ অবস্থাটিকেও স্বাভাবিক ধরতে হবে।

৩.৪ রক্ত চাপ

হৃৎপিণ্ডের সংকোচন এবং প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ধমনির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় ধমনিপ্রাচীরে যে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি হয়, সেটাকে রক্তচাপ বলে। তাই রক্তচাপ বলতে সাধারণভাবে ধমনির রক্তচাপকেই বুঝায়। রক্তচাপ হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা, ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা এবং রক্তের ঘনত্ব এবং পরিমাণের উপর নির্ভর করে। নিলয়ের সিস্টোল অবস্থায় ধমনিতে যে চাপ থাকে, তাকে সিস্টোলিক রক্তচাপ এবং ডায়াস্টোল অবস্থায় যে চাপ থাকে, তাকে ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ বলে। স্বাভাবিক এবং সুস্থ একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সিস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ১১০ - ১৪০ মিলিমিটার (mm Hg) এবং ডায়াস্টোলিক রক্তচাপ পারদ স্তম্ভের ৬০-৯০ মিলিমিটার (mm Hg)। স্বাভাবিক রক্তচাপকে ১২০/৮০ (mm Hg) এভাবে প্রকাশ করা হয়। স্ফিগমোম্যানোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে রক্তচাপ নির্ণয় করা যায়।

৩.৪.১ উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপকে ডাক্তারি ভাষায় হাইপারটেনশন বলে। শরীর আর মনের স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তচাপ যদি বয়সের জন্য নির্ধারিত মাত্রার উপরে অবস্থান করতে থাকে, তবে তাকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন বলে। রক্তের চাপ যদি কম থাকে তা হলে তাকে নিম্ন রক্তচাপ বলে। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন আর প্রসারণের ফলে হৃৎপিণ্ড থেকে ধমনির মাধ্যমে রক্ত প্রবাহকালে ধমনি গায়ে কোনো ব্যক্তির সিস্টোলিক রক্তচাপ যদি সব সময় ১৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ বা তার বেশি এবং ডায়াস্টোলিক সব সময় ৯৫ মিলিমিটার

পারদস্তম্ভ বা তার বেশি থাকে, তবে তার উচ্চ রক্তচাপ আছে বলা যায়। উত্তেজনা, চিন্তা, বিষণ্ণতা, নিদ্রাহীনতা বা অন্য কোনো কারণে যদি রক্তচাপ সাময়িকভাবে নির্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করে, তবে তাকে হাইপারটেনশন বলা যাবে না এবং তার জন্য বিশেষ কোনো ঔষধেরও প্রয়োজন হয় না।

হাইপারটেনশন হাওয়ার প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। তবে অতিরিক্ত শারীরিক ওজন, মেদবহুল শরীর, অতিরিক্ত লবণ খাওয়া, অপর্যাপ্ত শারীরিক পরিশ্রম, ডায়াবেটিস, অস্থিরচিত্ত এবং মানসিক চাপগ্রস্ত, রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য— এরকম ব্যক্তিদের মাঝে এ রোগের আশঙ্কা সবচেয়ে বেশি। হাইপারটেনশন রোগীদের যেসব জটিলতা দেখা দিতে পারে তার মধ্যে রয়েছে স্ট্রোক, প্যারালাইসিস, হৃৎপিণ্ড বড় হয়ে যাওয়া, হার্ট অ্যাটাক এবং ফেইলিউর, কিডনির কার্যক্ষমতা কমে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত প্রভৃতি। নিম্ন রক্তচাপ উচ্চ রক্তচাপের মতো এত মারাত্মক নয়। তবে রক্তচাপ যথেষ্ট কমে গেলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে।

রক্তচাপ প্রতিরোধ করার জন্য কিংবা প্রতিকার হিসেবে নিচের সতর্কতামূলক নিয়মগুলো পালন করলে উপকার পাওয়া যায়:

১. ডায়াবেটিস থাকলে সেটি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

২. দেহের ওজন না বাড়ানো।

৩. চর্বিযুক্ত খাদ্য বর্জন করা। (যেমন: ঘি, মাখন, গরু ও খাসির মাংস, চিংড়ি ইত্যাদি)

৪. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

৫. পরিমাণের অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৬. ধূমপান থেকে বিরত থাকা।

৭. নিয়মিত ব্যায়াম করা।

৮. দৈনিক ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমানো।

৯. মানসিক চাপমুক্ত ও দুশ্চিন্তামুক্ত জীবনযাপন করা।

১০. খাবারের সাথে অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

৩.৪.২ কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল এক বিশেষ ধরনের জটিল স্নেহ পদার্থ বা লিপিড এবং স্টেরয়েড-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মানুষের প্রায় প্রত্যেক কোষ ও টিস্যুতে কোলেস্টেরল থাকে। যকৃৎ এবং মগজে এর পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। কোলেস্টেরল অন্যান্য স্নেহ পদার্থের সাথে মিশে রক্তে স্নেহের বাহক হিসেবে কাজ করে। স্নেহ এবং প্রোটিনের যৌগকে লাইপোপ্রোটিন বলে। স্নেহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে লাইপোপ্রোটিন দুই রকম— উচ্চ ঘনত্ব বিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (High Density Lipoprotein—HDL) এবং নিম্ন ঘনত্ববিশিষ্ট লাইপোপ্রোটিন (Low Density Lipoprotein— LDL)। রক্তের LDL-এর পরিমাণের

বৃদ্ধির সাথে কোলেস্টেরলের আধিক্যের সম্পর্ক আছে। রক্তে LDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। রক্তে HDL-এর পরিমাণ বেশি থাকা শরীরের জন্য উপকারী। রক্তে কোলেস্টেরলের স্বাভাবিক পরিমাণ ১০০-২০০ mg/dL। রক্তে কোলেস্টেরলের আধিক্য হৃদ্‌রোগের আশঙ্কা বাড়ায়। স্বাভাবিক মাত্রা থেকে রক্তে কোলেস্টেরল বেশি হলে রক্তনালি অন্তঃপ্রাচীরের গায়ে কোলেস্টেরল ও ক্যালসিয়াম জমা হয়ে রক্তনালি গহ্বর ছোট হয়ে যায়। এ কারণে ধমনির প্রাচীরের স্থিতিস্থাপকতা কমে যায় এবং শক্ত হয়ে যায়। এ অবস্থাকে ধমনির কাঠিন্য বা arteriosclerosis বলে। আর্টারিওস্কেলরোসিসের কারণে ধমনির প্রাচীরে ফাটল দেখা দিতে পারে। ধমনির গায়ে ফাটল দিয়ে রক্তক্ষরণ হয়ে জমাট বেঁধে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়। হৃৎপিণ্ডের করোনারি রক্তনালিকায় রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে করোনারি থ্রম্বোসিস বলে এবং মস্তিষ্কের রক্তনালিতে রক্ত জমাট বাঁধলে তাকে সেরিব্রাল থ্রম্বোসিস বলে। এতে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটতে পারে। রক্তে কোলেস্টেরল বেড়ে গেলে LDL-এর পরিমাণ বেড়ে যায় আর HDL-এর পরিমাণ কমে যায়। LDL-এর পরিমাণ ১৫০ mg/dL থেকে বেশি হলে তাকে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

৩.৫ হৃদ্‌যন্ত্রকে ভালো রাখার উপায়

আমরা প্রথম অধ্যায় থেকে জেনেছি, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য আমাদের প্রয়োজন সুষম খাদ্য এবং শরীরকে সচল রাখার জন্য প্রয়োজন ব্যায়াম ও বিশ্রাম। সুষম খাদ্য গ্রহণ করা যেমন আবশ্যক, তেমনি খাদ্য গ্রহণ এবং জীবনপ্রণালি সম্বন্ধে কতগুলো সুঅভ্যাস গড়ে তোলাও একান্ত আবশ্যক। অনেক কারণেই দেহে নানা ধরনের রোগ হতে পারে। তবে সঠিক খাদ্যব্যবস্থা এবং জীবনপ্রণালি অনুসরণ করে হৃদ্‌যন্ত্রকে ঠিক রাখা যায়। সেগুলো হচ্ছে:

১. দেহের উচ্চতা এবং বয়স অনুসারে কাঙ্ক্ষিত ওজন বজায় রাখা আবশ্যক। দেহের ওজন বেশি হলে হৃৎপিণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিন মিশ্রিত খাবার খাওয়া উচিত।

৩. শর্করা, মিষ্টি ও স্নেহজাতীয় খাদ্যের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। শাক-সবজি ও আঁশযুক্ত খাবার বেশি খেতে হবে। উদ্ভিজ তেল গ্রহণ করা উচিত, তবে সামুদ্রিক মাছের তেল রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায় এবং রক্ত জমাট বাঁধার প্রবণতা হ্রাস করে। মাছভোজীদের হৃদ্‌রোগের প্রকোপ এ জন্য তুলনামূলকভাবে কম থাকে।

৪. সুষম খাদ্যে ভিটামিন ও খনিজ লবণের চাহিদা যা আছে তা অপরিবর্তিত রাখা উচিত। তবে খাওয়ার লবণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। রসুন, তেঁতুল, ভিটামিন সি সমৃদ্ধ ফল ও অন্যান্য ফল নিয়মিত খেলে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক কম থাকে।

২০২৫

এগুলো ছাড়া সঠিক ও পরিমিত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ এবং অতিভোজন হতে বিরত থাকতে হবে। অত্যধিক মানসিক চাপ সৃষ্টিকারী পরিস্থিতি এড়ানো, নিয়মিত হালকা ব্যায়াম অথবা হাঁটা এবং সুষ্ঠু জীবনযাপন অর্থাৎ সময়মতো ঘুমানো, ধূমাপান থেকে বিরত থাকলে হৃদ্‌রোগ বা উচ্চরক্ত চাপ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

৩.৬ ডায়াবেটিস, বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগ

ডায়াবেটিস এক ধরনের বিপাকজনিত রোগ।

আমরা যখন কিছু খাই, এটি গ্লুকোজে পরিণত হয়ে রক্তের মাঝে আসে। প্যানক্রিয়াস থেকে ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোন নির্গত হয়, যেটি রক্তের এই গ্লুকোজকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। কারো ডায়াবেটিস হলে প্যানক্রিয়াস যথেষ্ট ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না কিংবা শরীর ইনসুলিনকে ব্যবহার করতে পারে না। যে কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায়। মানুষের রক্তে গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রা হলো ৪.০-৬.০ mmole\L কিংবা (৭০-১১০ মি.গ্রা/ডেসি.লি.)। ডায়াবেটিস হলে রক্তে এর পরিমাণ দীর্ঘস্থায়ীভাবে অনেক বেড়ে যায়। ডায়াবেটিস ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। ডায়াবেটিস হৃদ্‌যন্ত্রের রক্তপ্রবাহ রোগের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকায় এটি দেহের বিভিন্ন অঙ্গের, যেমন হৃৎপিণ্ড, কিডনি, চোখ ইত্যাদির স্বাভাবিক কাজে বাধা সৃষ্টি করে। দেখা গেছে ডায়াবেটিস রোগীদের করোনারি হৃদ্‌রোগ হওয়ার প্রবণতা বেশি থাকে। এটি হৃৎপিণ্ডকে অচল করে দেয় এবং রোগী স্ট্রোক হয়ে মারা যেতে পারে। এছাড়া দীর্ঘস্থায়ী ডায়াবেটিস রোগে রক্তচাপ বেড়ে যায় এবং এর থেকে উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন হয়। উচ্চ রক্তচাপ করোনারি হৃদ্‌রোগের পূর্বলক্ষণ। ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা দীর্ঘদিন অনিয়ন্ত্রিত থাকলে তাদের করোনারি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা খুবই বেশি থাকে।

কোন ব্যক্তির ডায়াবেটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি

যে কেউ যেকোনো সময়ে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হতে পারে, তবে চার শ্রেণির মানুষের ডায়াবেটিস বেশি হয়ে থাকে:

১. যাদের বংশে, যেমন: মা-বাবা সম্পর্কিত নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে।

২. যাদের ওজন বেশি এবং শরীর মেদবহুল।

৩. যারা ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের কোনো কাজ করে না।

৪. দীর্ঘদিন যারা স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে।

ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ

১. ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া, বিশেষ করে রাতে ঘনঘন প্রস্রাব হওয়া।

২. খুব বেশি পিপাসা লাগা।

৩. বেশি ক্ষুধা লাগা এবং অতিমাত্রায় শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা।

৪. যথেষ্ট খাওয়া সত্ত্বেও ওজন কমে যাওয়া এবং শীর্ণতা।

৫. সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্তি ও দুর্বলতা বোধ করা।

৬. চামড়া শুকিয়ে যাওয়া।

৭. চোখে ঝাপসা দেখা।

৮. শরীরের কোথাও ক্ষতের সৃষ্টি হলে, দেরিতে শুকানো।

ডায়াবেটিস রোগীর পথ্য

ডায়াবেটিস রোগকে দমিয়ে রাখতে খাদ্যের ভূমিকা অসামান্য। ডায়াবেটিস রোগের জন্য ওষুধ সেবন করলেও রোগীকে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। নিয়ন্ত্রিত খাদ্যব্যবস্থা না থাকলে ওষুধ সেবন করেও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। রোগীকে এমন খাদ্যদ্রব্য দিতে হবে, যা তার ন্যূনতম ক্যালরির চাহিদা পূরণ করবে কিন্তু এই খাদ্যের দ্বারা রক্তে ও প্রস্রাবে যাতে শর্করা বেড়ে না যায়।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ

ডায়াবেটিস প্রধানত তিনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যথা: খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, ওষুধ সেবন এবং জীবন-শৃঙ্খলা।

(ক) খাদ্য নিয়ন্ত্রণ: মোটা লোকদের ডায়াবেটিস হলে তাদের ওজন স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেতে হবে। ডায়াবেটিস রোগীদের একটুও চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না। তাদের এমন খাবার খাওয়া উচিত, যা প্রোটিনসমৃদ্ধ (গাঢ় সবুজ রঙের শাক-সবজি, বরবটি, মাশরুম, বাদাম, ডিম, মাছ, চর্বি ছাড়া মাংস ইত্যাদি) এবং যেখানে শ্বেতসার কম থাকে।

(খ) ওষুধ সেবন: সব ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্ক রোগীদের এ দুটি নিয়ম যথাযথভাবে পালন করলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। কিন্তু ইনসুলিননির্ভর রোগীদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন ইনজেকশনের দরকার হয়।

(গ) জীবন শৃঙ্খলা: শৃঙ্খলা ডায়াবেটিস রোগীর জীবন-কাঠি। তাকে এসব বিষয়ে বিশেষ নজর দিতে হবে:

১. নিয়মিত ও পরিমাণমতো সুষম খাবার খেতে হবে।

২. নিয়মিত ও পরিমাণমতো ব্যায়াম করতে হবে।

৩. নিয়মিত রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ পরিমাপ করে এবং ফলাফল পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৪. মিষ্টি খাওয়া সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. রক্ত জমাট বাঁধানো কোনটির কাজ?

(ক) লোহিত কণিকা (খ) অণুচক্রিকা

(গ) শ্বেত কণিকা ঘ) লসিকা কোষ

২. অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সরবরাহ করে—

(ক) ধমনি ও পালমোনারি ধমনি (খ) শিরা ও পালমোনারি শিরা

(গ) ধমনি ও পালমোনারি শিরা (ঘ) শিরা ও ধমনি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

অভিষেক ঢাকা থেকে মানিকগঞ্জ যাওয়ার পথে গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়ে। এতে তার বন্ধুর মারাত্মক রক্তক্ষরণ হয়। ফলে রক্তের প্রয়োজন। বন্ধুর রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই অভিষেক বলল, আমি রক্ত দিতে পারব।

৩. অভিষেকের রক্তের গ্রুপ কী ছিল?

(ক) A (খ) B

(গ) AB (ঘ) O

৪. রক্তরসে কোন গ্যাসীয় পদার্থ নেই?

(ক) O_2 (খ) CO_2

(গ) Cl_2 (ঘ) N_2

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রাফিন ১০ম শ্রেণির ছাত্র। তার আব্বা সুঠাম দেহের অধিকারী। রাফিন লক্ষ করছে, তার আব্বার দেহে ক্ষত সৃষ্টি হলে শুকাতে দেরি হচ্ছে, চামড়া শুকিয়ে যাচ্ছে, সামান্য পরিশ্রমে ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ছেন। এসব কারণে রাফিনের আব্বা ডাক্তারের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে সুস্থ থাকার জন্য কিছু নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলার উপদেশ দিলেন।

২০২৫

(ক) রক্তচাপ কাকে বলে?

(খ) সিস্টোলিক রক্তচাপ বলতে কী বোঝায়?

(গ) রাফিনের আব্বা কী রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ডাক্তার সাহেব রাফিনের আব্বাকে সুস্থ থাকার জন্য কী উপদেশ দেন? ব্যাখ্যা করো।

২. নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

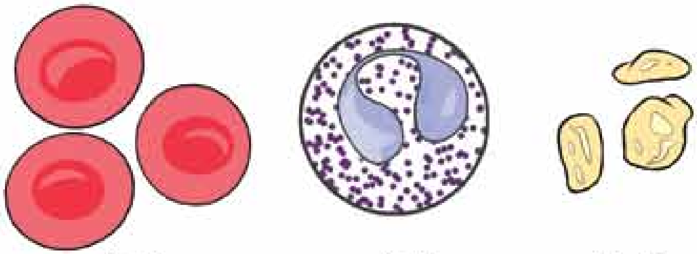

চিত্র-A চিত্র-B চিত্র-C

(ক) রক্ত কাকে বলে?

(খ) কৈশিক জালিকা বলতে কী বুঝায়?

(গ) মানবদেহে চিত্রের B চিহ্নিত কোষের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) "চিত্রের A ও C একই যোজক কলায় অবস্থিত হলেও এদের কাজ ভিন্ন"— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

চতুর্থ অধ্যায়

নবজীবনের সূচনা

আজ থেকে প্রায় সাড়ে তিনশত কোটি বছর আগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি হয়। পৃথিবীর জলবায়ু তখন স্থিতিশীল ছিল না। তারপর কয়েক শত কোটি বছর পরে আজ পৃথিবী শান্ত, তার জলবায়ুও মোটামুটি স্থিতিশীল। পৃথিবীতে এখন বহু প্রজাতির জীবের বসবাস। অর্থাৎ এই দীর্ঘ সময়কালে প্রথম আবির্ভূত অনুন্নত জীবক্রম পরিবর্তিত হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন জীবপ্রজাতি সৃষ্টি করেছে।

মানুষের জীবন শুরু হয় মাতৃগর্ভে মায়ের ডিম্বাণু এবং বাবার শুক্রাণুর মিলনে সৃষ্টি হওয়া একটি কোষ থেকে। মানুষ তার জীবনকালে প্রথমে থাকে শিশু। পরবর্তীকালে শিশু থেকে ধাপে ধাপে কৈশোর-যৌবন পার হয়ে বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয়। জীবনকালের এই পরিবর্তনের একটি ধাপ হচ্ছে বয়ঃসন্ধিকাল। বয়ঃসন্ধিকালে সবারই দৈহিক এবং মানসিক পরিবর্তন ঘটে। আমরা এই অধ্যায়ে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে এবং মানুষের বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো কীভাবে ঘটে, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

২০২৫

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বয়ঃসন্ধিকাল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তনে নিজেকে খাপ খাওয়ানোর উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহে স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং এর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- টেস্টটিউব বেবির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লিঙ্গ নির্ধারণের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জীবনের উৎপত্তি এবং জীবজগতে বিবর্তনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পৃথিবীতে নতুন প্রজাতির উৎপত্তির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।

৪.১ বয়ঃসন্ধিকাল

কোনো বাড়িতে একটি শিশু জন্ম নিলে সেখানে আনন্দের সাড়া পড়ে যায়। সকলেই শিশুটিকে আদর করতে চায়, কোলে নিতে চায়। শিশুটি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে, পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত থাকে তাদের শৈশবকাল। ছয় থেকে দশ বছর পর্যন্ত বয়সকে আমরা বাল্যকাল বলি, তখন একজন শিশুকে মেয়ে হলে বালিকা এবং ছেলে হলে বালক বলা হয়। দশ বছর বয়সের পর একটি মেয়েকে কিশোরী এবং একটি ছেলেকে কিশোর বলা হয়। মানুষের জীবনের এই সময়কে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। দশ বছর থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত কিশোরকালের বিস্তৃতি। অর্থাৎ বয়ঃসন্ধিকাল বাল্যাবস্থা ও যৌবনকালের মধ্যবর্তী সময়। এ সময়কালে বালক ও বালিকার শরীর যথাক্রমে পুরুষের এবং নারীর শরীরে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাধারণত মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল ছেলেদের চেয়ে একটু আগে শুরু হয়। মেয়েদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হয় আট থেকে তেরো বছর বয়সের মধ্যে। ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকাল শুরুর বয়স দশ থেকে পনেরো বছর। কারো কারো ক্ষেত্রে এর চেয়ে একটু আগে বা পরেও বয়ঃসন্ধিকাল শুরু হতে পারে।

৪.১.১ বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনসমূহ

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দৈহিক বা শারীরিক পরিবর্তনগুলোই প্রথমে চোখে পড়ে। এই পরিবর্তন দেখলেই বোঝা যায় যে কারো বয়ঃসন্ধিকাল চলছে।

শৈশব থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ধীরে ধীরে বেশ সময় নিয়ে বেড়ে ওঠে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালের বেড়ে ওঠা অনেকটা আকস্মিক। ছেলেমেয়েরা হঠাৎ দ্রুত লম্বা হতে থাকে (চিত্র ৪.০১), ওজনও বাড়তে থাকে দ্রুত। দশ বছর বয়সের পরে তিন থেকে চার বছর ধরে মেয়ে ও ছেলেদের শরীরে নানারকম পরিবর্তন আসে।

চিত্র ৪.০১: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েরা দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে

নানা কারণে আমাদের দেশের মানুষেরা এই অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিবর্তনের বিষয়গুলো আলোচনা করতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু যেহেতু তোমরা এখন বয়ঃসন্ধিকালের ভেতর দিয়ে যাচ্ছ, তাই তোমার ভেতর কী কী পরিবর্তন হবে, সেগুলো জেনে রাখা

২০২৬

ভালো। তাহলে তোমরা ভয় কিংবা লজ্জা না পেয়ে তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে প্রস্তুত থাকতে পারবে।

বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন দেখা দেয়, সেগুলো প্রধানত তিন রকম:

১. শারীরিক পরিবর্তন

২. মানসিক পরিবর্তন

৩. আচরণগত পরিবর্তন।

১. শারীরিক পরিবর্তন

(ক) দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠা এবং দ্রুত ওজন বেড়ে যাওয়া

(খ) ছেলেদের (১৬/১৭ বছর বয়সে) দাড়ি-গোঁফ গজানো এবং মেয়েদের স্তন বর্ধিত হতে শুরু করা

(গ) শরীরের বিভিন্ন অংশে লোম গজানো

(ঘ) ছেলেদের স্বরভঙ্গ হওয়া ও গলার স্বর মোটা হওয়া

(ঙ) ছেলেদের বীর্যপাত এবং মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়া

(চ) ছেলেদের বুক ও কাঁধ চওড়া হয়ে ওঠা এবং মেয়েদের কোমরের হাড় মোটা হওয়া।

২. মানসিক পরিবর্তন

(ক) অন্যের, বিশেষত নিকটজনের মনোযোগ, যত্ন ও ভালোবাসা পাওয়ার ইচ্ছা তীব্র হওয়া

(খ) আবেগ দ্বারা চালিত হওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হওয়া

(গ) ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে কৌতূহল সৃষ্টি হওয়া

(ঘ) বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়া

(ঙ) মানসিক পরিপক্বতার পর্যায় শুরু হওয়া

(চ) পরনির্ভরতার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার পর্যায় শুরু হওয়া।

৩. আচরণগত পরিবর্তন

(ক) প্রাপ্তবয়স্কদের মতো আচরণ করা

(খ) সে যে একজন আলাদা ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন আচরণের মাধ্যমে এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা

(গ) প্রত্যেক বিষয়ে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

(ঘ) দুঃসাহসিক ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজে প্রবৃত্ত হওয়া।

একক কাজ

কাজ: নিচের ছকটি পূরণ করো :

বয়ঃসন্ধিকালের		
শারীরিক পরিবর্তন (মেয়েদের)	শারীরিক পরিবর্তন (ছেলেদের)	মানসিক পরিবর্তন (উভয়ের)

৪.১.২ বয়ঃসন্ধিকাল পরিবর্তনের কারণ

সাধারণত ছেলেমেয়েদের ১১-১৯ বছরের সময়কালকে বয়ঃসন্ধিকাল বলে। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে এ সময়ে ছেলেমেয়েদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়। তবে আবহাওয়া, স্থান, খাদ্য গ্রহণের পরিমাণ ও মানের তারতম্যের কারণে এক একজনের বয়ঃসন্ধিকালের সময়টা এক এক রকম হতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে যেসব পরিবর্তন ঘটে, তার জন্য দায়ী হরমোন নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ, যা অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত হয়। হরমোন শরীরের ভিতরে স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয়। ছেলে ও মেয়েদের শরীরের হরমোন ভিন্ন। এ কারণে তাদের শরীর ও মনে যে পরিবর্তন হয় সেটিও ভিন্ন। মেয়েদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রধানত দুটি হরমোন। এ হরমোন দুটোর নাম হলো ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন।

চিত্র ৪.০২: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের দাড়ি-গোঁফ গজায়

চিত্র ৪.০৩: বয়ঃসন্ধিকালে নিজের পরিবর্তনের বিষয়ে মেয়েরা সচেতন হয়ে ওঠে।

এসব হরমোনের প্রভাবে কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হয়, দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি হয় এবং শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার বৃদ্ধিসহ অন্যান্য পরিবর্তন ঘটে। এ হরমোনের কারণে মেয়েদের ঋতুস্রাব বা মাসিক শুরু হয়। বয়স যখন ১০-১৭ বছর হয়, সাধারণত তখনই মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়। নারীর সন্তান ধারণের সক্ষমতার লক্ষণ হলো নিয়মিত ঋতুস্রাব। ঋতুস্রাব শুরু হওয়া সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। বাংলাদেশের নারীদের সাধারণত ৪৫-৫৫ বছর বয়সের মধ্যে ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। ২৮ দিন পরপর বা মাসে একবার এই ঋতুস্রাব প্রক্রিয়া চলে এবং সাধারণত এটি ৩-৭ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের শরীরে বিভিন্ন পরিবর্তনের জন্য যে হরমোন দায়ী, তার নাম হলো টেস্টোস্টেরন। এ হরমোনের প্রভাবে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। ছেলেদের গলার স্বর ভারী হয়। মুখে দাড়ি ও গোঁফ গজায় (চিত্র ৪.০২), দ্রুত দৈহিক বৃদ্ধি পায়। ১৩ থেকে ১৫ বছরের ছেলেদের শরীরে শুক্রাণু তৈরি হয় এবং মাঝে মাঝে রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে বীর্যপাত ঘটে। ছেলে ও মেয়ে উভয়ের মাঝেই শারীরিক পরিবর্তনের পাশাপাশি মানসিক পরিবর্তন হয়। ছেলে ও মেয়েরা এ বয়সে কল্পনাপ্রবণ হয় এবং আবেগ দ্বারা চালিত হয়। তারা পরিপাটি রূপে নিজেকে সাজিয়ে রাখতে চায় (চিত্র ৪.০৩)। এ সময় ছেলেরা মেয়েদের প্রতি এবং মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষণবোধ করে। এভাবেই ধীরে ধীরে কিশোর-কিশোরীরা প্রাপ্তবয়স্ক মানুষে পরিণত হতে শুরু করে।

একক কাজ

কাজ: নিচে বিবৃতিটি সত্য হলে ঠিক (√) চিহ্ন দাও এবং মিথ্যা হলে ক্রস (×) চিহ্ন দাও।

বিবৃতি	√ অথবা ×
বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে হরমোনের কারণে	
বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের কারণ অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ	
মেয়েদের শরীরে ইস্ট্রোজেন ও প্রজেস্টেরন হরমোন কাজ করে	
ইস্ট্রোজেন হরমোন ছেলেদের শরীরে তৈরি হয়	
ছেলেদের বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনগুলো ঘটে প্রজেস্টেরন হরমোনের প্রভাবে	
ইস্ট্রোজেন খাদ্য হজমে সহায়তা করে	

তোমরা জেনেছ যে ছেলে-মেয়েদের ১১-১৯ বছর বয়সের সময়কালকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিকাল। তোমরা এও জেনেছ, এ সময় ছেলে-মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনগুলোর সাথে স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি জড়িত।

চিত্র ৪.০৪: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন

চিত্র ৪.০৫: বয়ঃসন্ধিকালে মেয়েদের পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন

৪.১.৩ দৈহিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের মাঝে মাঝে রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে যে বীর্যপাত ঘটে, সেটাকে স্বপ্নদোষ বলা হয়ে থাকে। স্বপ্নদোষ ভয় বা লজ্জার কোনো বিষয় নয়। "স্বপ্নদোষ" বলা হলেও এটি কোনো দোষ নয়। এটা এ বয়সে শরীরের একটি স্বাভাবিক কার্যক্রম। বয়ঃসন্ধিকালে সাধারণ ১৩ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে ছেলেদের শুক্রাণু তৈরি শুরু হয়। কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে বীর্যের মাধ্যমে এ শুক্রাণু দেহের বাইরে বেরিয়ে আসে। শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই শরীর থেকে বীর্যপাত হয় এবং তা অবিরাম তৈরি হতে থাকে। স্বপ্নদোষ হলে গোসল করে পরিষ্কার হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে দুর্ভাবনা করার কিছু নেই। এ সময় শরীর দ্রুত বেড়ে উঠে বলে পুষ্টিকর খাবার (চিত্র ৪.০৪, চিত্র ৪.০৫) বিশেষ করে বেশি করে শাক-সবজি খাওয়া ও পানি পান করে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা উচিত। বয়ঃসন্ধিকালে স্বাভাবিক শারীরিক পরিবর্তন ছাড়াও নানা রকম মানসিক পরিবর্তন হয়। প্রয়োজন হলে এ বিষয়ে মা-বাবা ও নিকটাত্মীয়দের সাথে আলাপ-আলোচনা বা পরামর্শ করা যেতে পারে। বয়সন্ধিকালে সবাই খুব আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে, সবাইকে বুঝতে হবে এটি হরমোনের ক্রিয়া এবং বয়ঃসন্ধিকাল পার হওয়ার পর সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ছেলেদের মতো মেয়েদেরও বয়ঃসন্ধিকালে অনেক পরিবর্তন ঘটে। এ সময় মেয়েদের শরীরের যেসব পরিবর্তন ঘটে, তার মধ্যে ঋতুস্রাব বা মাসিক এবং সাদা স্রাব সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণত ৯-১৩ বছর বয়সের মধ্যে মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়। প্রত্যেক মাসে একবার ঋতুস্রাব হয় বলে একে মাসিক বলে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব শরীরের একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। ঋতুস্রাবের সময়

৩-৫ দিন পর্যন্ত রক্তস্রাব হতে পারে। কারো কারো ক্ষেত্রে এ সময় কিছুটা কম-বেশি হতে পারে। কখন ঋতুস্রাব শুরু হবে, সেই সময়টুকু অনুমান করে তার জন্য আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখা দরকার। এ সময় মেয়েদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা, নিয়মিত গোসল করা, পুষ্টিকর খাবার খাওয়া এবং বেশি পরিমাণে পানি পান করা প্রয়োজন। এ সময় সাধারণত, একটু বেশি বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

যেহেতু মাসিকের সময় শরীর থেকে অনেক রক্ত বেরিয়ে যায়, তাই ক্ষয়পূরণের জন্য মাছ, মাংস, সবজি এবং ফলমূল বেশি পরিমাণে খাওয়া দরকার। মাসিকের সময় তলপেটে ব্যথা হতে পারে। সেক্ষেত্রে গরম পানির সেঁক দিলে আরাম বোধ হবে। এ সময় মাথাব্যথা ও কোমরে ব্যথা হতে পারে। এসব দেখে বিচলিত হওয়া বা ভয় পাবার কিছু নেই। ব্যথা বেশি হলে ডাক্তারের পরামর্শে ঔষধ সেবন করতে হবে।

মাসিকের সময় আজকাল শোষক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য প্যাড পাওয়া যায়। প্যাড জোগাড় করা সহজ না হলে পরিষ্কার জীবাণুমুক্ত তুলা বা পরিষ্কার শুকনো কাপড় ব্যবহার করা যেতে পারে। মাসিকের সময় ব্যবহার করা কাপড় শোষক হিসেবে আবার ব্যবহার করতে হলে সাবান দিয়ে গরম পানিতে ধুতে হবে এবং রোদে শুকিয়ে গুছিয়ে রাখতে হবে। এই কাপড় অন্ধকার ও স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় রাখা ঠিক নয়, তাহলে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

৪.১.৪ মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখা

বয়ঃসন্ধিকালের পরিবর্তনের সময়ে অনেকে একা থাকতে পছন্দ করে। অনেকে খানিকটা অস্বাভাবিক আচরণও করতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক পরিবর্তনের চাইতেও অনেক সময় মানসিক পরিবর্তন বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। অনেকে অনেক বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে এবং এ কারণে পরিবারের সদস্যদের সাথে ভুল বোঝাবুঝি শুরু হতে পারে। এ বয়সে তাদের যে মানসিক পরিবর্তন ঘটে, পরিবারের অন্য সদস্যদের সেই পরিবর্তনের বিষয়গুলো মনে রেখে তাদের সাথে বন্ধুসুলভ এবং সহানুভূতিশীল আচরণ করতে হবে। তাদেরকে মানসিক দিকসহ অন্য সকল ব্যাপারে সহযোগিতা প্রদান করতে হবে এবং সাহস যোগাতে হবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখার জন্য ছেলেমেয়েরা নিজেরাও সচেষ্ট থাকবে। তাদের প্রথম কাজ হবে বয়ঃসন্ধিকালের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলোর সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করা। এ পরিবর্তনগুলো যে খুবই স্বাভাবিক, এ বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। এটা বুঝতে পারলে অস্বস্তি, লজ্জা বা ভয় কমে যাবে। এ বিষয়গুলো নিয়ে খোলা মনে মা-বাবা বা বড় ভাই-বোনের সাথে আলোচনা করতে পারলে সংকোচও কেটে যাবে। তখন একা থাকা বা লোকজন এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। এছাড়া ভালো গল্পের বই পড়লে, সাথিদের সাথে খেলাধুলা করলে মানসিক প্রফুল্লতা বজায় থাকবে।

বয়ঃসন্ধিকালে বাবা-মা, ভাই-বোন এবং পরিবারের সদস্য কিংবা স্কুলের শিক্ষক সবাইকেই ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনীয় মানসিক সহায়তা কিংবা পরামর্শ দিতে হবে। এতে তারা সুস্থ সবল মানুষ হিসেবে

বেড়ে উঠে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়তে সক্ষম হবে।

একক কাজ

কাজ: বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তার একটি ছক তৈরি করো।

স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে	যেসব ব্যবস্থা নিতে হবে
দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষা	
মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা	

৪.১.৫ বয়ঃসন্ধিকালীন বিবাহ ও গর্ভধারণ

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের জন্য মেয়েদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর এবং ছেলেদের বয়স কমপক্ষে ২১ বছর হতে হয়। কিন্তু এই আইন থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের অনেক মেয়েকেই ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। তোমরা কখনও কি ভেবে দেখেছ, উপযুক্ত বয়স হওয়ার আগেই মেয়েদের বিয়ে দিলে তারা কোন কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়? অল্প বয়সের বিবাহিত মেয়েরা নানা ধরনের জটিল পরিস্থিতিতে পড়ে। এর মধ্যে একটি হলো অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ।

গর্ভধারণ কী?

পুরুষের শুক্রাণু যখন মেয়েদের ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তখনই একটি মেয়ে গর্ভধারণ করে অর্থাৎ তার শরীরে সন্তান গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়। মেয়েদের জন্য এটি একটি বিশেষ শারীরিক প্রক্রিয়া এবং শুধু সন্তান গর্ভে এলেই শরীরের এই বিশেষ পরিবর্তনগুলো ঘটে।

গর্ভধারণের প্রথম কয়েক মাস মেয়েদের শরীরে কিছু কিছু অস্বস্তিকর লক্ষণ দেখা যায়।

এ লক্ষণগুলো হলো:

- বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া (চিত্র ৪.০৬);
- মাথা ঘোরা;
- বারবার প্রস্রাব হওয়া;

চিত্র ৪.০৬: গর্ভবতী অবস্থায় বমি হতে পারে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

সন্তান জন্ম দেওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া। তাই পরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে মানসিক ও শারীরিক জটিলতা তেমন একটা দেখা যায় না। এ সময়ে যেসব শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয়, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী সেগুলো নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা হলে দুর্ভাবনারও কিছু থাকে না এবং একটি সুস্থ শিশু জন্ম নেয়। অপরিণত বয়সে একটি মেয়ের মা হওয়ার মতো মানসিক পরিপক্বতা কিংবা শারীরিক প্রস্তুতি বা পূর্ণতা থাকে না। একটি মেয়ে যদি ২০ বছর বয়সের আগে গর্ভবতী হয়, তখন তাদের নিজেদেরই শারীরিক বৃদ্ধি ও গঠন সম্পূর্ণ হয় না বলে তার নানা ধরনের শারীরিক সমস্যা হতে পারে। এ ছাড়া অপরিণত বয়সের একটি মেয়ের সন্তান ধারণ এবং সন্তান জন্ম দেওয়া সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকে না। কাজেই সে তার গর্ভের সন্তান এবং তার নিজের শরীরকে ঠিকভাবে রক্ষা করতে পারে না। অপরিণত বয়সে যদি কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করে, তবে শুধু যে মেয়েটিই শারীরিক ও মানসিকভাবে

চিত্র ৪.০৭: গর্ভধারণের ফলে মেয়েটির বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়েছে

চিত্র ৪.০৮: গর্ভধারণের ফলে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা খুব কষ্টকর হয়

ক্ষতিগ্রস্ত হবে তা নয়; ভবিষ্যৎ শিশুটির জীবনও ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এর কারণে পুরো পরিবার এবং সমাজও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

স্বাস্থ্যগত সমস্যা

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে গর্ভাবস্থায় রক্তক্ষরণ, শরীরে পানি আসা, খুব বেশি ব্যথা, চোখে ঝাপসা দেখা, এমনকি গর্ভপাত পর্যন্ত ঘটে থাকে। তাছাড়া মা ও সন্তানের মৃত্যুঝুঁকিও বেশি থাকে।

অপরিণত বয়সে গর্ভে সন্তান এলে সন্তানের বেড়ে ওঠার জন্য গর্ভে পর্যাপ্ত জায়গা থাকে না। ফলে কম

২০২৩

ওজনের শিশু জন্ম নেয়। এসব শিশুর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে। বড় হওয়ার পর এসব শিশু স্বাস্থ্যবান এবং সক্ষম মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠতে পারে না।

শিক্ষাগত সমস্যা

বিদ্যালয়ে পড়ার সময় যদি কোনো মেয়ে গর্ভধারণ করে, তবে তার লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় (চিত্র ৪.০৭)। সে লজ্জায় আর বিদ্যালয়ে যায় না। তার মানসিক চাপ বেড়ে যায় এবং নানা অশান্তিতে ভোগে। শারীরিক দিক থেকেও সে চলাফেরা করতে সমস্যায় (চিত্র ৪.০৮) পড়ে। এসব কারণে সে ঘরে বসেও লেখাপড়া করতে পারে না।

পারিবারিক সমস্যা

অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে মেয়েরা সুস্থভাবে অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে না। অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে তার পরিবারের অশান্তি দেখা দেয়। ইন্দোনেশিয়ায় বাল্যবিবাহের হার খুব বেশি এবং দেখা গেছে, সেখানে অর্ধেকের বেশি ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহের দম্পতির মাঝে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

আর্থিক সমস্যা

স্বাভাবিক গর্ভধারণে চিকিৎসকের নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পরামর্শ হলেই কাজ চলে যায় কিন্তু অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ করলে নয় মাসের পুরো সময় জুড়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। এছাড়া কোনো জটিল স্বাস্থ্যগত সমস্যা দেখা দিলে বারবার চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়। চিকিৎসক এবং ওষুধপত্রের জন্য অনেক অর্থের প্রয়োজন হয়। গর্ভবতী মায়ের জন্য অতিরিক্ত পুষ্টিকর খাদ্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। এতেও বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়। সব মিলিয়ে পরিবারের উপর একটি বড় ধরনের আর্থিক চাপ পড়ে (চিত্র ৪.০৯)।

চিত্র ৪.০৯: গর্ভধারণের ফলে বারবার চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হয়। ফলে সংসার খরচের ওপর চাপ পড়ে।

গর্ভপাত কী এবং গর্ভপাতের জটিলতা

একটি মেয়ের গর্ভে যখন সন্তান আসে, তখন প্রথম ভ্রূণ হিসেবে জরায়ুতে তার বৃদ্ধি ঘটে। ভ্রূণের বৃদ্ধি অবস্থায় কোনো কারণে সময়ের আগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জরায়ু থেকে ভ্রূণ বের হয়ে যাওয়াকে গর্ভপাত বলে। গর্ভের সন্তানকে নষ্ট করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে গর্ভপাত ঘটায়।

গর্ভধারণের ফলে সঙ্গীর চাপ, অন্যের প্রভাব এবং হতাশার কারণে অনেক মেয়ে আনাড়ি গর্ভপাতকারীদের

কাছে যায় এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণভাবে গর্ভপাত ঘটায়। এ ধরনের গর্ভপাতের ফলে মেয়েদের বড় ধরনের শারীরিক ঝুঁকি ছাড়াও তাদের উপর মানসিক এবং প্রবল আবেগীয় প্রভাব পড়ে। এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে।

একক কাজ

কাজ : অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের সমস্যাসমূহ ও তা থেকে পরিত্রাণের উপায় ৪.১০ চিত্রে লিপিবদ্ধ করো।

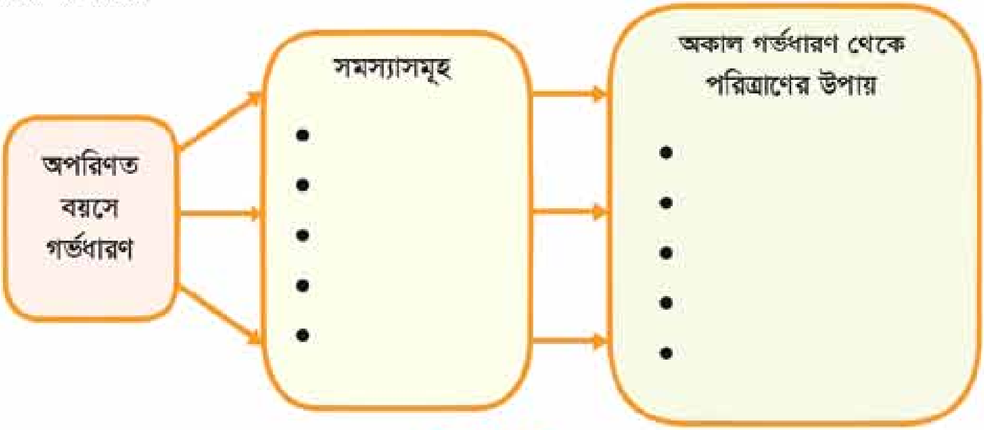

চিত্র: ৪.১০

একক কাজ

কাজ : গর্ভপাতের ঝুঁকিসমূহ ৪.১১ চিত্রে উল্লেখ করো।

চিত্র: ৪.১১

৪.১.৬ টেস্টটিউব বেবি

কৃত্রিম উপায়ে দেহের বাইরে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটিয়ে প্রাথমিক ভ্রূণ সৃষ্টি করে সেটি নারীদের জরায়ুতে প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে শিশুর জন্ম হলে তাকে টেস্ট টিউব বেবি বলা হয়। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সন্তানের জন্ম না হলে অনেক বাবা-মা এই প্রক্রিয়ায় সন্তানদের জন্ম দিতে আগ্রহী হন। দেহের বাইরে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মিলন ঘটানোকে বলে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন। ইটালির বিজ্ঞানী ড. পেট্রুসি (Dr. Petrucci) ১৯৫৯ সালে প্রথম টেস্টটিউব বেবি জন্ম প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তবে তিনি ততটা সফলতা অর্জন করতে পারেননি, শিশুটি মাত্র ২৯ দিন বেঁচে ছিল। এর প্রায় ১৯ বছর পর ১৯৭৮ সালে ইংল্যান্ডের ড. প্যাট্রিক স্টেপটো ও ড. রবার্ট এডওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় লুইস জয় ব্রাউন নামে একটি টেস্টটিউব বেবি জন্মায়। পর্যায়ক্রমে কতগুলো প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ইনভিট্রো ফার্টিলাইজেশন ঘটিয়ে টেস্টটিউব বেবির জন্ম দেওয়া হয়।

প্রক্রিয়াগুলো হলো (১) সক্ষম দম্পতি থেকে ডিম্বাণু ও শুক্রাণু সংগ্রহ করে বিশেষ ধরনের পালন মাধ্যমে (Culture medium) এদের মিলন ঘটান। (২) অতঃপর পালন মাধ্যমে প্রাথমিক ভ্রূণ উৎপাদন। (৩) উৎপাদিত ভ্রূণকে স্ত্রী জরায়ুতে প্রতিস্থাপন এবং সবশেষে (৪) প্রসূতির পরিচর্যা ও সন্তান লাভ সম্পন্ন করা। নিঃসন্তান দম্পতির সন্তান লাভের জন্য আজকাল এই প্রক্রিয়া আমাদের দেশেও বেশ ভালোভাবে চালু হয়েছে।

৪.২ সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ

আমরা জানি, কোনো জীবের জীবকোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর নির্দিষ্টসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। মানুষের জীবকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ২৩ জোড়া (মোট ৪৬টি)। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের ভেতর এক জোড়া ক্রোমোজোমকে লিঙ্গ নির্ধারক বা সেক্স ক্রোমোজোম বলে। ছেলেদের বেলায় এই এক জোড়া ক্রোমোজোম দুটি ভিন্ন, যার একটিকে X, অন্যটিকে Y নাম দেওয়া হয়েছে। ছবিতে দেখ, X ক্রোমোজোমটি লম্বা এবং Y ক্রোমোজোমটি ছোট। মেয়েদের বেলায় এই এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোমের দুটিই X ক্রোমোজোম। সেক্স ক্রোমোজোম ছাড়া বাকি অন্য সব ক্রোমোজোমকে অটোজোম বলে।

মানুষের শরীরের সব কোষেই ২৩ জোড়া (বা ৪৬টি) ক্রোমোজোম থাকলেও সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য মেয়েদের ডিম্বাণু এবং ছেলেদের শুক্রাণু এর ব্যতিক্রম। এই কোষগুলোতে অর্ধেকসংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রতি জোড়া থেকে একটি ক্রোমোজোম নিয়ে ডিম্বাণু তৈরি হয়, কাজেই সব ডিম্বাণুতেই ২২টি অটোজোম এবং একটি X ক্রোমোজোম থাকে। ছেলেদের সেক্স ক্রোমোজোমে যেহেতু X এবং Y দুটিই আছে, তাই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের প্রত্যেকটি থেকে একটি করে ক্রোমোজোম দিয়ে শুক্রানু তৈরি করা হলে দুটি ভিন্ন ধরনের শুক্রানু তৈরী করা সম্ভব। একটিতে থাকবে ২২টি

অটোজোম এবং একটি X ক্রোমোজোম, অন্যটিতে থাকবে ২২টি অটোজোম এবং একটি Y ক্রোমোজোম (চিত্র ৪.১২)।

মা	বাবা	সন্তান
ডিম্বাণুর ২২টি অটোজোম + X	শুক্রাণুর ২২টি অটোজোম + X	২২ জোড়া অটোজোম + XX (কন্যা)
ডিম্বাণুর ২২টি অটোজোম + X	শুক্রাণুর ২২টি অটোজোম + Y	২২ জোড়া অটোজোম + XY (পুত্র)

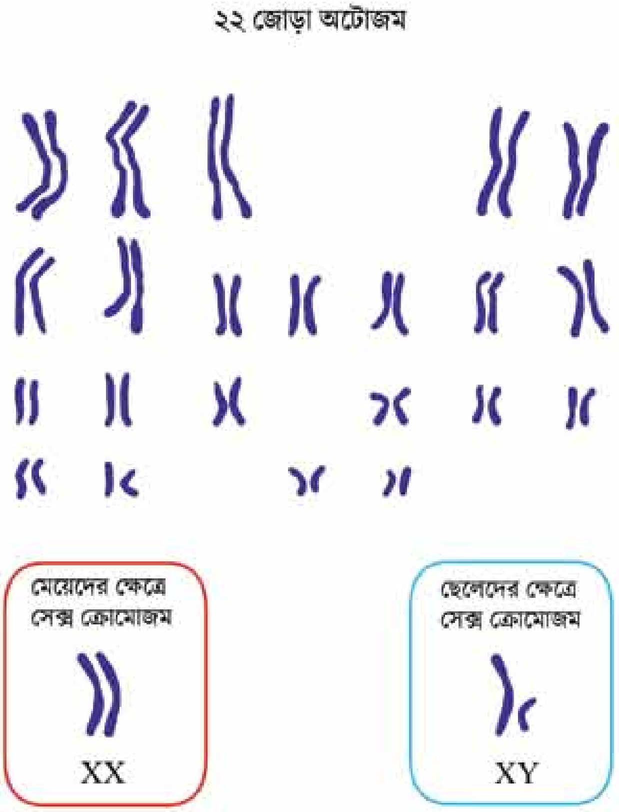

চিত্র ৪.১২: মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম

ডিম্বাণু ও শুক্রাণু মিলে গর্ভধারণ হয় এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ দুটি ভিন্নভাবে গর্ভধারণ সম্ভব। অর্থাৎ মিলিত কোষে মানুষের ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে এবং সেটি ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ মানবসন্তানে

জন্ম নেয়। যদি এটি ২২ জোড়া অটোজোম এবং XX সেক্স ক্রোমোজোম নিয়ে বেড়ে উঠে তাহলে কন্যাসন্তান হিসেবে জন্ম নেয়। যদি এটি ২২ জোড়া অটোজোম এবং XY সেক্স ক্রোমোজোম নিয়ে গড়ে ওঠে, তাহলে পুত্রসন্তান হিসেবে জন্ম নেয় (চিত্র ৪.১৩)।

একজন সুস্থ সন্তান, সে ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, মা-বাবার জন্য অনেক বড় একটি

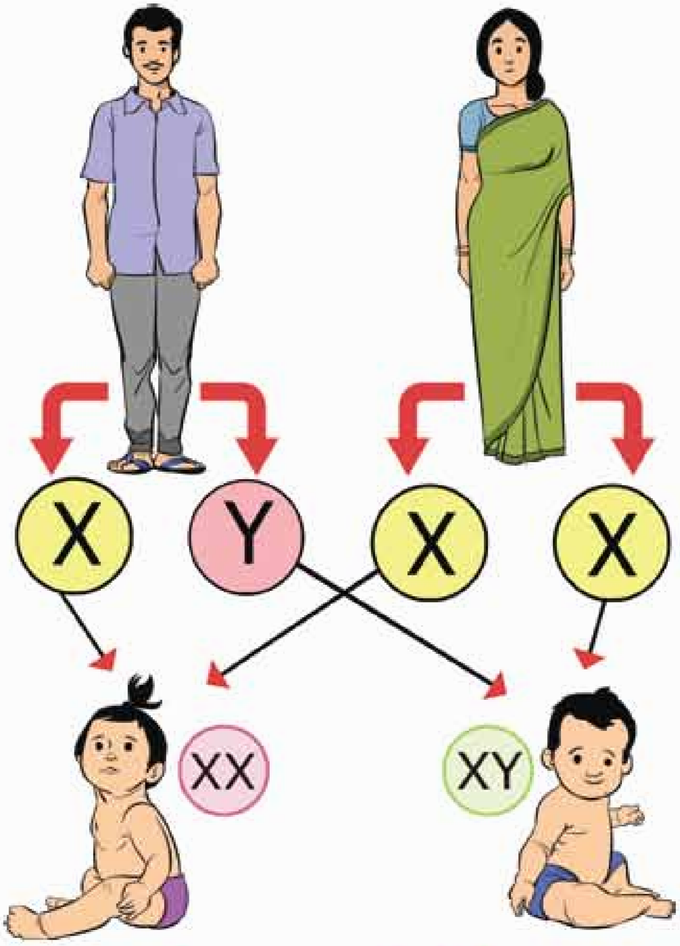

চিত্র ৪.১৩: সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ

আশীর্বাদ, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অজ্ঞতা এবং কুসংস্কারের কারণে অনেকে ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেয়। শুধু তা-ই নয়, মেয়ের জন্ম হলে মাকে দোষারোপ করা হয়। কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, সন্তান কী ছেলে সন্তান হবে না মেয়ে সন্তান হবে, তার জন্য মা কোনোভাবেই দায়ী নয়। ছেলেদের অসংখ্য শুক্রাণুর ভেতর X ক্রোমোজোম বহনকারী না Y ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হবে, সেটি হচ্ছে প্রকৃত কারণ।

৪.৩ পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি

বৈচিত্র্যময় এই পৃথিবীতে আমরা যেসব জীবের সঙ্গে পরিচিত, তাদের মধ্যে দশ লাখের বেশি প্রাণী প্রজাতি এবং চার লাখের মতো উদ্ভিদ-প্রজাতি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। একসময় মানুষের ধারণা ছিল, পৃথিবী বুঝি অপরিবর্তিত, অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর যে আকার বা আয়তন ছিল, এখনো সেরকমই আছে। অর্থাৎ তার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। মানুষ ভাবতো আদি জীবজগতের সঙ্গে বর্তমানকালের জীবজগতের কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জেনোফেন (Xenophane) নামের একজন বিজ্ঞানী প্রথম কতকগুলো জীবাশ্ম (fossil) আবিষ্কার করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে অতীত এবং বর্তমান যুগের জীবদেহের গঠনে যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থাৎ জীবদেহের আকার অপরিবর্তনীয় নয়।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রমাণ করেন যে জীবজগতের বিভিন্ন জীবের ভেতর এক শ্রেণির জীব অন্য শ্রেণির জীব থেকে অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং জীবগুলো তাদের পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তি লাভ করে বির্বতন বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। বিবর্তন একটি মন্থর এবং চলমান প্রক্রিয়া এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গঠনগতভাবে সরল জীবন থেকে জটিল জীবনের উৎপত্তি ঘটেছে।

বিভিন্ন বিজ্ঞানীর মতানুসারে, প্রায় সাড়ে চারশত কোটি বছর আগে এই পৃথিবী একটি উত্তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড ছিল। এই উত্তপ্ত গ্যাস-পিণ্ড ক্রমাগত তাপ বিকিরণ করায় এবং তার উত্তাপ কমে যাওয়ায় ক্রমশ ঘনীভূত হয়ে তরল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পরে এই পিণ্ডটি বাইরের দিক থেকে ভেতরের দিকে ক্রমশ কঠিন হতে থাকে এবং উদ্ভূত জলীয় বাষ্প থেকে মেঘের সৃষ্টি হয়। ওইরকম মেঘ থেকে বৃষ্টি হওয়ায় পৃথিবীর কঠিন বহিঃস্তরে জলভাগ অর্থাৎ সমুদ্রের আবির্ভাব ঘটে। এক সময়ে সমুদ্রের পানিতে প্রাণের আবির্ভাব হয় এবং সমুদ্রের পানিতে সৃষ্ট জীবকূলের ক্রমাগত পরিবর্তনের ফলে বর্তমানের বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়েছে।

গভীর যুক্তিনির্ভর চিন্তাভাবনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আধুনিক মানুষের ধারণা হয়েছে যে জীব সৃষ্টির মূলেই রয়েছে বিবর্তন। ল্যাটিন শব্দ 'Evolveri' থেকে বিবর্তন শব্দটি এসেছে। ইংরেজ দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) প্রথম ইভোলিউশন কথাটি ব্যবহার করেন। যে ধীর, অবিরাম এবং চলমান পরিবর্তন দ্বারা কোনো সরলতর উদবংশীয় জীব পরিবর্তিত হয়ে জটিল ও উন্নততর নতুন প্রজাতির বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে বিবর্তন বা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশন বলে। সময়ের সথে কোনো জীবের পরিবর্তনের ফলে যখন নতুন কোনো প্রজাতি সৃষ্টি হয়, তখন তাকে বলে জৈব বিবর্তন।

চিত্র ৪.১৪: রাসায়নিক এবং জৈব বিবর্তনের ধাপগুলো

৪.৩.১ জীবনের আবির্ভাব কোথায়, কবে এবং কীভাবে ঘটেছে

পৃথিবীতে জীবনের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ বর্তমানে প্রচলিত আছে। তবে জীবনের উৎপত্তি যে প্রথমে সমুদ্রের পানিতে হয়েছিল এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এ সম্পর্কে

২০২৫

বিজ্ঞানীরা যে যুক্তি রেখেছেন, সেগুলো এরকম: প্রথমত, অধিকাংশ জীবকোষ এবং দেহস্থ রক্ত ও অন্যান্য তরলে নানারকম লবণের উপস্থিতি, যার সঙ্গে সমুদ্রের পানির খনিজ লবণের সাদৃশ্য রয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমুদ্রের পানিতে এখনো অনেক সরল এবং এককোষী জীব বসবাস করে।

পৃথিবীতে কীভাবে জীব সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুমান এরকম: প্রায় ২৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে মিথেন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং জলীয় বাষ্প, নাইট্রোজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছিল; কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস ছিল না। অহরহ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটত এবং বজ্রপাতের ফলে ও অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে এই যৌগ পদার্থগুলো মিলিত হয়ে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড উৎপন্ন করে। ল্যাবরেটরিতে এই প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে প্রমাণ করা হয়েছে। পরে অ্যামাইনো এসিড এবং নিউক্লিক এসিড মিলিত হওয়ায় নিউক্লিওপ্রোটিন অণুর সৃষ্টি হয়। নিউক্লিওপ্রোটিন অণুগুলো ক্রমে নিজেদের প্রতিরূপ-গঠনের (replication) ক্ষমতা অর্জন করে এবং জীবনের সূত্রপাত ঘটায়। পৃথিবীর উৎপত্তি ও জীবনের উৎপত্তির ঘটনাপ্রবাহকে বলে রাসায়নিক বিবর্তন বা অভিব্যক্তি।

ধারণা করা হয়, প্রোটিন ও নিউক্লিক এসিড সহযোগে সৃষ্টি হয় নিউক্লিওপ্রোটিন। এই নিউক্লিওপ্রোটিন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রোটোভাইরাস এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় ভাইরাস। ভাইরাস এমন একটা অবস্থা নির্দেশ করে যেটি হচ্ছে জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী অবস্থা।

নিউক্লিওপ্রোটিন → প্রোটোভাইরাস → ভাইরাস

এরপর সম্ভবত উদ্ভব হয় ব্যাকটেরিয়া এবং আরও পরে সৃষ্টি হয় প্রোটোজোয়া। ব্যাকটেরিয়ার নিউক্লিয়াস আদি প্রকৃতির, তাই এদেরকে আদি কোষ বলা হয়। পরে প্রোটোজোয়ানদের দেহে দেখা গেল সুগঠিত নিউক্লিয়াস। কিছু এককোষী জীবদেহে সৃষ্টি হলো ক্লোরোফিল ফলে একদিকে যেমন খাদ্য সংশ্লেষ সম্ভব হলো, তেমনি খাদ্য সংশ্লেষের উপজাত (by product) হিসেবে অক্সিজেন সৃষ্টি হতে শুরু করল। তখন সবাত শ্বসনকারী জীবদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকল। উদ্ভব হলো এককোষী থেকে বহুকোষী জীব। এরপর একদিকে উদ্ভিদ ও অপরদিকে প্রাণী—দুটি ধারায় জীবের অভিব্যক্তি বা বিবর্তন শুরু হলো।

বিবর্তনের স্বপক্ষে প্রমাণ

বিবর্তনের আলোচনায় মূলত দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একটি হলো, বিবর্তন যে হয়েছে তার প্রমাণ, অপরটি হলো, বিবর্তনের পদ্ধতি অর্থাৎ কীভাবে জীবজগতে বিবর্তন এসেছে তার বর্ণনা। প্রাণ সৃষ্টির পর থেকে কোটি কোটি বছর ধরে জীবজগতের যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটেছে, তার স্বপক্ষে একাধিক প্রমাণ আছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো।

১. অঙ্গসংস্থান সম্পর্কিত প্রমাণ

বিভিন্ন জীবের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক গঠনকে অঙ্গসংস্থান বলে। এদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের

২০২১

আলোচনাকে তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান বলে। সমসংস্থ অঙ্গ, সমবৃত্তীয় অঙ্গ এবং লুপ্তপ্রায় অঙ্গের তুলনামূলক অঙ্গসংস্থান এখানে আলোচিত হলো।

(ক) সমসংস্থ অঙ্গ: পাখির ডানা, বাদুড়ের ডানা, তিমির ফ্লিপার, সিলের অগ্রপদ, ঘোড়ার অগ্রপদ, মানুষের হাত—এর সবগুলোই সমসংস্থ অঙ্গ। আপাতদৃষ্টিতে এদের আকৃতিগত পার্থক্য দেখা গেলেও অভ্যন্তরীণ কাঠামো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে এদের অস্থিবিন্যাসের মৌলিক প্রকৃতি একই ধরনের

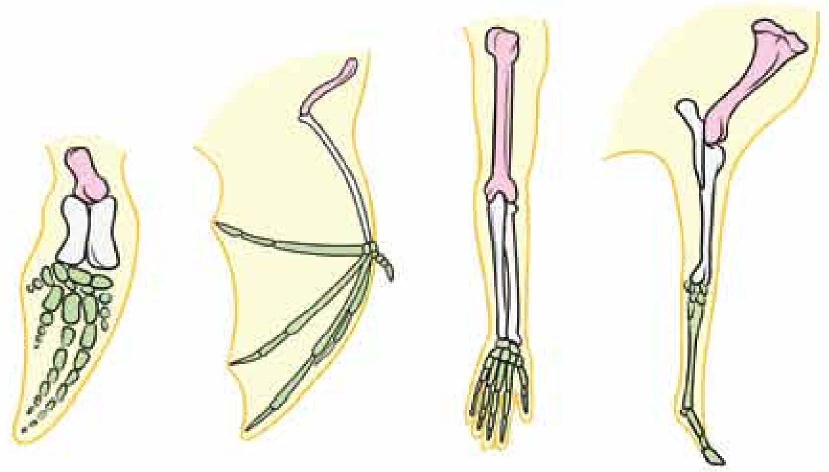

চিত্র ৪.১৫: সমসংস্থ অঙ্গ

(চিত্র ৪.১৫)। অর্থাৎ সকল প্রাণীর জন্যই এখানকার অস্থিগুলো উপর থেকে নিচের দিকে পরপর সাজানো রয়েছে। বাইরে থেকে দেখতে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে, সেটি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের সাথে অভিযোজিত হওয়ার জন্য ঘটেছে। পাখি ও বাদুড়ের "অগ্রপদ" ওড়ার জন্য, তিমির ফ্লিপার সাঁতারের জন্য, ঘোড়ার অগ্রপদ দৌড়ানোর জন্য ও মানুষের অগ্রপদ কোনো জিনিস ধরা ও অন্যান্য সৃজনশীল কাজের জন্য পরিবর্তিত হয়েছে। সমসংস্থ অঙ্গগুলো থেকে বোঝা যায় যে সংশ্লিষ্ট অঙ্গ তথা জীবগুলো উৎপত্তিগতভাবে এক, যদিও সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার ফলে বর্তমানে তাদের গঠন বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই বিবর্তনবিদগণ মনে করেন যে সমসংস্থ অঙ্গবিশিষ্ট জীবগুলোর উৎপত্তি একই পূর্বপুরুষ থেকে ঘটেছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তন সমর্থন করে।

(খ) সমবৃত্তি অঙ্গ: বিভিন্ন প্রাণীর যে অঙ্গগুলোর উৎপত্তি, বিকাশ এবং গঠন ভিন্ন হলেও তারা একই কাজ করে, সেই অঙ্গগুলোকে সমবৃত্তি অঙ্গ বলে। যেমন পতঙ্গ কিংবা বাদুড়ের ডানা উড়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের উৎপত্তি ও গঠন সম্পূর্ণ আলাদা হলেও একই পরিবেশের প্রভাবে তারা একই রকম কাজ করার জন্য অভিযোজিত হয়েছে অর্থাৎ বাদুড় এবং পতঙ্গ দুটিই প্রয়োজনের তাগিদে উড়তে সাহায্য করার উপযোগী অঙ্গ তৈরি করেছে। এরকম সমবৃত্তি অঙ্গগুলো বিবর্তন সমর্থন করে।

(গ) লুপ্তপ্রায় অঙ্গ: জীবদেহে এমন কতকগুলো অঙ্গ দেখা যায়, যেগুলো কিছু জীবদেহে সক্রিয় থাকে কিন্তু অপর জীবদেহে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, এমন অঙ্গগুলোকে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বা নিষ্ক্রিয় অঙ্গ বলে। প্রাণীদেহের মধ্যে বহু লুপ্তপ্রায় অঙ্গ রয়েছে। মানুষের সিকাম এবং সিকাম-সংলগ্ন ক্ষুদ্র অ্যাপেন্ডিক্সটি নিষ্ক্রিয়, কিন্তু স্তন্যপায়ীভুক্ত তৃণভোজী প্রাণীদের (যেমন ঘোড়া কিংবা গিনিপিগের) দেহে এগুলো সক্রিয়।

মানুষের দেহে লেজ নেই, তবু মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে ককসিক্স নামক লুপ্তপ্রায় অঙ্গ রয়েছে। এই ককসিক্স মানুষের পূর্বপুরুষে সুগঠিত ছিল। গরু, ঘোড়া, ছাগল, মানুষ এদের সবার কানের গঠনের

চিত্র ৪.১৬: লুপ্তপ্রায় অঙ্গ

বৈশিষ্ট্য একই ধরনের। এ ধরনের আলোচনা থেকে বলা যায় যে লুপ্তপ্রায় অঙ্গ বহনকারী প্রাণীটির উৎপত্তি ঘটেছে এমন উদবংশীয় প্রাণী থেকে, যার দেহে একসময় উক্ত অঙ্গটি সক্রিয় ছিল (চিত্র ৪.১৬)।

২. তুলনামূলক শারীরস্থানিক প্রমাণ

বিভিন্ন প্রাণীর অঙ্গের অন্তর্গঠনের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য-সংক্রান্ত আলোচনাকে তুলনামূলক শারীরস্থান বলে। বিভিন্ন শ্রেণির মেরুদণ্ডী প্রাণীর কোনো কোনো অঙ্গের গঠনের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে এদের গঠনে মৌলিক মিল রয়েছে। এই তথ্য জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে। উদাহরণস্বরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের হৃৎপিণ্ডের গঠনের উল্লেখ করা যায়। মাছের হৃৎপিণ্ড দুটি প্রকোষ্ঠযুক্ত; উভচরের (ব্যাঙের) হৃৎপিণ্ড তিনটি প্রকোষ্ঠযুক্ত। আবার সরীসৃপের হৃৎপিণ্ড দুটি অলিন্দ এবং অসম্পূর্ণভাবে বিভক্ত দুটি নিলয় থাকে। পাখি এবং স্তন্যপায়ীর হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্ঠযুক্ত অর্থাৎ সেখানে রয়েছে দুটি অলিন্দ এবং দুটি নিলয়। উপরিউক্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর হৃৎপিণ্ডের মৌলিক গঠন এক, যদিও ধীরে ধীরে সেটি জটিল হয়েছে। অর্থাৎ একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের ধারায় ক্রমশ বিভিন্ন জটিল জীবগুলোর উৎপত্তি ঘটেছে।

৩. সংযোগকারী জীবন সম্পর্কিত প্রমাণ

জীবজগতে এমন জীবের অস্তিত্ব দেখা যায়, যাদের মধ্যে দুটি জীবগোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে। এ ধরনের জীবকে সংযোগকারী জীব বা কানেকটিং লিংক (Connecting link) বলে। উদাহরণ দেওয়ার জন্য প্লাটিপাসের (চিত্র ৪.১৭) নাম উল্লেখ করা যায়। প্লাটিপাসের মধ্যে সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী দুই ধরনের প্রাণীরই বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্লাটিপাস সরীসৃপের মতো ডিম পাড়ে। অপরদিকে স্তন্যপায়ীর মতো এদের শরীর লোমে ঢাকা, বুকে রয়েছে দুগ্ধগ্রন্থি। শুধু তা-ই নয়, এদের ডিম ফুটে শাবক জন্মালে এরা শাবককে স্তন্য পান করায়। সংযোগকারী প্রাণীদের অধিকাংশই পৃথিবীর পরিবর্তনের সাথে কার্যকরীভাবে অভিযোজিত হতে সক্ষম না হওয়ায় ধীরে ধীরে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

জীবাশ্মের পরীক্ষা থেকে অন্তবর্তী উদ্ভিদের অস্তিত্ব বিরল ঘটনা হলেও এমন কিছু কিছু উদ্ভিদের কথা জানা যায়, যাদের মধ্যে পাশাপাশি দুটি গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য বর্তমান। Gnetum (নিটাম) নামক গুপ্তবীজী উদ্ভিদে নগ্নবীজী এবং গুপ্তবীজী দুই ধরনের উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যই দেখা যায়।

চিত্র ৪.১৭: প্লাটিপাস

জৈব বিবর্তনের মতবাদ অনুসারে এক গোষ্ঠীর জীব থেকে অপর গোষ্ঠীর জীবের আবির্ভাব ঘটে থাকলে দুই গোষ্ঠীর মাঝামাঝি অন্তর্বর্তী জীবের অস্তিত্ব থাকা উচিত। অর্থাৎ সরীসৃপ থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীরা জন্ম হলে মাঝামাঝি এমন প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা উচিত যেটি সরীসৃপ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর মাঝামাঝি। কাজেই প্রকৃতিতে এই সকল সংযোগকারী জীবের উপস্থিতি জৈব বিবর্তনকে সমর্থন করে।

৪. ভ্রূণতত্ত্বঘটিত প্রমাণ

ডিমের ভিতরে অথবা গর্ভের মধ্যে (স্তন্যপায়ীর ক্ষেত্রে) অবস্থিত শিশু প্রাণীকে এবং উদ্ভিদের বীজের মধ্যে অবস্থিত শিশু উদ্ভিদকে ভ্রূণ বলে। বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের ভ্রূণের সৃষ্টি এবং তাদের ক্রমবৃদ্ধি পরীক্ষা করা হলে যে তথ্য পাওয়া যায়, সেটি জৈব বিবর্তনের মতবাদকে সমর্থন করে।

মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ, পাখি এবং স্তন্যপায়ীর অন্তর্গত মেরুদণ্ডী প্রাণীগুলোর ভ্রূণ পর্যবেক্ষণ করলে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। ভ্রূণের প্রাথমিক অবস্থায় কোনটি কোন প্রাণীর তা শনাক্ত করা অসম্ভব। প্রতিটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর ভ্রূণে ফুলকা, ফুলকা ছিদ্র এবং লেজ থাকে।

ভ্রূণের একরম সাদৃশ্য লক্ষ করে বিজ্ঞানী হেকেল (Haeckel) এই সিদ্ধান্তে আসেন, যে প্রতিটি জীব তার ভ্রূণের বিকাশের সময় অতি অল্প সময়ের জন্য হলেও উদ্‌বংশীয় জীব বা তার পূর্বপুরুষের বিবর্তনের রূপের পুনরাবৃত্তি ঘটায়। প্রকৃতির এই নিয়মকেই হেকেল পরে বলেছিলেন, 'অনটোজেনি রিপিটস্ ফাইলোজেনি' (Ontogeny repeats phylogeny), অর্থাৎ কোনো জীবের ভ্রূণের ক্রমপরিণতি পর্যবেক্ষণ করলে তার পূর্বপুরুষের ইতিহাস জানা যাবে, যা বিবর্তনের স্বপক্ষে একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

৫. জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ

বিজ্ঞানের যে শাখা বর্তমান পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া জীব সম্পর্কে অনুসন্ধানে নিয়োজিত, তাকে প্রত্নজীববিদ্যা বলে। বিজ্ঞানের এই শাখা থেকে নানা প্রকারের জীবাশ্মের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন অবলুপ্ত জীব সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়।

বিবর্তন সম্পর্কে যেসব প্রমাণ আছে, তাদের মধ্যে জীবাশ্মঘটিত প্রমাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভূগর্ভের শিলাস্তরে দীর্ঘকাল চাপা পড়ে থাকা জীবের সামগ্রিক বা আংশিক প্রস্তরীভূত দেহ বা দেহছাপকে জীবাশ্ম বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত শিলার মধ্যে এগুলো সঞ্চিত রয়েছে। জীবাশ্মের সাহায্যে অকাট্যভাবে প্রমাণ করা যায় যে বিবর্তনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে এক রকম জীব থেকে অন্য রকম জীবের উৎপত্তি ঘটেছে। জীবাশ্ম আবিষ্কারের আগে ধারাবাহিক বিবর্তনের মধ্যে উপযুক্ত প্রমাণের অভাব থাকায় বিবর্তনের ইতিহাসে বেশ কিছু ফাঁক থেকে গিয়েছিল। অনুমান করা হয় যে ঐ ফাঁকগুলোতে এমন কোনো ধরনের জীব ছিল, যাদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই রকম খোঁজ না পাওয়া জীবদের মিসিং লিংক (missing link) বা হৃত-যোজক বলা হয়। জীবাশ্ম আবিষ্কারের মাধ্যমে ঐ সমস্ত মিসিং লিংকের সন্ধান পাওয়ায় আজকাল বিবর্তনের ধারাবাহিক ইতিহাসের অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে।

চিত্র ৪.১৮: আর্কিওপটেরিক্স

জীবাশ্মকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের বা বিগত যুগের জীবন্ত সাক্ষী হিসেবে গণ্য করা হয়। শিলাস্তর থেকে জীবাশ্ম দেখে জীবটির জীবিতকালের তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ জীবাশ্মের বৈশিষ্ট্য দেখে বর্তমান এবং অতীতের যোগসূত্র খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় যে, লুপ্ত আর্কিওপটেরিক্স (Archaeopteryx) নামে একরকম প্রাণীর জীবাশ্ম (চিত্র ৪.১৮) পরীক্ষা করে দেখা গেছে, এদের সরীসৃপের মতো পা ও দাঁত, পাখির মতো পালকবিশিষ্ট দুটি ডানা, একটি দীর্ঘ লেজ, লেজের শেষ প্রান্তে একগুচ্ছ পালক এবং চঞ্চু ছিল। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী থেকেই বিবর্তনের মাধ্যমে পাখি-জাতীয় প্রাণীর উৎপত্তি ঘটেছে।

উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বিলুপ্ত টেরিডোস্পার্ম (Pteridosperm) নামে এক ধরনের উদ্ভিদের জীবাশ্মে ফার্ন ও ব্যক্তবীজী (gymnosperm) উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়- এ কারণে ফার্ন-জাতীয় উদ্ভিদ থেকে জিমনোস্পার্ম অর্থাৎ ব্যক্তবীজী উদ্ভিদের আবির্ভাব ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

৬. জীবন্ত জীবাশ্ম

কতগুলো জীব সুদূর অতীতে উৎপত্তি লাভ করেও কোনোরকম পরিবর্তন ছাড়াই এখনো পৃথিবীতে বেঁচে আছে, অথচ তাদের সমগোত্রীয় এবং সমসাময়িক অনেক জীবনের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই জীবদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলে। লিমুলাস বা রাজকাঁকড়া (চিত্র ৪.১৯) নামক সন্ধিপদ প্রাণী, স্ফেনোডন নামক সরীসৃপ প্রাণী, প্লাটিপাস নামক স্তন্যপায়ী প্রাণী এর উদাহরণ। অন্যদিকে ইকুইজিটাম, নিটাম ও গিঙ্কো

বাইলোবা নামের উদ্ভিদগুলো উদ্ভিদের জীবন্ত জীবাশ্মের উদাহরণ।

প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর আগের লিমিউলাস জীবাশ্ম পাওয়া গিয়েছে। এর সমসাময়িক অন্যান্য আর্থ্রোপোডাগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এরা আজও বেঁচে আছে। তাই এদের জীবন্ত জীবাশ্ম বলা হয়।

চিত্র ৪.১৯: জীবন্ত জীবাশ্ম-লিমুলাস

৪.৪ বিবর্তন বা অভিব্যক্তির উপর বিভিন্ন মতবাদ

বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ফলে নতুন প্রজাতির অথবা একটি প্রজাতি থেকে অন্য একটি প্রজাতির উৎপত্তি হয়। অভিব্যক্তির কৌশল সম্পর্কে যে সকল বিজ্ঞানী বিভিন্ন মতবাদ (theories) প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের মতবাদগুলো আমরা এখন আলোচনা করব।

চিত্র ৪.২০: বিজ্ঞানী ল্যামার্ক

৪.৪.১ ল্যামার্কের তত্ত্ব

ল্যামার্ক (চিত্র ৪.২০) 'বায়োলজি' শব্দটির প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি প্রথম বিবর্তন বা অভিব্যক্তির ওপর বিশ্লেষণী তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এ বিষয়টি তিনি ১৮০৯ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা 'ফিলোসোফিক জুওলজিক' (Philosophic Zoologique) নামে একটি বইতে লিপিবদ্ধ করেন।

ল্যামার্কের তত্ত্বকে ল্যামার্কিজম (Lamarckism) বা ল্যামার্কবাদ বলে। কয়েকটি প্রধান প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে ল্যামার্কবাদ গঠিত। সেগুলো এখানে আলোচনা করা হলো:

১. ব্যবহার ও অব্যবহারের সূত্র

ল্যামার্কের মতে, জীবের প্রয়োজনে জীবদেহে কোনো নতুন অঙ্গের উৎপত্তি অথবা কোনো পুরোনো অঙ্গের অবলুপ্তি ঘটতে পারে। তাঁর মতে, যদি কোনো জীবের কোনো অঙ্গ ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত ব্যবহৃত হয়, তবে সেই অঙ্গ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তার জন্য ধীরে ধীরে সবল ও সুগঠিত হবে। অন্যদিকে, জীবের কোনো অঙ্গ পরিবেশের জন্য অপ্রয়োজনীয় হলে ঐ অঙ্গের আর ব্যবহার থাকে

না। সুতরাং ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে অঙ্গটি নিষ্ক্রিয় অঙ্গে পরিণত হবে এবং অবশেষে অবলুপ্ত হয়ে যাবে। ল্যামার্কের মতে, অঙ্গের ব্যবহার ও অব্যবহার জীবদেহে পরিবর্তন সূচিত করে, যা জীবের বংশপরম্পরায় অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

২. পরিবেশের প্রভাব

জীব সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে উপযুক্তভাবে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সব সময় চেষ্টা করে। এটি জীবের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। স্বাভাবিকভাবে পরিবর্তনশীল পরিবেশে নিজেকে অভিযোজিত করতে জীবদেহে নানা রকমের পরিবর্তন দেখা যায়। ল্যামার্কের মতে, পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে জীবের স্বভাব এবং দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। এটাও একটি জীবের অর্জিত বৈশিষ্ট্য।

৩. অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ও নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

ল্যামার্কের মতে, কোনো জীবের জীবনকালে যে সকল বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়, সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় অর্থাৎ অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণ ঘটে।

ল্যামার্কের তত্ত্ব অনুযায়ী, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের জন্য এবং প্রতিটি প্রজন্মে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জিত হওয়ায় ধীরে ধীরে একটি প্রজাতি থেকে অপর একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়।

ল্যামার্ক কতগুলো পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই তার মতবাদ রচনা করেছিলেন। তার দেওয়া কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে মতবাদটির স্বপক্ষে ব্যাখ্যা দেওয়া হলো:

- ক্রমাগত পানিতে সাঁতার কাটার ফলে জলজ পাখির পায়ের আঙ্গুলের অন্তর্বর্তী স্থানগুলো পাতলা চামড়া দ্বারা সংযুক্ত হওয়ায় লিপ্তপদে পরিণত হয়েছে।
- সাপের পূর্বপুরুষদের গিরগিটির মতো চারটে পা ছিল, কিন্তু গর্ত ও ফাটলে বাস করার জন্য পায়ের ক্রমাগত অব্যবহারের ফলে বর্তমানে ঐ বৈশিষ্ট্যটি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে।
- ল্যামার্কের মতে, জিরাফের সুদীর্ঘ গ্রীবা, খুব উঁচু গাছ থেকে পাতা সংগ্রহের জন্য, অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুসরণের ফলেই ঘটেছে।

আধুনিক যুগের বিজ্ঞানীরা জৈব বিবর্তনে ল্যামার্কের মতবাদ গ্রহণ করতে পারেননি। শুধু সময়ের সাথে প্রজাতির পরিবর্তন হয়েছে, সেটি বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন না। বংশগতিবিদ্যার প্রসারের পর বিজ্ঞানীরা জীবের মধ্যে অর্জিত বৈশিষ্ট্যের বংশানুক্রম অনুসন্ধান করেছেন কিন্তু সেটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। অর্থাৎ বাস্তব অর্জিত বৈশিষ্ট্য পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়, এর স্বপক্ষে বর্তমান বংশগতিবিদগণ কোনো প্রমাণ পাননি। সহজভাবে বলা যায়, কোনো মানুষ ব্যায়াম করে এবং ক্রমাগত ব্যবহার করে তার একটি হাতকে শক্তিশালী করে তুললে তার সন্তান শক্তিশালী হাত নিয়ে জন্ম নেবে সেটি সত্যি নয়।

৪.৪.২ ডারউইনবাদ বা ডারউইনের মতবাদ

ল্যামার্ক বিবর্তনের যে মতবাদ দেন, তার ৫০ বছর পর ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (চিত্র ৪.২১) একটি বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সৃষ্টি করেন। বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন (Charles Darwin, ১৮০৯-১৮৮২) ইংল্যান্ডের সাসবেরি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত গ্যালাপ্যাগোস দ্বীপপুঞ্জ পরিভ্রমণকালে তিনি ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদ ও প্রাণিকুলের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তনের প্রায় ২০ বছর পরে ১৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে 'প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা প্রজাতির উদ্ভব' (Origin of species by means of natural selection) নামে একটি বইয়ে তাঁর মতবাদটি প্রকাশ করেন।

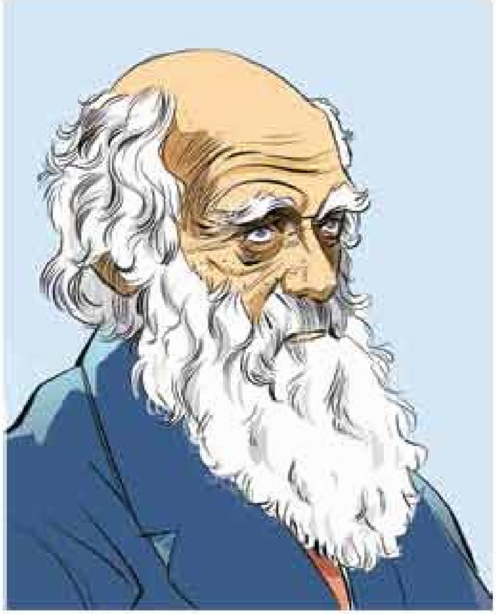

চিত্র ৪.২১: বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন

ডারউইনের দৃষ্টিতে প্রকৃতিতে সংঘটিত সাধারণ সত্যগুলো এরকম:

১. অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি

ডারউইনের মতে, অত্যধিক হারে বংশবৃদ্ধি করাই জীবের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এর ফলে জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি সরিষা গাছ থেকে বছরে প্রায় ৭৩০,০০০টি বীজ জন্মায়। এই ৭৩০,০০০ বীজ থেকে ৭৩০,০০০ সরিষা গাছের জন্ম হওয়া সম্ভব। আবার একটি স্ত্রী স্যামন মাছ প্রজনন ঋতুতে প্রায় ৩ কোটি ডিম পাড়ে। ডারউইনের মতে, এক জোড়া হাতি থেকে উদ্ভূত সবগুলো হাতি বেঁচে থাকলে ৭৫০ বছরে হাতির সংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লাখ।

২. সীমিত খাদ্য ও বাসস্থান

ভূপৃষ্ঠের আয়তন সীমাবদ্ধ হওয়ায় জীবের বাসস্থান এবং খাদ্য সীমিত।

৩. অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম

জীবেরা জ্যামিতিক ও গাণিতিক হারে সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটায় এবং খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় জীবকে বেঁচে থাকার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। ডারউইন এ ধরনের সংগ্রামকে 'অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম' বলে অভিহিত করেন। ডারউইন লক্ষ করেন যে জীবকে তিনটি পর্যায়ে এই সংগ্রাম করতে হয়। সেগুলো হচ্ছে:

(ক) আন্তঃপ্রজাতি সংগ্রাম: উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যাঙ কীটপতঙ্গ খায়, অন্যদিকে সাপ ব্যাঙদের খায়। আবার ময়ূর সাপ এবং ব্যাঙ দুটোকেই খায়- এভাবে নিতান্ত জৈবিক কারণেই বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্পর্কের একটি নিষ্ঠুর জীবনসংগ্রাম গড়ে ওঠে।

(খ) অন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রাম: একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের খাদ্য ও বাসস্থান একই রকমের হওয়ায়, এদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে এরা নিজেদের মধ্যেই বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা শুরু করে; উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে একটি দ্বীপে তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা বেড়ে গেলে খাদ্য ও বাসস্থান সীমিত থাকায় তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে সংগ্রাম শুরু করে। সবল প্রাণীগুলো দুর্বল প্রাণীদের প্রতিহত করে গ্রাসাচ্ছাদন করে। ফলে দুর্বল প্রাণীগুলো কিছুদিনের মধ্যেই অনাহারে মারা পড়ে।

(গ) পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম: বন্যা, খরা, ঝড়-ঝঞ্ঝা, বালিঝড়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত—এ ধরনের প্রতিকূল পরিবেশ জীবের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে। সুতরাং জীবকে তার অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত এসব প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। যে প্রাণীগুলো এই পরিবেশে টিকে থাকতে পারে তারা বেঁচে থাকে অন্যরা বিলুপ্ত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে উত্তর ও মধ্য আমেরিকার কোয়েল পাখি প্রচণ্ড ঠান্ডা ও তুষারপাতের ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

৪. প্রকরণ বা জীবদেহে পরিবর্তন

চার্লস ডারউইনের মতে, পৃথিবীতে দুটি জীব কখনোই অবিকল একই ধরনের হয় না। যত কমই হোক এদের মধ্যে কিছু না কিছু পার্থক্য থাকে। জীব দুটির মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায়, তাকে প্রকরণ বা পরিবৃত্তি বলে। অস্তিত্বের জন্য জীবনসংগ্রামে অনুকূল প্রকরণ একটি জীবকে সাহায্য করে।

৫. যোগ্যতমের জয়

ডারউইনের মতে, যেসব প্রকরণ জীবের জীবনসংগ্রামের পক্ষে সহায়ক এবং পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনমূলক, তারাই কেবল বেঁচে থাকে; অন্যরা কালক্রমে পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হয়ে যায়। মেরু অঞ্চলের ভাল্লুক বা বাঘ বা উদ্ভিদ গ্রীষ্মপ্রধান পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে না।

৬. প্রাকৃতিক নির্বাচন

ডারউইন তত্ত্বের এই প্রতিপাদ্যটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। 'অনুকূল (বা অভিযোজনমূলক) প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা অন্যদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে—এই প্রক্রিয়াকে প্রাকৃতিক নির্বাচন বলে।' অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকে এবং অত্যধিক হারে বংশবিস্তার করে। অপরদিকে, প্রতিকূল প্রকরণসম্পন্ন জীবেরা প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে ধীরে ধীরে তারা অবলুপ্ত হয় (চিত্র ৪.২২)।

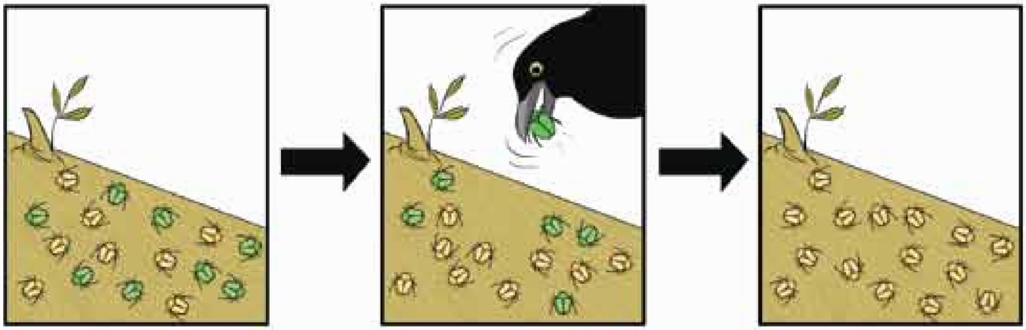

চিত্র ৪.২২: অনুকূল প্রকরণ সমন্বিত জীবেরা প্রকৃতির দ্বারা নির্বাচিত হয়ে বেশি সংখ্যায় বেঁচে থাকে।

ডারউইনের মতবাদ অনুসারে পরিবেশে যে জীবটি খাপ খাইয়ে নিবে, সে হবে যোগ্য এবং যোগ্য জীবটি পরিবেশে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে বেঁচে থাকার জন্য বংশবৃদ্ধি করবে এবং টিকে থাকবে।

৭. নতুন প্রজাতির উৎপত্তি

যেসব প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে সুবিধাজনক প্রকরণ দেখা যায়, প্রকৃতি তাদের নির্বাচন করে এবং তাদের লালন করে। সুবিধাজনক প্রকরণযুক্ত প্রাণী এবং উদ্ভিদ পরিবেশের সাথে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে এবং অযোগ্যদের তুলনায় বেশি হারে বংশবিস্তার করতে পারে। উত্তরাধিকার সূত্রে এদের বংশধরদের মধ্যে প্রকরণগুলো সঞ্চারিত হয়। এই বংশধরদের মধ্যে আবার যাদের সুবিধাজনক প্রকরণ বেশি থাকে, প্রকৃতি আবার তাদের নির্বাচন করে। এভাবে যুগ-যুগান্তর ধরে নির্বাচিত করে করে প্রকৃতি প্রাণী ও উদ্ভিদের নতুন প্রজাতি সৃষ্টি করে।

বর্তমানে বংশগতিবিদ, কোষতত্ত্ববিদ ও শ্রেণিবিদগণ নতুন প্রজাতির উৎপত্তির বিষয়ে মেন্ডেলের বংশগতি মতবাদের এবং ডারউইনের বিবর্তন মতবাদের ভিত্তিতে বলেন, ধীর গতিতে তিনটি ভিন্ন উপায়ে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হতে পারে:

(ক) মূল প্রজাতির থেকে পৃথক হয়ে (isolation) যাওয়ার ফলে

(খ) সংকরায়ণের (hybridization) ফলে এবং

(গ) সংকরায়ণ প্রজাতিতে কোষ বিভাজনের সময় ঘটনাক্রমে কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার বৃদ্ধির (Polyploidy) ফলে। এর ফলে নতুন জীবটির অভিযোজন ঘটবে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা একটি নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হবে।

চার্লস ডারউইনকে জৈব বিবর্তনের জনক বলা হলেও তার মতবাদের ওপর এখনো কিছু প্রশ্ন রয়ে গেছে। তার মতবাদের যে বিষয়গুলো নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে, তার উত্তরের খোঁজে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে যাচ্ছেন। পৃথিবীর সব বিজ্ঞানীকে নিয়ে একবার একটা জরিপ নেওয়া হয়েছিল, জরিপের বিষয়বস্তু ছিল পৃথিবীর নানা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ কোনটি। বিজ্ঞানীরা রায় দিয়ে বলেছিলেন, বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব হচ্ছে ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন পানিতে প্রথম জীবের উৎপত্তি হয়েছিল?

(ক) নদীর (খ) ঝরনার

(গ) সমুদ্রের (ঘ) পুকুরের

২. প্রোটোভাইরাস সৃষ্টির আগে বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাসটি ছিল তা হলো:

(i) অক্সিজেন

(ii) হাইড্রোজেন

(iii) নাইট্রোজেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (গ) ii ও iii

(খ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের গ্রাফটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

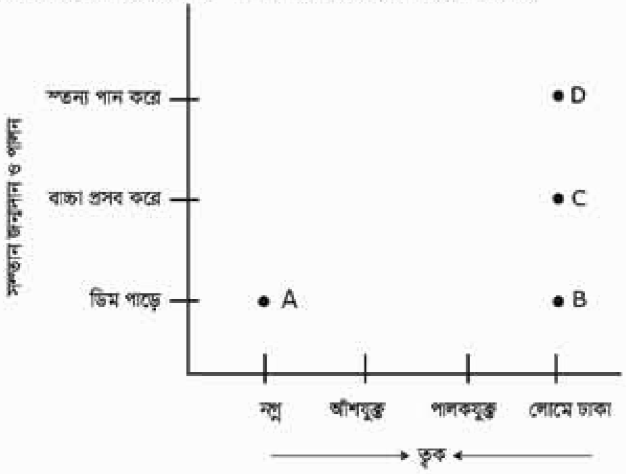

৩. গ্রাফের A অবস্থানে কোন প্রাণীটি থাকবে?

(ক) মাছ (গ) সাপ

(খ) ব্যাঙ (ঘ) কচ্ছপ

৪. প্লাটিপাসের অবস্থান গ্রাফের কোথায়?
(ক) A ও B (গ) B ও D
(খ) B ও C (ঘ) C ও D

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিসেস সান্তা সন্তানধারণে অক্ষম হওয়ার বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে গেলেন। ডাক্তার এ সমস্যা সমাধানের জন্য একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তার ডিম্বাণুর পরিস্ফুটন ঘটান। অন্যদিকে মিসেস সান্তার চাচাত বোন মিতা পুত্রসন্তানের আশায় এখন পাঁচ কন্যাসন্তানের জননী।

(ক) নিউক্লিওপ্রোটিন কাকে বলে?
(খ) জীবন্ত জীবাশ্ম বলতে কী বুঝায়?
(গ) মিসেস সান্তার ক্ষেত্রে ডাক্তার কোন বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করলেন? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) মিতার একই রকম সন্তান হওয়ার বিষয়টিকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করো।

২. আমান বিবর্তন অধ্যায়টি ভালো বুঝতে না পেরে তার বাবার কাছে যায়। বাবা সংক্ষেপে বিবর্তন সম্পর্কিত প্রমাণটি বুঝিয়ে দিলেন। এরপর আমান তার বাবার কাছে বিবর্তনের মতবাদ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি ল্যামার্কের মতবাদ ও ডারউইনের মতবাদ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

(ক) সেক্স ক্রোমোজোম কাকে বলে?
(খ) বিবর্তন বলতে কী বুঝায়?
(গ) বাবা কীভাবে বিবর্তন সম্পর্কিত উল্লিখিত প্রমাণটি ব্যাখ্যা করলেন।
(ঘ) বাবার বুঝিয়ে দেওয়া মতবাদ দুটির মধ্যে কোনটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য? তুলনামূলক আলোচনা করে মতামত দাও।

পঞ্চম অধ্যায়

দেখতে হলে আলো চাই

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আলোর প্রয়োজনের কথা বলে শেষ করা যাবে না। আমরা চোখ বন্ধ করলে কিছুই দেখি না। আবার পুরোপুরি অন্ধকারে চোখ খোলা রাখলেও কিছু দেখতে পাই না। আলো হচ্ছে সেই নিমিত্ত, যার সাহায্যে আমরা দেখতে পাই। তোমরা আগের শ্রেণিগুলোতে আলোর বিভিন্ন ধর্মের সাথে পরিচিত হয়েছ। এই অধ্যায়ে আয়না বা দর্পণের ব্যবহার ছাড়াও আলোর প্রতিসরণ সম্পর্কে আরও কিছু জানবে। এছাড়া চোখের ক্রিয়া, স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু, লেন্সের ক্ষমতা, চোখের ত্রুটি এবং লেন্স ব্যবহার করে চোখ ভালো রাখার উপায় জানতে পারবে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- দর্পণের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আলোর প্রতিসরণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দৃষ্টি কার্যক্রমে চোখের ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- স্পষ্ট দর্শনের নিকটতম বিন্দু ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেন্সের ক্ষমতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লেন্স ব্যবহার করে চোখের ত্রুটি সংশোধনের উপায় বর্ণনা করতে পারব।
- চোখ ভালো রাখার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- চোখের ত্রুটি সৃষ্টির কারণ অনুসন্ধান করতে পারব।
- চোখের প্রতি যত্ন নেব এবং অন্যদের সচেতন করব।

৫.১ আয়না বা দর্পণের ব্যবহার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আয়না বা দর্পণের নানা রকম ব্যবহার আছে। বর্তমান পাঠে আমরা আয়না বা দর্পণের দুটি বিশেষ ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করব। এ দুটি হলো নিরাপদ ড্রাইভিং এবং পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক বা পার্বত্য সড়কের বিপজ্জনক বাঁকে আয়না বা দর্পণের ব্যবহার।

নিরাপদ ড্রাইভিং

গাড়ি নিরাপদে ড্রাইভিং করার অন্যতম শর্ত হলো নিজ গাড়ির আশপাশে কী ঘটছে (চিত্র ৫.০১) সবসময় তা খেয়াল রাখা। সাধারণত গাড়ির ড্রাইভারের সিটের দরজার সামনের দিকে দুই পাশে সাইড ভিউ মিরর নামে দুটি আয়না বা দর্পণ থাকে। এছাড়া গাড়ির ভিতরে সামনের দিকে মাঝখানেও রিয়ার ভিউ মিরর নামে আরেকটি আয়না বা দর্পণ থাকে। এগুলো গাড়ির দুপাশে এবং পিছনের দিকে দেখার কাজে সাহায্য করে। ফলে ড্রাইভার শুধু মাথা ঘুরিয়েই চারপাশ দেখতে পারে— তার শরীরে কোনো রকম মোচড় দিতে হয় না বা নাড়াতে হয় না।

চিত্র ৫.০১: অনিরাপদ ড্রাইভিং

গাড়ির এই আয়নাগুলো ব্যবহার করে ড্রাইভার তার হাত সর্বদা স্টিয়ারিং হুইলে রেখে সামনে বা পিছনের দিকে নজর রাখতে পারে। গাড়ি চালানো শুরু করার আগে ড্রাইভার আয়না বা দর্পণগুলোকে (চিত্র ৫.০২)

চিত্র ৫.০২: গাড়ির তিনটি আয়না।

যথাযথ অবস্থানে ঘুরিয়ে নেয় যেন ড্রাইভিং সিটে বসেই পিছন এবং দুপাশ সঠিকভাবে দেখা যায়।

এর পাশাপাশি আয়নাগুলো ঠিক করে পরিষ্কার করে নিতে হয় যেন কোনো ময়লা বা ধুলাবালি না থাকে। এতে অন্য গাড়ির প্রতিবিম্বের অবস্থান ঠিকভাবে নাও বোঝা যেতে পারে। গাড়ি কোনো কারণে পিছানোর দরকার হলে প্রথমে তিনটি দর্পণেই চোখ বুলিয়ে নিতে হবে এবং গাড়িটি না থামানো পর্যন্ত সারাক্ষণ তিনটি দর্পণেই চোখ রাখতে হয়। তাছাড়া চলন্ত অবস্থায় গাড়ি লেন পরিবর্তন করার আগে এই তিনটি আয়না বা দর্পণের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, যেন পিছনের গাড়ির অবস্থান বুঝা যায়।

পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

পাহাড়ি রাস্তা সাধারণত আঁকাবাঁকা হয়। অনেক সময় এমনও বাঁক থাকে যে রাস্তাটি প্রায় ৯০° বেঁকে যায়। তখন সামনের রাস্তা দিয়ে কী আসছে বোঝার কোনো উপায় থাকে না— এই কারণে পাহাড়ি রাস্তায় ড্রাইভিং বিপজ্জনক। ড্রাইভিংকে নিরাপদ করার জন্য পাহাড়ি রাস্তায় বিভিন্ন বাঁকে বড় সাইজের গোলীয় দর্পণ স্ট্যান্ডে দাঁড় করে রাখা হয় (চিত্র ৫.০৩)। ফলে এর কাছাকাছি এসে দর্পণে তাকালে বাঁকের অন্য পাশ থেকে কোনো গাড়ি আসছে কি না সেটি দেখা যায় এবং ড্রাইভার সাবধান হয়ে গাড়ির গতি নিয়ন্ত্রণ করে নিরাপদে গাড়ি চালাতে পারে।

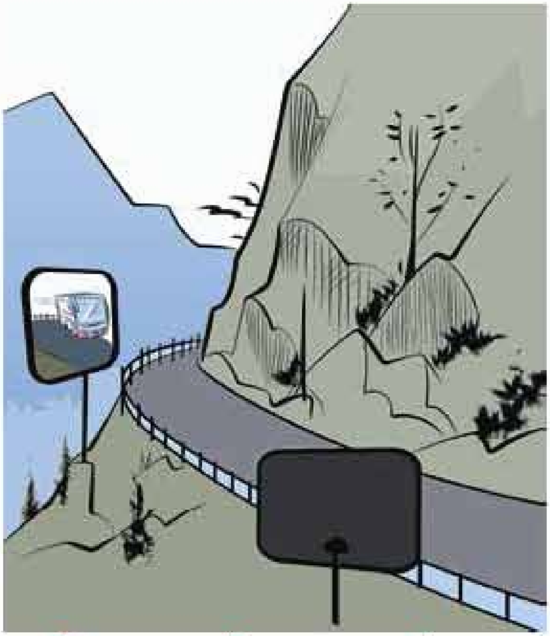

চিত্র ৫.০৩: পাহাড়ি রাস্তার অদৃশ্য বাঁক

একক কাজ

কাজ: একটা গাড়ির এই তিনটি আয়না পরীক্ষা করে দেখো। দেখবে এগুলো তোমাদের পরিচিত সমতল আয়না নয়। এর পৃষ্ঠদেশ বাঁকা বা এগুলো গোলীয় আয়না। এ কারণে এই আয়নার সবকিছু একটু ছোট দেখায় সত্যি কিন্তু এই আয়নায় অনেক বেশি এলাকা দেখা সম্ভব হয়।

৫.২ আলোর প্রতিসরণ

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে আলোর প্রতিসরণ এবং তার বাস্তব প্রয়োগ দেখেছ। আমরা জানি, আলোক রশ্মি কোনো স্বচ্ছ ও সমসত্ব মাধ্যমে সবসময় সরলরেখায় চলে। আলো যখন একটি স্বচ্ছ মাধ্যম থেকে অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমে লম্বভাবে আপতিত না হয়ে বাঁকাভাবে আপতিত হয়, তখন মাধ্যম দুটির বিভেদতলে এর গতিপথের দিক পাল্টে যায়। আলোক রশ্মির দিক পরিবর্তন করার এই ঘটনাই হলো আলোর প্রতিসরণ।

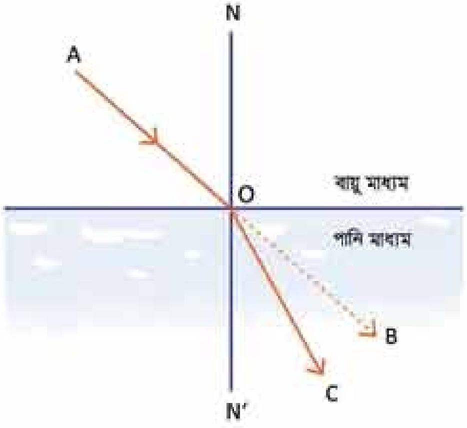

চিত্র ৫.০৪: আলোর প্রতিসরণ

৫.০৪ চিত্রটি লক্ষ কর। এখানে উপরে বাতাস এবং নিচে পানি কল্পনা করা হয়েছে।

আলোকরশ্মি A থেকে শুরু করে O বিন্দুতে পড়েছে অর্থাৎ AO আপতিত রশ্মি এবং O বিন্দু হলো আপতন বিন্দু। O বিন্দুর ভিতর দিয়ে NN' লম্ব আঁকা হয়েছে। প্রথম মাধ্যম বাতাস এবং দ্বিতীয় মাধ্যমটি পানি হওয়ায় এবং পানির ঘনত্ব বাতাস থেকে বেশি হওয়ায় আলোকরশ্মি সোজা OB পথে না গিয়ে ON'- এর দিকে সরে এসে OC বরাবর যাবে। এখানে OC হচ্ছে প্রতিসরিত রশ্মি।

∠AON হলো আপতন কোণ এবং ∠CON' হলো প্রতিসরণ কোণ। এখানে উল্লেখ্য, আলোক রশ্মি যদি AO বরাবর আপতিত না হয়ে NO বরাবর আপতিত হতো তাহলে কিন্তু এটি সোজা ON' বরাবর চলে যেত।

একক কাজ

কাজ: একটি কাপে একটি মুদ্রা রেখে তুমি তোমার মাথাটা এমনভাবে সরিয়ে নাও যেন মুদ্রাটি আর দেখা না যায়। এবারে কাপে পানি ঢালতে থাকো, তুমি এক সময় মুদ্রাটি দেখতে পাবে। শূন্য কাপে আলো সোজাসুজি তোমার চোখে আসতে না পারলেও পানি থাকার কারণে বাঁকা হয়ে সেটি তোমার চোখে পৌঁছাতে পারে।

প্রতিসরণের সূত্র: আলোর প্রতিসরণের সময় এর রশ্মির চলাচলের ধর্মকে দুটি সূত্রে প্রকাশ করা যায়।

১. আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে বিভেদ তলের ওপর আঁকা অভিলম্ব এবং প্রতিসরিত রশ্মি একই সমতলে থাকে।

২. এক জোড়া নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং নির্দিষ্ট রঙের আলোর জন্য আপতন কোণের সাইন ($\sin\theta$) ও প্রতিসরণ কোণের সাইনের ($\sin\theta'$) অনুপাত সর্বদাই ধ্রুব থাকে। অর্থাৎ $\sin\theta/(\sin\theta') = n$

দ্বিতীয় সূত্রে n হিসেবে যে ধ্রুব সংখ্যাটির কথা বলা হয়েছে, সেটি হলো নির্দিষ্ট রঙের জন্য প্রথম মাধ্যমের সাপেক্ষে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক। প্রথম মাধ্যমকে শূন্য ধরে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসরাঙ্ক মাপা হলে সেটাকে বস্তুর প্রতিসরাঙ্ক বলা হয়। পানির প্রতিসরাঙ্ক ১.৩৩, বাতাসের প্রতিসরাঙ্ক ১-এর এত কাছাকাছি যে সেটাকে ১ ধরা হয়ে থাকে। তবে মনে রেখো, আলোর রং ভিন্ন বলে প্রতিসরাঙ্কের মানও একটুখানি ভিন্ন হয়।

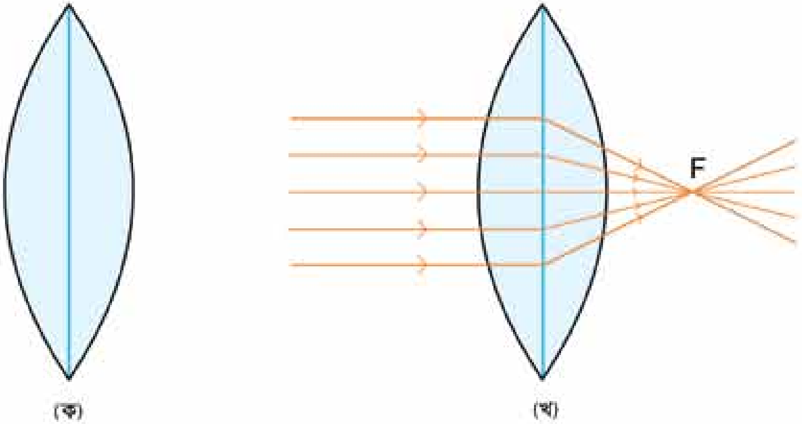

চিত্র ৫.০৫: উত্তল লেন্স এবং তার ফোকাস বিন্দু

৫.৩ লেন্স

দুটি গোলীয় পৃষ্ঠ দিয়ে সীমাবদ্ধ কোনো স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলে। অধিকাংশ লেন্স কাচের তৈরি হয়। তবে কোয়ার্টজ এবং প্লাস্টিক দিয়েও আজকাল লেন্স তৈরি হয় এবং এদের ব্যবহার দিন দিন বাড়ছে।

লেন্স সাধারণত দুই ধরনের। (ক) উত্তল বা অভিসারী লেন্স (Convex lens) এবং (খ) অবতল বা অপসারী লেন্স (Concave lens)। নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে উত্তল বা অভিসারী লেন্সে আলো রশ্মি হচ্ছে

অভিসারী অর্থাৎ এক বিন্দুতে মিলিত হয়। অন্যদিকে অবতল বা অপসারী লেন্সে আলোকরশ্মি অপসারী অর্থাৎ পরস্পর থেকে দূরে সরে যায়।

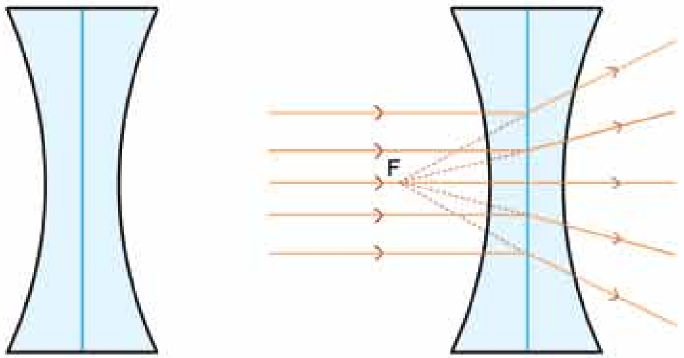

চিত্র ৫.০৬: অবতল লেন্স এবং তার ফোকাস বিন্দু

চিত্রে ৫.০৫ হলো উত্তল লেন্স। এই লেন্সের মাঝখানে মোটা ও প্রান্ত সরু, তাই এটিকে কখনো কখনো স্থূলমধ্য লেন্সও বলা হয়। আলোকরশ্মি উত্তল লেন্সের উত্তল পৃষ্ঠে আপতিত হয়। এই লেন্স সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত বা অভিসারী করে কোনো একটি বিন্দুতে মিলিত করে (চিত্র ৫.০৫)। এই বিন্দুটি হচ্ছে লেন্সের ফোকাস বিন্দু এবং লেন্সের কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব। উত্তল লেন্সে আলো এক বিন্দুতে মিলিত হওয়ার পর সেটি আবার ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে অবতল লেন্সের মাঝখানে সরু ও প্রান্তের দিকটা মোটা (চিত্র ৫.০৬)। এই লেন্সের অবতল পৃষ্ঠে সমান্তরাল আলোক রশ্মি আপতিত হলে আলোকরশ্মি অপসারী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। যদি অপসারিত রশ্মিগুচ্ছ সোজা পিছনের দিকে বাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে কল্পনা করে নিলে সেগুলো একটি বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে বলে মনে হয়। এই বিন্দুটি হচ্ছে অবতল লেন্সের ফোকাস বিন্দু এবং লেন্সের কেন্দ্র থেকে এই বিন্দুর দূরত্ব হচ্ছে ফোকাস দূরত্ব।

সাধারণত লেন্সের পৃষ্ঠগুলো যে গোলকের অংশ, তার কেন্দ্রকে বক্রতার কেন্দ্র বলে এবং লেন্সের দুই পৃষ্ঠের জন্য বক্রতার কেন্দ্র দুটি। বক্রতার কেন্দ্র দুটির মধ্য দিয়ে গমনকারী সরলরেখাই হলো লেন্সের প্রধান অক্ষ। আমরা আগেই বলেছি যে লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রতিসরণের পর প্রধান অক্ষের যে বিন্দুতে মিলিত হয় (উত্তল লেন্স) বা যে বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয় (অবতল লেন্স), সেই বিন্দুকে লেন্সের প্রধান ফোকাস বলে। ৫.০৫ এবং ৫.০৬ চিত্রে F বিন্দু হলো প্রধান ফোকাস। লেন্সের কেন্দ্র থেকে প্রধান ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বই হলো লেন্সের ফোকাস দূরত্ব।

৫.৩.১ লেন্সের ক্ষমতা

আমরা জানি, প্রধান অক্ষের সমান্তরাল এক গুচ্ছ আলোকরশ্মিকে উত্তল লেন্স কেন্দ্রীভূত বা অভিসারী করে এক বিন্দুতে মিলিত করে। অপরদিকে অবতল লেন্স একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মিকে অপসারী করে; ফলে ঐ রশ্মিগুচ্ছ কোনো একটি বিন্দু থেকে অপসারিত হচ্ছে বা ছড়িয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয়। আলোকরশ্মিকে অভিসারী বা অপসারী করার প্রক্রিয়াটি পরিমাপ করার জন্য লেন্সের "ক্ষমতা" সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ১-কে লেন্সের ফোকাস দূরত্ব (মিটারে প্রকাশ করে) দিয়ে ভাগ করা হলে লেন্সের ক্ষমতা বের হয়। অর্থাৎ একটি উত্তল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ২ মিটার হলে তার ক্ষমতা ১/২ = ০.৫। লেন্সের ক্ষমতার প্রচলিত একক হলো ডায়প্টার (diopter)। এর এসআই একক হলো রেডিয়ান/মিটার। লেন্সের ক্ষমতা ধনাত্মক বা ঋণাত্মক দুই-ই হতে পারে। কোনো লেন্সের ক্ষমতা +1D বলতে বোঝায়, লেন্সটি উত্তল এবং এটি প্রধান অক্ষের ১ মিটার দূরে আলোকরশ্মিগুচ্ছকে মিলিত করবে।

একইভাবে লেন্সের ক্ষমতা -2D হলে বুঝতে হবে লেন্সটি অবতল এবং এটি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল একগুচ্ছ আলোকরশ্মিকে এমনভাবে অপসারিত করে যে, এগুলো কোনো লেন্স থেকে ৫০ সেমি দূরের কোনো বিন্দু থেকে অপসৃত হচ্ছে বলে মনে হয়।

৫.৪ চোখের ক্রিয়া

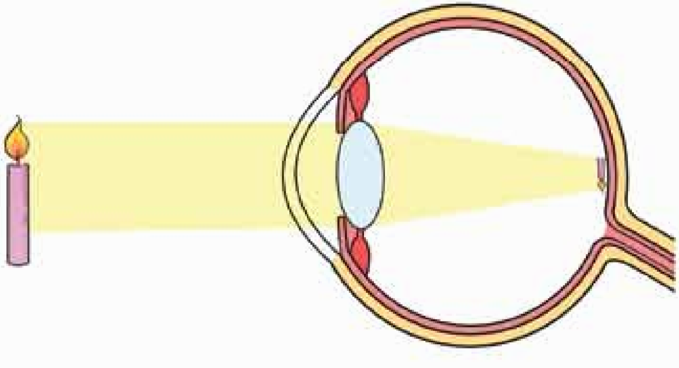

চিত্র ৫.০৭: আমরা কীভাবে দেখি

৫.৪.১ আমরা কীভাবে দেখতে পাই

তোমরা অষ্টম শ্রেণিতে চোখের গঠন সম্পর্কে জেনেছ। বর্তমান পাঠে চোখের ক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা কীভাবে দেখতে পাই (চিত্র ৫.০৭) সেটি আলোচনা করা হবে।

চোখের উপাদানগুলোর মাঝে রয়েছে রেটিনা, চোখের লেন্স, অ্যাকুয়াস হিউমার, ভিট্রিয়াস হিউমার এবং কর্নিয়া। তোমরা লেন্স কীভাবে কাজ করে তার একটি ধারণা পেয়েছ। তাই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ চোখের লেন্সও একটি অভিসারী লেন্সের মতো কাজ করে। আমরা দেখেছি, উত্তল বা অভিসারী লেন্স সবসময় উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। ক্যামেরায় ছবি তোলার জন্য এভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়। যখনই আমাদের সামনে কোনো বস্তু থাকে, তখন ঐ বস্তু থেকে আলোকরশ্মি এই লেন্স দ্বারা প্রতিসারিত হয় এবং রেটিনার ওপর একটি উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করে। রেটিনার ওপর আলো পড়লে স্নায়ুর সাথে সংযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রড এবং কোণ কোষগুলো সেই আলো গ্রহণ করে তাকে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ সিগন্যালে পরিণত করে। স্নায়ু এই বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সিগন্যালকে তাৎক্ষণিকভাবে অপটিক নার্ভ বা অক্ষি স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোণকোষগুলো তীব্র আলোতে সাড়া দেয় এবং রঙের অনুভূতি ও রঙের পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। অন্যদিকে রডকোষগুলো খুব কম আলোতে সংবেদনশীল হয়। এ জন্য জ্যোৎস্নার অল্প আলোতে আমরা "রড" কোষগুলোর কারণে দেখতে পাই কিন্তু কোনো রং বুঝতে পারি না। মস্তিষ্ক রেটিনায় সৃষ্ট উল্টো প্রতিবিম্বকে সোজা করে নেয় বলে আমরা বস্তুটি যে রকম থাকে সেরকমই দেখি।

৫.৪.২ স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব

স্বাভাবিক চোখের খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা সীমাহীন নয়। মানুষ তার চোখের লেন্সে ফোকাস দূরত্ব বাড়িয়ে বা কমিয়ে একটা বস্তুকে সব সময় স্পষ্ট দেখার চেষ্টা করে। কিন্তু লক্ষ্যবস্তু চোখের কাছাকাছি একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব থেকে বেশি কাছে এলে আর স্পষ্ট দেখা যায় না। চোখের সবচেয়ে কাছে যে বিন্দু পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে খালি চোখে স্পষ্ট দেখা যায়, তাকে স্পষ্ট দৃষ্টির নিকট বিন্দু বলে এবং চোখ থেকে ঐ বিন্দুর দূরত্বকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব ধরে নেওয়া হয় । এই দূরত্ব মানুষের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়। একজন শিশুর এই দূরত্ব ৫ সেন্টিমিটারের কাছাকাছি এবং একজন স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের এই দূরত্ব ২৫ সেমি পর্যন্ত হতে পারে। দূর বিন্দু চোখ থেকে অসীম দূরত্বে অবস্থান করে। এ কারণে আমরা বহুদূরের নক্ষত্রও খালি চোখে দেখতে পারি।

৫.৪.৩ চোখের ত্রুটি এবং তার প্রতিকার

তোমাদের কি চোখের সমস্যা সম্পর্কে ধারণা আছে? এ পাঠে আমরা চোখের বিভিন্ন ত্রুটি এবং তাদের প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করব।

আমরা জানি, সুস্থ এবং স্বাভাবিক চোখ "নিকট বিন্দু" (Near point) থেকে শুরু করে অসীম দূরত্বের দূর বিন্দুর মাঝখানে যে স্থানেই কোনো বস্তু থাকুক না কেন সেটা স্পষ্ট দেখতে পারে। এটাই চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি। এই স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত হলেই তাকে চোখের দৃষ্টির ত্রুটি বলা হয়।

২০২৪

চোখের দৃষ্টির অনেক ধরনের ত্রুটি থাকলেও আমরা প্রধান দুটি ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করব। সেই দুটি

হচ্ছে;

(ক) হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia or shortsightedness)

(খ) দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia or farsightedness)

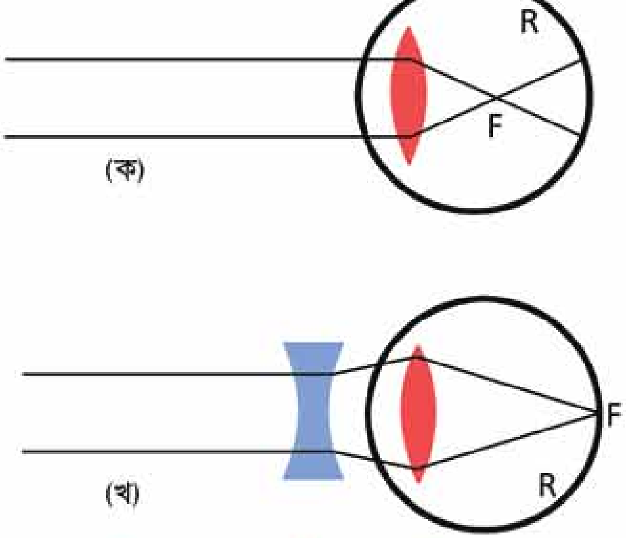

চিত্র ৫.০৮: হ্রস্বদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

হ্রস্বদৃষ্টি বা ক্ষীণদৃষ্টি (Myopia)

যখন চোখ কাছের বস্তু দেখতে পায় কিন্তু দূরের বস্তু দেখতে পায় না, তখন চোখের এই ত্রুটিকে হ্রস্বদৃষ্টি বলে। এরূপ চোখের দূর বিন্দুটি অসীম দূরত্ব অপেক্ষা খানিকটা নিকটে থাকে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব হতে আরও কাছে আনলে অধিকতর স্পষ্ট দেখায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি হয়ে থাকে।

১. চোখের লেন্সের অভিসারী শক্তি বৃদ্ধি পেলে বা ফোকাস দূরত্ব কমে গেলে ও

২. কোনো কারণে অক্ষি-গোলকের ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেলে।

এর ফলে দূরের বস্তু থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার উপরে প্রতিবিম্ব তৈরি না করে একটু সামনে (F) প্রতিবিম্ব তৈরি করে (চিত্র ৫.০৮)। ফলে চোখ বস্তুটি স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য এমন একটি অবতল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে, যার ফোকাস দূরত্ব হ্রস্বদৃষ্টির দীর্ঘতম দূরত্বের সমান। চশমার এই লেন্সের অপসারী ক্রিয়া চোখের উত্তল

লেন্সের অভিসারী ক্রিয়ার বিপরীত কাজেই চোখের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে যাবে বলে প্রতিবিম্বটি আরো পিছনে তৈরি হবে। অর্থাৎ অসীম দূরত্বের বস্তু থেকে আসা সমান্তরাল আলোকরশ্মি চশমার অবতল লেন্স L (চিত্র ৫.০৮) এর মধ্য দিয়ে চোখে পড়ার সময় প্রয়োজনমতো অপসারিত হয়। এই অপসারিত রশ্মিগুলো চোখের লেন্সে প্রতিসারিত হয়ে ঠিক রেটিনা বা অক্ষিপট R-এর ওপর স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

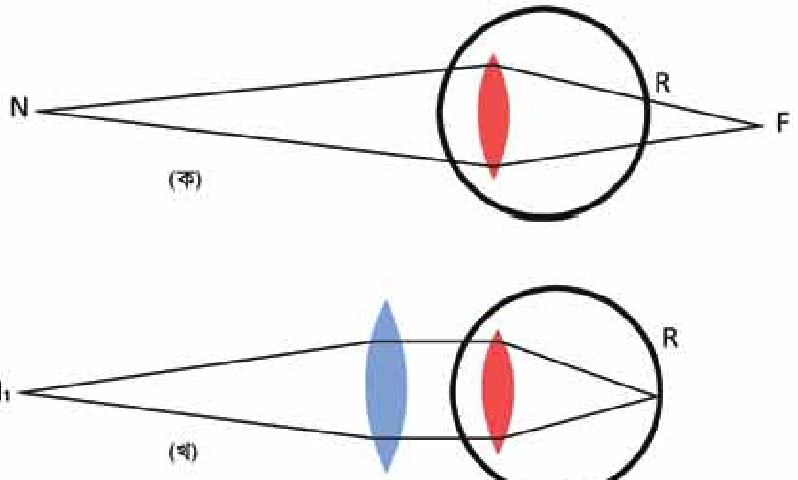

চিত্র ৫.০৯: দীর্ঘদৃষ্টি ও তার প্রতিকার

দীর্ঘদৃষ্টি বা দূরদৃষ্টি (Hypermetropia)

যখন কোনো চোখ দূরের বস্তু দেখে কিন্তু কাছের বস্তু দেখতে পায় না, তখন এই ত্রুটিকে দীর্ঘদৃষ্টি বলে। সাধারণত বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে এই ত্রুটি দেখা যায়। নিম্নলিখিত দুটি কারণে এই ত্রুটি ঘটে।

১. চোখের লেন্সের অভিসারী ক্ষমতা হ্রাস পেলে অথবা চোখের লেন্সের ফোকাস দূরত্ব বেড়ে গেলে।
২. কোনো কারণে অক্ষি-গোলকের ব্যাসার্ধ কমে গেলে।

এর ফলে দূর থেকে আসা আলো সঠিকভাবে চোখের রেটিনাতে প্রতিবিম্ব তৈরি করলেও কাছাকাছি বিন্দু থেকে আসা আলোকরশ্মি চোখের লেন্সের মধ্য দিয়ে প্রতিসরণের পর রেটিনার ঠিক উপরে না হয়ে পিছনে (F) বিন্দুতে মিলিত হয় (চিত্র ৫.০৯)। ফলে চোখ কাছের বস্তু স্পষ্ট দেখতে পায় না।

প্রতিকার : এই ত্রুটি দূর করার জন্য একটি উত্তল লেন্সের চশমা ব্যবহার করতে হবে। ফলে কাছাকাছি বিন্দু (চিত্র ৫.০৯) থেকে আসা আলোকরশ্মি চশমার লেন্সে এবং চোখের লেন্সে পর পর দুইবার প্রতিসারিত হওয়ার কারণে ফোকাস দূরত্ব কমে যাবে এবং প্রয়োজনমতো অভিসারী হয়ে প্রতিবিম্বটি রেটিনা (R)-এর উপরে পড়বে।

৫.৪.৪ চোখ ভালো রাখায় উপায়

আমাদের চোখ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ। এটির যথাযথ যত্ন নেওয়া প্রয়োজন যেন এটিকে ত্রুটিমুক্ত রাখা যায়। বিভিন্ন উপায়ে আমাদের চোখকে ভালো রাখা যায়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি কথা বলা যেতে পারে:

(ক) সঠিক পুষ্টি গ্রহণ চোখের জন্য খুবই দরকারি। ভিটামিন এ, সি ও ই সমৃদ্ধ খাবার; ফ্যাটি এসিড যুক্ত খাবার, জিংকসমৃদ্ধ খাবার, গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও বিভিন্ন ফল চোখের জন্য খুবই ভালো। এ ধরনের খাবার চোখকে রোগমুক্ত রাখতে সহায়তা করে। গাজর, মাছ, ব্রকলি, গম, মিষ্টি কুমড়া, হলুদ (যেমন, পাকা পেঁপে, আম) ফল ইত্যাদি বেশি করে খেতে হবে।

(খ) চোখের সঠিক যত্নের জন্য সঠিক জীবনধারণ পদ্ধতি মেনে চলা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারা দিনের পরিশ্রমের পর শরীরের মতো চোখও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চোখকে পুনরায় সতেজ করতে সারা রাত ঘুমানো প্রয়োজন। তাই এই নির্ধারিত সময় ঘুম নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া গবেষণায় দেখা গেছে, ধূমপানও চোখের ক্ষতি করে। তাই ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে। কেউ যদি রোদ থেকে চোখকে রক্ষা করার জন্য সানগ্লাস ব্যবহার করতে চায় তাহলে অবশ্যই অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করতে পারে এমন সানগ্লাস ব্যবহার করতে হবে। তেল দিয়ে রান্না করার সময় কিংবা ঝালাইয়ের কাজ করার সময় যখন উত্তপ্ত কণা ছিটকে আসে, তখন খুব সাবধান থাকতে হবে। তাছাড়া কেমিক্যাল নিয়ে কাজ করার সময় চোখ রক্ষা করার সেফটি গ্লাস পরা বুদ্ধিমানের কাজ।

(গ) আবছা বা অপর্যাপ্ত আলোতে কাজ করলে সবকিছু চোখের খুব কাছে এনে দেখতে হয়, সেটি চোখের জন্য ক্ষতিকর। ঘরের আলো পর্যাপ্ত রাখতে হবে যেন পড়তে অসুবিধা না হয়। চোখকে যখন ক্লান্ত মনে হবে, তখন না পড়ে বিশ্রাম নেওয়া ভাল। আমাদের চোখের স্পষ্ট দর্শনের ন্যূনতম দূরত্ব থেকে কম বা বেশি দূরত্বে রেখে বই পড়লে চোখে চাপ পড়ে। তাই সঠিক দূরত্বে রেখে বই পড়তে হয়। তুমি হয়তো খেয়াল করেছ অনেকক্ষণ ধরে কম্পিউটার ব্যবহার করলে চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গবেষণায় দেখা গেছে, দীর্ঘক্ষণ টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহারে চোখের ক্ষতি হয়। তাই এই ক্ষতি থেকে চোখকে রক্ষা করতে নির্দিষ্ট দূরত্বে থেকে এবং বিরতি দিয়ে টেলিভিশন দেখা বা কম্পিউটার ব্যবহার করা উচিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. স্বাভাবিক বয়স্ক লোকের চোখে স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব কত?

(ক) ৫ সেমি (খ) ১০ সেমি

(গ) ২৫ সেমি (ঘ) ৫০ সেমি

২. উত্তল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো:

(i) এটির ক্ষমতা ধনাত্মক

(ii) লেন্সের মধ্যভাগ সরু ও প্রান্ত মোটা

(iii) সমান্তরাল রশ্মিগুলোকে একটি বিন্দুতে মিলিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

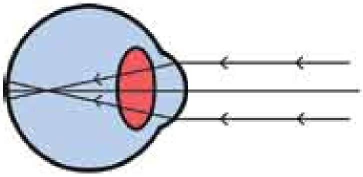

৩. উদ্দীপকে উল্লিখিত চোখের ত্রুটিকে কী বলা হয়?

(ক) হ্রস্বদৃষ্টি (খ) দীর্ঘদৃষ্টি

(গ) বার্ধক্য দৃষ্টি (ঘ) বিষম দৃষ্টি

৪. উল্লিখিত ত্রুটি দূর করতে হলে কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করতে হবে?

(ক) উত্তল লেন্স (খ) অবতল লেন্স

(গ) উত্তলাবতল লেন্স (ঘ) সমতলাবতল লেন্স

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নৈঋতি দূর থেকে ব্ল্যাকবোর্ডে শিক্ষকের লেখা স্পষ্ট দেখতে পায় না। অন্যদিকে নৈঋতির বাবার কাছের জিনিস দেখতে সমস্যা হয়। পরবর্তীকালে নৈঋতি ও তার বাবা ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার নৈঋতির জন্য এক ধরনের লেন্স এবং তার বাবার জন্য ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শ দিলেন।

(ক) আলোর প্রতিসরণ কাকে বলে?

(খ) স্পষ্ট দৃষ্টির ন্যূনতম দূরত্ব বলতে কী বুঝায়?

(গ) সেঁজুতি চোখের কোন ধরনের ত্রুটিতে আক্রান্ত? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) সেঁজুতির বাবার জন্য ডাক্তারের ভিন্ন ধরনের লেন্স ব্যবহারের পরামর্শের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করো।

২.পরবর্তী চিত্র-১ ও চিত্র-২ দেখে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চিত্র-১

চিত্র-২

(ক) লেন্স কাকে বলে?

(খ) লেন্সের ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়?

(গ) ১ নং চিত্রের X দর্পণটি ব্যবহারের কারণ কী? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) ২ নং চিত্রের গাড়িটিতে P, Q, R দর্পণের ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

পলিমার

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা কাজে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে বিভিন্ন রকমের পলিমার। এদের কোনোটি প্রাকৃতিক আবার কোনোটি কৃত্রিম। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি মুহূর্তও কল্পনা করতে পারব না, যখন আমরা কোনো না কোনো পলিমার ব্যবহার করছি না। কিছু কিছু পলিমার আছে, যেগুলো পরিবেশবান্ধব, আবার কোনো কোনোটি পরিবেশের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এই অধ্যায়ে আমরা পলিমারকে চিনতে শিখব, কোনটি ব্যবহার করব কোনটি থেকে দূরে থাকব সেটিও আমরা বুঝতে শিখব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম পলিমার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পলিমারকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম তন্তু ও বস্ত্রের উৎস, বৈশিষ্ট্য এবং ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- তন্তু হতে সুতা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রাবার ও প্লাস্টিকের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা সৃষ্টিতে রাবার ও প্লাস্টিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারব।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় রাবার ও প্লাস্টিকের ব্যবহার ও সংরক্ষণে সচেতন হব।

৬.১ পলিমার (Polymer)

মেলামাইনের থালা-বাসন, বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড, কার্পেট, পিভিসি পাইপ, পলিথিনের ব্যাগ, পাটের ব্যাগ, সিল্কের কাপড়, উলের কাপড়, সুতি কাপড়, নাইলনের সুতা, রাবার— এসব জিনিস আমাদের খুবই পরিচিত, আমরা সবসময়েই এগুলো ব্যবহার করছি। এগুলো সবই পলিমার। পলিমার (Polymer) শব্দটি এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ পলি (Poly) ও মেরোস (Meros) থেকে। পলি শব্দের অর্থ হলো অনেক (Many) এবং মেরোস শব্দের অর্থ অংশ (Part)। অর্থাৎ অনেকগুলো একই রকম ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে যে একটি বড় জিনিস পাওয়া যায়, সেটি হচ্ছে পলিমার। তোমরা একটা লোহার শিকলের কথা চিন্তা করতে পার। লোহার ছোট ছোট অংশ জোড়া দিয়ে একটি বড় শিকল তৈরি হয়। অর্থাৎ বড় শিকলটি হলো এখানে পলিমার। রসায়ন বিজ্ঞানের ভাষায়, একই ধরনের অনেকগুলো ছোট অণু পর পর যুক্ত হয়ে পলিমার তৈরি করে। যে ছোট অণু থেকে পলিমার তৈরি হয়, তাদেরকে বলে মনোমার (Monomer)।

আমরা যে পলিথিনের ব্যাগ ব্যবহার করি, তা হলো "ইথিলিন" নামের মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। একইভাবে আমরা যে পিভিসি পাইপ (PVC) ব্যবহার করি, তা হলো ভিনাইল ক্লোরাইড নামের মনোমার থেকে তৈরি পলিমার। তবে সব সময় একটি মনোমার থেকেই পলিমার তৈরি হবে এমন কোনো কথা নেই, একের অধিক মনোমার থেকেও পলিমার তৈরি হতে পারে। যেমন: বৈদ্যুতিক সুইচ বোর্ড বা বৈদ্যুতিক সুইচ হলো বাকেলাইট নামের একটি পলিমার, যা তৈরি হয় ফেনল ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। আবার মেলামাইনের থালা-বাসন হলো মেলামাইন রেজিন নামের পলিমার, যা তৈরি হয় মেলামাইন ও ফরমালডিহাইড নামের দুটি মনোমার থেকে। শুরুতে আমরা পলিমারের যে উদাহরণগুলো দেখেছি, তাদের মধ্যে কিছু কিছু প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। এদেরকে আমরা বলি প্রাকৃতিক পলিমার।

এখন তোমরা নিজেরাই বল শুরুতে দেওয়া উদাহরণগুলোর মধ্যে কোনগুলো প্রাকৃতিক পলিমার?

পাট, সিল্ক, সুতি কাপড়, রাবার—এগুলো প্রাকৃতিক পলিমার। অন্যদিকে মেলামাইন, রেজিন, বাকেলাইট, পিভিসি, পলিথিন—এগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, শিল্প-কারখানায় কৃত্রিমভাবে তৈরি করতে হয়। তাই এরা হলো কৃত্রিম পলিমার।

৬.১.১ পলিমারকরণ প্রক্রিয়া

মনোমার থেকে পলিমার তৈরি হয় নির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মনোমার সংযুক্ত করে পলিমার তৈরি হয়, তাকেই বলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়া। সাধারণত পলিমারকরণে উচ্চ চাপ

২০২৩

এবং তাপের প্রয়োজন হয়। যদি দুটি মনোমার একসাথে যুক্ত হয় তাহলে উৎপন্ন পদার্থটি কেমন হবে? বুঝতেই পারছ তাহলে উৎপন্ন পদার্থটিতে দুটির বেশি মনোমার থাকতে পারবে না। আমরা এটিকে এভাবে লিখতে পারি:

১টি মনোমার + ১টি মনোমার → মনোমার-মনোমার

কিংবা এটাকে আমরা অন্যভাবেও লিখতে পারি $(\text{মনোমার})_2$

তিনটি মনোমার হলে উৎপন্ন পদার্থটিতে তিনটি মনোমার থাকবে অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি:

১টি মনোমার + ১টি মনোমার + ১টি মনোমার → মনোমার - মনোমার - মনোমার বা $(\text{মনোমার})_3$

আমরা যদি n সংখ্যক মনোমার নিয়ে একটি পলিমার বানাতে চাই, তাহলে পলিমারকরণ প্রক্রিয়াটি নিম্নলিখিত উপায়ে দেখানো যায়:

মনোমার + মনোমার + . . . মনোমার → $(\text{মনোমার})_n$
কিংবা n মনোমার → $(\text{মনোমার})_n$

আমরা পলিথিনের কথা বলেছি, তোমরা কি জান কিভাবে পলিথিন তৈরি হয়?
ইথিলিন গ্যাসকে ১০০০-১২০০ বায়ুমণ্ডলীয় চাপে ২০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে পলিথিন পাওয়া যায়। তবে এক্ষেত্রে পলিমারকরণ দ্রুত করার জন্য প্রভাবক হিসেবে অক্সিজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

$$n\ (\text{ইথিলিন}) \xrightarrow[(O_2\ \text{প্রভাবক})]{(\text{উচ্চতাপ ও চাপ})} \text{পলিথিন}$$

কিংবা,

$$n\ (CH_2 = CH_2) \xrightarrow[(O_2\ \text{প্রভাবক})]{(\text{উচ্চতাপ ও চাপ})} (-\ CH_2 - CH_2-)_n$$

তবে উচ্চ চাপ পদ্ধতি সহজসাধ্য না হওয়ায় বর্তমানে পদ্ধতিটি তেমন জনপ্রিয় নয়। এখন টাইটেনিয়াম ট্রাইক্লোরাইড ($TiCl_3$) নামক প্রভাবক ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলীয় চাপেই পলিথিন তৈরি হয়।

৬.২ তন্তু বা সুতা

তোমরা জান যে আমাদের পাঁচটি মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো বস্ত্র বা কাপড়। এই বস্ত্র আমাদেরকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করে এবং আমরা বস্ত্র দিয়ে সুন্দর পোশাক তৈরি করি। বস্ত্র বা কাপড়-চোপড় আধুনিক সভ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তোমরা কি জান, বস্ত্র বা কাপড় কীভাবে তৈরি

হয়? সব বস্ত্রই তৈরি হয় সুতা থেকে। আবার সুতা তৈরি হয় তন্তু থেকে। তন্তু ক্ষুদ্র আঁশ দিয়ে তৈরি। তাই তন্তু বলতে আমরা আঁশজাতীয় পদার্থকেই বুঝি, তবে বস্ত্রশিল্পে তন্তু বলতে বুনন এবং বয়নের কাজে ব্যবহৃত আঁশসমূহকেই বুঝায়। তন্তু দিয়ে সুতা আর কাপড় ছাড়াও কার্পেট, ফিল্টার, তড়িৎ নিরোধক দ্রব্য ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পদার্থ তৈরি করা হয়।

আমাদের অতিপ্রয়োজনীয় তন্তু উৎস অনুযায়ী দুই রকম হয়। সুতি কাপড় তৈরির জন্য তুলা (Cotton), পাট, লিনেন, রেশম, পশম, উল, সিল্ক, অ্যাসবেস্টস, ধাতব তন্তু ইত্যাদি যেগুলো প্রকৃতিতে পাওয়া যায়, সেগুলোকে আমরা প্রাকৃতিক তন্তু বলি। অন্যদিকে পলিস্টার, রেয়ন, ডেক্রন, নাইলন ইত্যাদি যেগুলো বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা হয়, সেগুলো হলো কৃত্রিম তন্তু।

প্রাকৃতিক তন্তুগুলোর মধ্যে আবার তুলা, পাট ইত্যাদি পাওয়া যায় উদ্ভিদ থেকে। তাই এদেরকে উদ্ভিদ তন্তু বলে। অন্যদিকে রেশম, পশম এগুলো পাওয়া যায় প্রাণী থেকে। তাই এদেরকে প্রাণিজ তন্তু বলে। আবার ধাতব তন্তু পাওয়া যায় প্রাকৃতিক খনিতে। তাই এদেরকে খনিজ তন্তু বলে।

অন্যদিকে কৃত্রিম তন্তু আবার দুরকমের হয়। সেলুলোজিক তন্তু এবং নন সেলুলোজিক তন্তু। তোমরা জান যে সেলুলোজ হলো একধরনের সূক্ষ্ম আঁশযুক্ত পদার্থ, যা দিয়ে উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষ তৈরি হয়। রেয়ন, এসিটেট রেয়ন, ভিসকোস রেয়ন, কিউপ্রা অ্যামোনিয়াম—রেয়ন, এগুলো সেলুলোজকে নানাভাবে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি হয় বলে এদেরকে সেলুলোজিক তন্তু বলে।

যেসব কৃত্রিম তন্তু সেলুলোজ থেকে তৈরি না করে অন্য পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে তৈরি করা হয়, তারাই হলো নন-সেলুলোজিক তন্তু। নাইলন, পলিস্টার, পলি প্রোপিলিন, ডেক্রন—এগুলো হলো নন সেলুলোজিক কৃত্রিম তন্তু।

৬.২.১ তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

একটি পোশাক আরামদায়ক কি না তা নির্ভর করে এটি কী ধরনের কাপড় দিয়ে তৈরি তার ওপর। আবার কাপড় তৈরি হয় সুতা থেকে, যা আসে তন্তু থেকে। কাজেই তন্তুর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাহলে এখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম তন্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নেওয়া যাক।

তুলা

গরমের দিনে আমরা সুতির পোশাক পরতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি কেন? কারণ সুতির তাপ পরিবহন এবং পরিচলন ক্ষমতা বেশি। তুলার আঁশ থেকে সুতা তৈরি হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিজ্জ তন্তুর মধ্যে প্রধান হলো সুতা। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে (চিত্র ৬.০১) সুতির তন্তুকে অনেকটা নলের মতো দেখায়। নলের মধ্যে যে সরু পদার্থটি থাকে তা প্রথম অবস্থায় 'লুমেন' (Lumen) নামক পদার্থে পূর্ণ থাকে। পরে আঁশগুলো ছাড়িয়ে নেওয়ার পর রোদের প্রভাবে শুকিয়ে যায় এবং নলাকৃতি তন্তুটি ধীরে ধীরে চ্যাপ্টা হয়ে ক্রমে

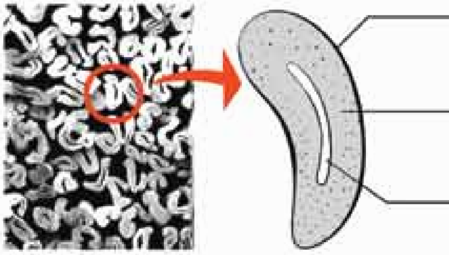

চিত্র ৬.০১: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে সুতিতন্তু

একটি মোচড়ানো ফিতার মতো রূপ ধারণ করে। এই ফিতার মতো সুতির আঁশে ১০০ থেকে ২৫০টি পর্যন্ত পাক বা মোচড় থাকে।

বস্ত্র বা কাপড় তৈরির সময় এই মোচড়ানো অংশে একে অপরের সাথে সুন্দরভাবে মিশে যায় বলে সুতি বস্ত্র টেকসই হয়। আপাতদৃষ্টিতে সুতি তেমন উজ্জ্বল নয়। তবে ময়েশ্চারাইজেশনের (moisturization) মাধ্যমে একে উজ্জ্বল ও চকচকে করে তোলা যায়। সুতি তন্তুকে রং করা হলে সেটি পাকা রং হয় এবং তাপ ও ধোয়ার ফলে রংয়ের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। অজৈব এসিডের সংস্পর্শে সুতি তন্তু নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু অন্যান্য এসিডের সংস্পর্শে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। সুতির বস্ত্র ব্যবহারের তেমন বিশেষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন হয় না বলে এর অনেক ধরনের ব্যবহার রয়েছে। সুতি বস্ত্রের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এটি সংকুচিত হয়ে যায়।

রেশম (Silk)

আগেকার দিনের রাজা-রানির পোশাক বলতে আমরা সিল্কের বা রেশমি পোশাকই বুঝি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, বিলাসবহুল বস্ত্র তৈরিতে রেশম তন্তু ব্যবহৃত হয়। রেশমের প্রধান গুণ হচ্ছে এর সৌন্দর্য। তিন শতাধিক রঙের রেশম পাওয়া যায়। রেশম বা পলু পোকা নামে এক প্রজাতির পোকার গুটি থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় রেশমের তন্তু আহরণ করা হয়। রেশম মূলত ফাইব্রোয়িন (Fibroin) নামের এক ধরনের প্রোটিন—জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি। প্রাকৃতিক প্রাণিজ তন্তুর মধ্যে রেশম সবচেয়ে শক্ত এবং দীর্ঘ। বিভিন্ন গুণাগুণের জন্য রেশমকে তন্তুর রানি বলা হয়। সূর্যালোকে রেশম দীর্ঘক্ষণ রাখলে এটি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়। রেশম হালকা কিন্তু অনেক বেশি উষ্ণ এবং খুবই অল্প জায়গায় রেশমি বা সিল্কের কাপড় রাখা যায়।

পশম (Wool)

আমরা শীতের হাত থেকে বাঁচার জন্য যে পোশাকের কথা সবার আগে ভাবি, সেটি হচ্ছে পশম বা উলের পোশাক। তাপ কুপরিবাহী বলে পশমি পোশাক শীতবস্ত্র হিসেবে বহুল ব্যবহৃত হয়। নমনীয়তা, স্থিতিস্থাপকতা, কুঞ্চন প্রতিরোধের ক্ষমতা, রং ধারণক্ষমতা—এগুলো হচ্ছে উল বা পশমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এই তন্তুর মাঝে ফাঁকা জায়গা থাকে যেখানে বাতাস আটকে থাকতে পারে। বাতাস তাপ

অপরিবাহী তাই পশম বা উলের কাপড় তাপ কুপরিবাহী। পশমি কাপড় পরে থাকলে শীতের দিনে শরীর থেকে তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না, তাই এটি গায়ে দিলে আমরা গরম অনুভব করি। লঘু এসিড এবং ক্ষারে পশমের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না। তবে মথ পোকা খুব সহজে পশম তন্তু নষ্ট করে। এছাড়া কিছু ছত্রাক পশম তন্তুকে খুব সহজে আক্রান্ত করে নষ্ট করে দিতে পারে।

পশম একটি অতি প্রাচীন তন্তু। বিভিন্ন জাতের ভেড়া বা মেষের লোম থেকে পশম উৎপন্ন হয়। প্রায় ৪০ জাতের মেষ থেকে ২০০ ধরনের পশম তৈরি করা হয়। জীবন্ত মেষ থেকে লোম সরিয়ে যে পশম তৈরি করা হয়, তাকে বলে 'ফ্লিস উল' (Fleece wool)। মৃত বা জবাই করা মেষ থেকে যে পশম তৈরি করা হয়, তাকে বলে 'পুল্ড উল' (Pulled wool)। মানুষের চুল ও নখে যে প্রোটিন থাকে, অর্থাৎ কেরাটিন (Keratin), সেটি দিয়ে পশম তন্তু গঠিত পশমের মধ্যে আলপাকা, মোহেরা, কাশ্মিও, ভিকুনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

নাইলন

কৃত্রিম নন-সেলুলোজিক তন্তুর মাঝে নাইলন সর্বপ্রধান। সাধারণত এডিপিক এসিড এবং হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন নামক রাসায়নিক পদার্থের পলিমারকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইলন তৈরি হয়। নাইলনকে প্রধানত দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়— নাইলন ৬৬ এবং নাইলন ৬।

নাইলন খুব হালকা ও শক্ত। ভিজলে এর স্থিতিস্থাপকতা দ্বিগুণ হয়। এটি আগুনে পোড়ে না, তবে গলে গিয়ে বোরাক্স বিডের Borax Bead এর মতো স্বচ্ছ বিড গঠন করে। কার্পেট, দড়ি, টায়ার, প্যারাসুটের কাপড় ইত্যাদি তৈরি করতে নাইলন ব্যবহৃত হয়।

রেয়ন

কৃত্রিম তন্তুর মধ্যে রেয়ন (চিত্র ৬.০২) হলো প্রধান এবং প্রথম তন্তু। উদ্ভিজ্জ সেলুলোজ ও প্রাণিজ পদার্থ থেকে রেয়ন তৈরি করা হয়। তিন প্রকারের প্রধান রেয়ন হলো (১) ভিসকোস, (২) কিউপ্রামোনিয়াম এবং (৩) অ্যাসিটেট। এগুলো শুধু সুন্দর, উজ্জ্বল, মনোরম, অভিজাত এবং আকর্ষণীয় নয়, এগুলো মোটামুটি টেকসই। লঘু এসিডের সাথে তেমন কোনো বিক্রিয়া করে না কিন্তু ধাতব লবণে রেয়ন সহজে বিক্রিয়া করে। অধিক উত্তাপে রেয়ন গলে যায়। তাই রেয়ন কাপড়ে বেশি গরম ইস্ত্রি ব্যবহার করা যায় না।

অ্যাসিটেট ভিসকোস কিউপ্রামোনিয়াম (আড়াআড়িভাবে)

২০২১

চিত্র ৬.০২: অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে রেয়ন তন্তুর রূপ

৬.২.২ তন্তু থেকে সুতা তৈরি

তন্তু দিয়ে কি সরাসরি কাপড় বানানো যায়? না, যায় না। তন্তু দিয়ে প্রথমে সুতা তৈরি করা হয়, অতঃপর সেই সুতা দিয়ে কাপড় তৈরি হয়। তন্তু থেকে কোন প্রক্রিয়ায় সুতা তৈরি হবে, সেটা নির্ভর করে তন্তুর বৈশিষ্ট্যের ওপর। একেক রকমের তন্তুর জন্য একেক রকম পদ্ধতি ব্যবহার করতে হয়। তাহলে এখন আমরা সুতা তৈরির বিভিন্ন ধাপ সম্পর্কে জেনে নিই।

তন্তু সংগ্রহ

যেকোনো ধরনের সুতা তৈরির প্রধান ধাপ হলো তন্তু সংগ্রহ, তন্তুর উৎস অনুযায়ী সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন: তুলার বেলায় গাছ থেকে কার্পাস ফল সংগ্রহ করে বীজ থেকে তুলা আলাদা করে ফেলা হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম হলো জিনিং। জিনিং প্রক্রিয়ায় পাওয়া তন্তুকে বলে কটন লিন্ট। অনেকগুলো কটন লিন্ট একসাথে বেঁধে গাঁট তৈরি করা হয়। এই গাঁট থেকেই স্পিনিং মিলে সুতা কাটা হয়।

তোমরা বল দেখি, পাট বা পাটজাতীয় (যেমন: শণ, তিসি ইত্যাদি) গাছ থেকে কী একই পদ্ধতিতে তন্তু সংগ্রহ করা যাবে? না, যাবে না। কারণ, এক্ষেত্রে বীজ থেকে তন্তু সংগ্রহ করা হয় না, তন্তু সংগ্রহ করা হয় সরাসরি গাছের বাকল থেকে। এর জন্য গাছ কেটে পাতা ঝরানোর জন্য প্রথমে কয়েক দিন মাঠেই একসাথে জড়ো করে রাখা হয়। এতে সাধারণত ৫-৮ দিন সময় লাগে। এলাকাভেদে জড়ো করে রাখা গাছকে চেল্লা বা পিল বলে। এভাবে জড়ো করে রাখার ফলে উদ্ভিদের পাতায় পচন ধরে, তাই একটু ঝাঁকুনি দিলেই সেগুলো গাছ থেকে আলাদা হয়ে যায়। তবে খেয়াল রাখতে হয় গাছের পাতা যেন পুরোপুরি পচে না যায়। তখন পচা পাতা গাছের গায়ের সাথে লেগে যায়, যা সরানো কষ্টসাধ্য। পাতা ঝরানোর পর গাছগুলো একসাথে আটি বেঁধে ১০-১৫ দিন পানিতে ডুবিয়ে পচানো হয়। পচে গেলে খুব সহজেই গাছ থেকে আঁশ বা তন্তু আলাদা করা যায়। গাছ থেকে আঁশ আলাদা করে পানিতে ধুয়ে সেগুলো রৌদ্রে শুকানো হয়। শুকনো আঁশ একত্রিত করে গাঁট বা বেল বাঁধা হয়। তুলার মতোই এই গাঁট বা বেল সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে নেওয়া হয়।

এবার প্রাণিজ তন্তু কীভাবে সংগ্রহ করা হয়, সেটা দেখা যাক। তোমরা আগেই জেনেছ যে রেশমি সুতা তৈরি হয় রেশম তন্তু থেকে। এক্ষেত্রে সরাসরি সুতা উৎপাদিত হয়, অন্য কোনো প্রক্রিয়ার দরকার হয় না। কৃত্রিম তন্তুর বেলাতেও কিন্তু রেশম তন্তুর মতো সরাসরি সুতা তৈরি হয়। কিন্তু উল বা পশমি সুতার জন্য দরকারি প্রাণিজ তন্তু অর্থাৎ প্রাণিজ পশম, লোম বা চুল। এগুলো সংগ্রহ করা হয় বিভিন্ন প্রাণীর শরীর থেকে কেটে নিয়ে। এভাবে প্রাণীর দেহ থেকে লোম, পশম, চুল কেটে নিলে কি তাদের বড় ধরনের ক্ষতি হয়? আসলে তেমন কোনো ক্ষতি হয় না, পশম বা লোম কেটে নেওয়ার পর কিছু দিনের মধ্যে আবার লোম গজায়, যা বড় হলে আবার কেটে সংগ্রহ করা হয়। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে একই পশুর গা থেকে বারবার পশম সংগ্রহ করা যায়। আমরা আগেই বলেছি, এভাবে সংগ্রহ করা পশম, লোম বা চুলকে ফ্লিস উল বলা হয়। এই ফ্লিস উল বস্তায় করে সুতা কাটার জন্য স্পিনিং মিলে আনা হয়।

সুতা কাটা (Spinning)

সুতা কাটা হয় স্পিনিং মিলে (চিত্র ৬.০৩)। সাধারণত একটি মিল বা কারখানায় এক ধরনের তন্তু থেকে সুতা কাটা হয়। কারণ সুতা কাটার যে বিভিন্ন ধাপ রয়েছে, তা একেক ধরনের তন্তুর জন্য একেক রকম। এজন্য ভিন্ন ভিন্ন তন্তু থেকে তৈরি সুতার কারখানাও আলাদা। তবে তন্তুভেদে সুতা কাটার পদ্ধতিতে ভিন্নতা থাকলেও কিছু কিছু মিলও আছে। এখন আমরা তন্তু থেকে সুতা কাটার পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জেনে নিই।

ব্লেন্ডিং ও মিক্সিং

কারখানায় আনা তন্তুর বেল বা গাঁট ব্লেন্ডিং রুমে নিয়ে প্রথম খুলে ফেলা হয়। এরপর বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে এক সাথে গুচ্ছাকারে থাকা তন্তুকে ভেঙে যথাসম্ভব ছোট ছোট গুচ্ছে পরিণত করা হয়। এ সময় তন্তুর সাথে থাকা ময়লার ছোট ছোট টুকরা, বীজ বা পাতার ভাঙা কোনো অংশ ইত্যাদিও দূর করা হয়। এরপর বিভিন্ন রকম তুলার একটি মিশ্রণ তৈরি করা হয়। এই মিশ্রণ তৈরি করা হয় কেন? তার কারণ হলো, গুণে এবং মানে ঠিক একই রকম তুলা সব সময় পাওয়া সম্ভব হয় না। বিভিন্ন রকম তুলার মিশ্রণ না করলে একেক সময় একেক রকম সুতা তৈরি হবে, কখনো ভালো, কখনো মন্দ অর্থাৎ সুতার মান এক হবে না। এছাড়া বিভিন্ন রকম তুলা মিশিয়ে সুতা তৈরি করলে উৎপাদন খরচও কম হয়। এটি বাংলাদেশের জন্য বেশি প্রযোজ্য। কারণ এখানে বাণিজ্যিকভাবে তুলার উৎপাদন হয় না বললেই চলে। বেশির ভাগ তুলা বিভিন্ন দেশ থেকে আমদানি করতে হয়। একেক দেশের তুলার মানও একেক রকম হয়। একই রকম তুলার যোগান পাওয়া বাস্তবে প্রায় অসম্ভব। এজন্য বিভিন্ন রকম তুলা সংগ্রহ করে সেগুলোর মিশ্রণ তৈরি করা হয়। বেল বা গাঁট থেকে তুলার এই মিশ্রণ তৈরিই হলো ব্লেন্ডিং এবং মিক্সিং। তবে পাট তন্তুর বেলায় এই প্রক্রিয়াকে ব্যাচিং (Batching) বলে।

কার্ডিং ও কম্বিং (Carding & Combing)

সুতা কাটার দ্বিতীয় ধাপ হলো কার্ডিং ও কম্বিং। তুলা, লিনেন, পশম—এসব তন্তুর বেলায় এই ধাপটি প্রয়োগ করা হয়। তন্তুর বৈশিষ্ট্য ও দৈর্ঘ্য অনুযায়ী কার্ডিং এবং কম্বিংয়ের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্র ঠিক করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যবহার অনুপযোগী অতি ছোট তন্তু বাদ দেওয়া হয় এবং ধুলাবালি বা ময়লার কণা থাকলে সেগুলোও দূর করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু কার্ডিং করলেই চলে। তবে মিহি মসৃণ ও সরু সুতা তৈরি করতে হলে কম্বিং দরকার হয়। লিনেন তন্তুর জন্য বিশেষ

চিত্র ৬.০৩: স্পিনিং মিলে সুতা তৈরি

ধরনের কম্বিং করা হয়, যা হেলকিং নামে পরিচিত। হেলকিং করলে সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং মিহি হয়।

কার্ডিং ও কম্বিং করে প্রাপ্ত তন্তু পাতলা আস্তরের মতো হয় এবং এটিকে স্লাইভার (Sliver) বলে। এ স্লাইভার পাকালেই সুতা তৈরি হয়। পাকানোই হলো মূলত স্পিনিং। এ পর্যায়ে স্লাইভারকে টেনে ক্রমশ অধিকতর সরু করা হয়। একসময় স্লাইভারের শেষ প্রান্তে মাত্র কয়েক গোছা তন্তু বিদ্যমান থাকে। এভাবে পরিবর্তিত স্লাইভারকে মোচড়ানো হয় বা পাক দেওয়া হয়। স্লাইভারকে টেনে সরু করার প্রক্রিয়া হলো রোডিং আর টুইস্টিং (Twisting)। স্লাইভারকে পাক দেওয়া বা মোচড় দেওয়ার ফলে তন্তুগুলো একে অন্যের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে লেগে যায় এবং সুতায় পরিণত হয়। পাকানো কিংবা মোচড় কম-বেশি করে সুতা শক্ত বা নরম করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই মোচড় বেশি দিলে সুতা বেশি শক্ত হয়, তবে মোচড় অতিরিক্ত হলে সুতা ছিঁড়ে যেতে পারে। পাকানো বা মোচড়ের পরিমাণ নির্ভর করে মূল তন্তুর বৈশিষ্ট্যের উপর। সাধারণত লম্বা তন্তুর বেলায় (যেমন: পাট বা লিনেন) তুলনামূলকভাবে বেশি মোচড় দিতে হয়। টুইস্ট কাউন্টার (Twist Counter) নামের একধরনের যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজ করা হয়।

রেশম তন্তু থেকে রেশম সুতা তৈরি

রেশম পোকা থেকে তৈরি হয় একধরনের গুটি। একে কোকুন (Cocoon) বলে। পরিণত কোকুন বা গুটি সাবান পানিতে লোহার কড়াইয়ে সেদ্ধ করা হয়। এতে কোকুনের ভেতরকার রেশম পোকা মরে যায় এবং গুটি কেটে বের হয়ে রেশমের গুটি নষ্ট করতে পারে না। সিদ্ধ করার কারণে কোকুন নরম হয়ে যায় এবং ওপর থেকে খোসা খুব সহজেই আলাদা হয়ে যায়। খোসা উঠে গেলে রেশমি তন্তুর প্রান্ত বা নাল পাওয়া যায়। এই নাল ধরে আস্তে আস্তে টানলে লম্বা সুতা বের হয়ে আসে (চিত্র ৬.০৪)। চিকন বা মিহি সুতার জন্য ৫-৭টি কোকুনের নাল আর মোটা সুতার জন্য ১৫-২০টি কোকুনের নাল একত্রে করে টানা হয়। এ কাজে চরকা ব্যবহার করা হয়। ছবিতে চরকার সাহায্যে কোকুন থেকে সুতা তৈরি দেখানো হয়েছে। নালগুলো একত্রিত করলে এদের গায়ে লেগে থাকা আঠার কারণে একটি আরেকটির সাথে লেগে গিয়ে সুতার গোছা তৈরি হয়।

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

কৃত্রিম তন্তু থেকে সুতা তৈরির পদ্ধতি প্রায় সব তন্তুর ক্ষেত্রে একই রকম। একের অধিক ক্ষুদ্র আঁশ ও উপযুক্ত দ্রাবকের সাহায্যে ঘন ও আঠালো দ্রবণ তৈরি করা হয়। এই দ্রবণ হলো স্পিনিং দ্রবণ। এই স্পিনিং দ্রবণকে স্পিনারেট (চিত্রে) নামক বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে উচ্চ চাপে প্রবাহিত করা হয়। দ্রবণকে জমাট বাঁধানোর জন্য এর সাথে প্রবাহপথে উপযুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এতে স্পিনারেট থেকে সুতার দীর্ঘ নাল বের হয়ে আসে, যা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য। এই সুতা কাপড় তৈরি বা বয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়।

২০২৫

চিত্র ৬.০৪: রেশম তন্তু থেকে সুতা তৈরি

বিভিন্ন ধরনের সুতার বৈশিষ্ট্য

সব ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে সুতার বৈশিষ্ট্য তার তন্তুর বৈশিষ্ট্যের মতো। তোমরা যেহেতু তন্তুর বৈশিষ্ট্য জেনেছ, তাই নিশ্চয়ই সুতার বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সেটি বুঝতে পারছ।

অনুসন্ধান

কাজ: তাপ প্রয়োগ করে বিভিন্ন প্রকার সুতার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: সিল্ক, উল, সুতি কাপড়, পলিস্টার কাপড়, নাইলন ইত্যাদি কাপড় বা সুতা, একটি মোমবাতি ও দিয়াশলাই।

পদ্ধতি: দিয়াশলাই দিয়ে মোমবাতি জ্বালাও। এবার একে একে কাপড় বা সুতা দিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে দেখ কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে। সুতি কাপড়ের বেলায় কী ঘটল? কাপড় খুব দ্রুত পুড়ে গেল। কোনো গন্ধ পাওয়া গেল কি? হ্যাঁ, কাগজ পোড়ালে যে রকম গন্ধ পাওয়া যায়, অনেকটা সে রকম গন্ধ পাওয়া গেল। কারণ হলো, কাগজে যেমন সেলুলোজ থাকে, তুলা দিয়ে তৈরি সুতি কাপড়েও তা থাকে। আর সে কারণেই একই রকম গন্ধ পাওয়া যায়। নাইলন পুড়িয়ে কী দেখলে? সুতি

কাপড়ের মতো এটিও কি দ্রুত পুড়ে গেল? না, অতটা দ্রুত পুড়ল না, ধীরে ধীরে পুড়ল। পোড়া শেষে একটি গুটির মতো তৈরি হলো, যা সুতি কাপড়ের বেলায় হয়নি। আবার কাগজ পোড়ানোর মতো গন্ধও পাওয়া গেল না, কারণ নাইলন সেলুলোজ থেকে তৈরি হয় না। এভাবে তোমরা সবগুলো কাপড় ও সুতার বৈশিষ্ট্য টেবিল করে খাতায় লিপিবদ্ধ করো।

৬.৩ রাবার ও প্লাস্টিক

৬.৩.১ রাবার

তোমরা পেনসিলের লেখা মোছার জন্য যে ইরেজার ব্যবহার কর, সেটি কী ধরনের বস্তু জান? এটি হলো রাবার। সাইকেল, রিক্সা বা অন্যান্য গাড়ির টায়ার, টিউব, জন্মদিনে ব্যবহৃত বেলুন— এসবই রাবারের তৈরি। পানির পাইপ, সার্জিক্যাল মোজা, কনভেয়ার বেল্ট, রাবার ব্যান্ড, বাচ্চাদের দুধ খাওয়ানোর নিপল— এগুলোও রাবারের তৈরি সামগ্রী। তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, রাবার এবং রাবারজাত পণ্যসামগ্রী আমাদের জীবনের অনেক কাজের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবার তাহলে রাবার সম্পর্কে আরো একটু বিস্তারিতভাবে জেনে নেওয়া যাক।

রাবারের ভৌত ধর্ম

প্রাকৃতিক রাবার পানিতে অদ্রবণীয় একটি অদানাদার কঠিন পদার্থ। রাবার কিছু কিছু জৈব দ্রাবক, যেমন: এসিটোন, মিথানল— এগুলোতে অদ্রবণীয় হলেও টারপেন্টাইন, পেট্রোল, ইথার, বেনজিন এগুলোতে সহজেই দ্রবণীয়। রাবার সাধারণত সাদা বা হালকা বাদামি রঙের হয়। রাবার একটি স্থিতিস্থাপক পদার্থ অর্থাৎ একে টানলে লম্বা হয় এবং ছেড়ে দিলে আগের অবস্থায় ফিরে যায়। বেশিরভাগ রাবারই তাপ সংবেদনশীল অর্থাৎ তাপ দিলে গলে যায়। বিশুদ্ধ রাবার বিদ্যুৎ এবং তাপ কুপরিবাহী। তবে আজকাল বিজ্ঞানীরা বিশেষভাবে তৈরি বিদ্যুৎ পরিবাহী রাবার আবিষ্কার করেছেন।

রাবারের রাসায়নিক ধর্ম

তোমরা জান, প্রায় প্রতিটি পদার্থ তাপ দিলে আয়তনে বাড়ে। কিন্তু রাবারের বেলায় ঠিক উল্টোটি ঘটে অর্থাৎ তাপ দিলে রাবারের আয়তন কমে যায়।

রাবারের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক ধর্ম হলো এটি বেশ কিছু রাসায়নিক পদার্থ, যেমন- দুর্বল ক্ষার, এসিড, পানি এগুলোর সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করে না। যে কারণে কোনো কিছু রক্ষা করার জন্য প্রলেপ দেওয়ার কাজে এটি ব্যবহৃত হয়।

তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ, রাবার দীর্ঘদিন রেখে দিলে কী ঘটে? সেটি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

এর কারণ হলো, রাবার বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে। অক্সিজেন ছাড়াও আরও কিছু রাসায়নিক পদার্থ, বিশেষ করে ওজোন (O_3) প্রাকৃতিক রাবারের সাথে বিক্রিয়া করে, যার কারণে রাবার ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নষ্ট হয়ে যায়।

৬.৩.২ প্লাস্টিক

প্লাস্টিক শব্দের অর্থ হলো সহজেই ছাঁচযোগ্য। নরম অবস্থায় প্লাস্টিক ইচ্ছামতো ছাঁচে ফেলে সেটা থেকে নির্দিষ্ট আকার-আকৃতি বিশিষ্ট পদার্থ তৈরি করা যায়। আমরা বাসাবাড়িতে নানা রকম প্লাস্টিক সামগ্রী ব্যবহার করছি। মগ, বালতি, জগ, মেলামাইনের থালা-বাসন, পিভিসি পাইপ, বাচ্চাদের খেলনা, গাড়ির সিটবেল্ট, এমনকি আসবাবপত্র সবকিছুই প্লাস্টিকের তৈরি। তোমরা জান যে এগুলো সবই পলিমার পদার্থ। এবারে প্লাস্টিকের ধর্ম সম্পর্কে একটুখানি জেনে নেওয়া যাক।

প্লাস্টিকের ভৌত ধর্ম

প্লাস্টিক কি পানিতে দ্রবীভূত হয়? না, হয় না। বেশির ভাগ প্লাস্টিকই পানিতে অদ্রবণীয়। প্লাস্টিকের একটি গুরুত্বপুর্ণ ধর্ম হলো এরা বিদ্যুৎ এবং তাপ পরিবহন করে না। তাই বিদ্যুৎ এবং তাপ নিরোধক হিসেবে এদের বহুল ব্যবহার রয়েছে। প্লাস্টিকের সবচেয়ে বড় ধর্ম হলো গলিত অবস্থায় এদেরকে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। এই সুবিধার কারণেই এটি নানাবিধ কাজে ব্যবহৃত হয়। তাপ দিলে প্লাস্টিকে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে? পলিথিন, পিভিসি পাইপ, পলিস্টার কাপড়, বাচ্চাদের খেলনা— এসব প্লাস্টিক তাপ দিলে নরম হয়ে যায় এবং গলিত প্লাস্টিক ঠান্ডা করলে শক্ত হয়ে যায়। এভাবে যতবারই এদেরকে তাপ দেওয়া যায়, এরা নরম হয় ও ঠান্ডা করলে শক্ত হয়। এগুলোকে থার্মোপ্লাস্টিকস (Thermoplastics) বলে।

অন্যদিকে মেলামাইন, বাকেলাইট (যা ফ্রাইং প্যানের হাতলে এবং বৈদ্যুতিক সকেটে ব্যবহার করা হয়) এগুলো তাপ দিলে নরম হয় না বরং পুড়ে শক্ত হয়ে যায়। এদেরকে একবারের বেশি ছাঁচে ফেলে নির্দিষ্ট আকার দেওয়া যায় না। এই সকল প্লাস্টিককে থার্মোসেটিং প্লাস্টিকস (Thermosetting Plastics) বলে।

প্লাস্টিকের রাসায়নিক ধর্ম

বেশির ভাগ প্লাস্টিক রাসায়নিকভাবে যথেষ্ট নিষ্ক্রিয়। তাই বাতাসের জলীয় বাষ্প ও অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে না এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। এমনকি পাতলা এসিড বা ক্ষারের সাথেও প্লাস্টিক বিক্রিয়া করে না। তবে শক্তিশালী ও ঘনমাত্রার এসিডে কিছু কিছু প্লাস্টিক দ্রবীভূত হয়ে যায়। প্লাস্টিক সাধারণত দাহ্য হয় অর্থাৎ এদেরকে আগুন ধরালে পুড়তে থাকে এবং প্রচুর তাপশক্তি উৎপন্ন করে।

প্লাস্টিক কি পচনশীল? না, প্লাস্টিক পচনশীল নয়। দীর্ঘদিন মাটি বা পানিতে পড়ে থাকলেও এসব পচে না। অবশ্য বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পচনশীল প্লাস্টিক আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। হাত-পা কেটে গেলে বা মেডিক্যাল অপারেশনে সেলাইয়ের কাজে যে সুতা ব্যবহৃত হয়। সেগুলো এক ধরনের পচনশীল প্লাস্টিক।

প্লাস্টিক পোড়ালে অনেক ক্ষতিকর পদার্থ তৈরি হয়। যেমন: পিভিসি পোড়ালে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) নিঃসৃত হয়। আবার পলিইউরেথেন (Polyurethane) প্লাস্টিক (যা আসবাবপত্র, যেমন: চেয়ার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়) পোড়ালে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইডের মতো বিষাক্ত গ্যাস তৈরি হয়।

৬.৩.৩ পরিবেশের ভারসাম্যহীনতায় রাবার ও প্লাস্টিক

তোমরা জেনেছ যে বেশির ভাগ প্লাস্টিক এবং কৃত্রিম রাবার পচনশীল নয়। এর ফলে পুনর্ব্যবহার না করে বর্জ্য হিসেবে ফেলে দিলে এগুলো পরিবেশে জমা হতে থাকে এবং নানা রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তোমরা কি খেয়াল করে দেখেছ ঢাকা বা অন্যান্য শহরের বেশির ভাগ নর্দমার নালায় প্রচুর প্লাস্টিক বা রাবার জাতীয় জিনিস পড়ে থাকে? এগুলো জমতে জমতে একপর্যায়ে নালা নর্দমা বন্ধ হয়ে পানির প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই রাস্তায় পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, যা পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে। একইভাবে প্লাস্টিক এবং বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবস্থাপনা না করায় এর বড় একটি অংশ নদ-নদী, হ্রদ বা জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। এভাবে জমতে থাকলে একসময় নদীর গভীরতা কমে যায়, যা নাব্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। আবার ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক বা রাবারের বর্জ্য অনেক সময় মাটিতে থাকলে তা মাটির উর্বরতা নষ্ট করতে পারে। ফেলে দেওয়া এসব বর্জ্য অনেক সময় গরু, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুর খাবারের সাথে মিশে তাদের পাকস্থলীতে যায় এবং এক পর্যায়ে সেগুলো মাংস ও চর্বিতে জমতে থাকে। এমনকি নদ-নদী, খাল-বিলে ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক/রাবার বর্জ্য খাবার গ্রহণের সময় মাছের দেহেও প্রবেশ করতে পারে এবং সেখানে জমা হতে থাকে। আমরা সেই মাছ, মাংস খেলে শেষ পর্যন্ত সেগুলো আমাদের দেহে প্রবেশ করে, যা ক্যান্সারের মতো মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করতে পারে।

তাহলে এটি স্পষ্ট যে প্লাস্টিক ও রাবার সামগ্রী সঠিক ব্যবস্থাপনা না করলে তা মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটিয়ে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। তাই প্লাস্টিক আর রাবার সামগ্রী যতবার সম্ভব নিজেরা পুনরায় ব্যবহার করতে হবে এবং অন্যদেরও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়লে যেখানে-সেখানে ফেলে না দিয়ে একসাথে জড়ো করে রাখতে হবে। এভাবে জড়ো করা সামগ্রী বিক্রিও করা যায়। এতে একদিকে যেমন পরিবেশ সংরক্ষিত হবে, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবেও লাভবান হওয়া যায়। বিক্রি করার সুযোগ না থাকলে— এটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

? অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন ধরনের তন্তুর জন্য হেলকিং করা প্রয়োজন?

(ক) পাট (খ) পশম
(গ) রেশম (ঘ) লিনেন

২. পাশের চিত্রে উৎপাদিত তন্তুটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি

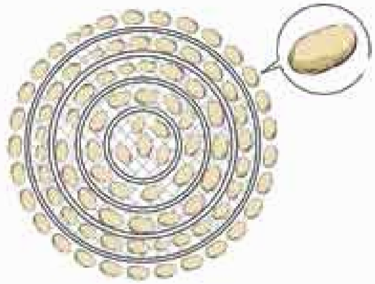

(i) বেশ মিহি
(ii) খুব সস্তা
(iii) দ্রুত গরম হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পরের চিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

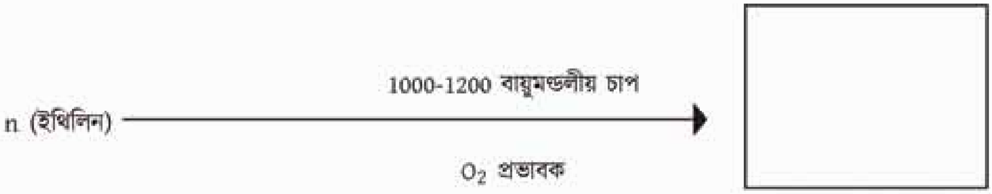

চিত্র ঃ A চিত্র ঃ B

৩. B চিত্রে উৎপাদিত দ্রব্যটি কী?

(ক) রেজিন (খ) পলিথিন
(গ) মেলামাইন (ঘ) অ্যাসবেস্টস

৪. B চিত্রে উৎপাদিত দ্রব্যটির সাথে কোনটির সাদৃশ্য রয়েছে?

(ক) সিল্কের (খ) পশমের
(গ) উলের (ঘ) পলিস্টারের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আরজু জানুয়ারি মাসের এক সকালে স্কুলে যাচ্ছিল। শীত নিবারণের জন্য সে একটি সুতি শার্টের উপর আর একটি সুতি শার্ট পরল। সে লক্ষ করল তাতেও তার বেশ ঠান্ডা লাগছে। কিন্তু তার মনে হলো তিন মাস আগে সে যখন শুধু একটি শার্ট পরেই স্কুলে যেত, তখন এ ধরনের কোনো সমস্যা হতো না।

(ক) নন সেলুলোজিক তন্তু কাকে বলে?
(খ) লিনেনকে কেন প্রাকৃতিক তন্তু বলা হয়?
(গ) আরজুর কোন ধরনের কাপড় পরা দরকার ছিল? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) একই কাপড়ে দুই সময় দুই ধরনের অনুভূতি লাগার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. মিলন সাহেবের একটি পিভিসি পাইপ তৈরির কারখানা আছে। তিনি ইমন ও মামুনকে কাঁচামাল সরবরাহ করতে বললেন। ইমন যে কাঁচামাল সরবরাহ করল সেটি স্থিতিস্থাপক এবং অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে। আবার মামুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালের ভৌত গুণ হচ্ছে গলিত অবস্থায় এটিকে যেকোনো আকার দেওয়া যায়। রাসায়নিকভাবে এটি নিষ্ক্রিয়। তবে দুটি কাঁচামালই মাটিতে অপচনশীল।

(ক) মনোমার কী?
(খ) মেলামাইনকে কেন পলিমার বলা হয়?
(গ) ইমন ও মামুনের সরবরাহকৃত কাঁচামালগুলো কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে? ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) পিভিসি পাইপ তৈরিতে মিলন সাহেবের কোন কাঁচামালটি ব্যবহার করা উচিত বলে তুমি মনে করো?

সপ্তম অধ্যায়

অম্ল, ক্ষারক ও লবণের ব্যবহার

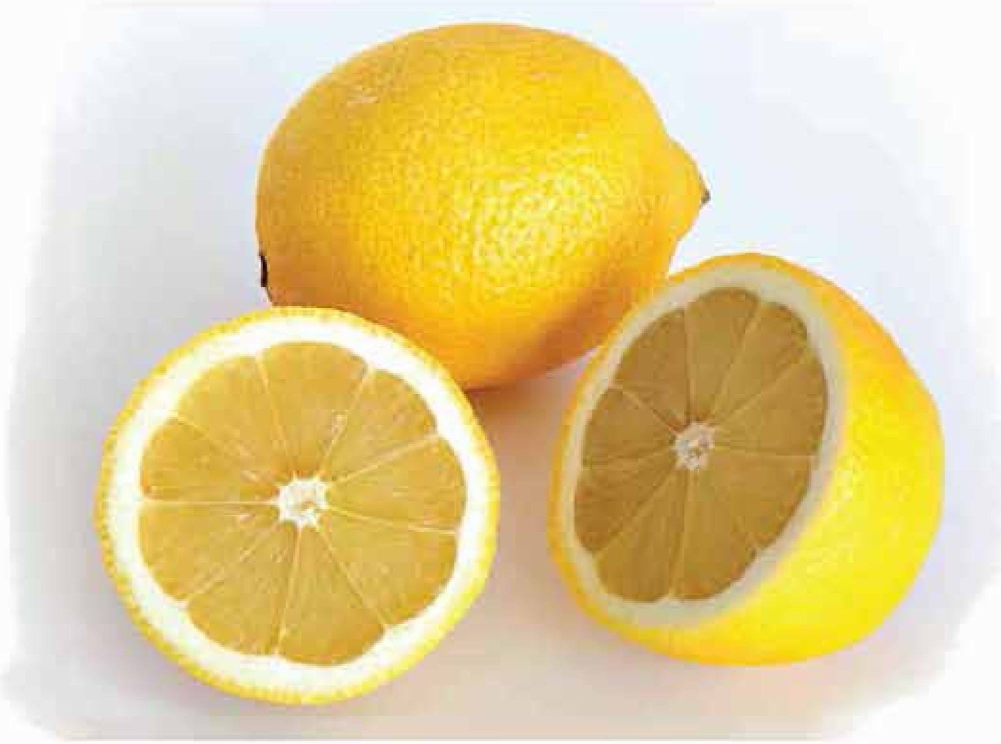

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা অম্ল, ক্ষার ও লবণ কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ তার একটা প্রাথমিক ধারণা পেয়েছ। এই অধ্যায়ে আমরা অম্ল বা এসিড, ক্ষার ও লবণ সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত আলোচনা করব। এগুলো কীভাবে আমাদের দৈনন্দিন কিংবা কর্মজীবনে ব্যবহার হয়, সেটার একটা ধারণা দেওয়া হবে। অম্ল ও ক্ষারের পরিমাপের জন্য pH বলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে, এই অধ্যায় শেষে আমরা সেটি সম্পর্কেও ধারণা পেয়ে যাব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- শক্তিশালী ও দুর্বল এসিডের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার এবং সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এসিড অপব্যবহারের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব চিহ্নিত করতে পারব (লিটমাস, পূর্বের শ্রেণিতে তৈরিকৃত ফুল, সবজির নির্যাসের সাহায্যে)।
- পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ এবং সঠিক খাদ্য নির্বাচন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পদার্থের pH -এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহারের সাবধানতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে প্রশমনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে লবণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- পরীক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার লবণ তৈরি করতে পারব।
  (ধাতু + এসিড, ধাতুর অক্সাইড+এসিড)
- আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে অম্ল, ক্ষার ও লবণের অবদানকে প্রশংসা করব।

৭.১ এসিড

৭.১.১ শক্তিশালী ও দুর্বল এসিড

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা বেশ কিছু জৈব এসিডের নাম জেনেছ। তোমরা এটাও জেনে গেছ যে এসিডগুলো পানিতে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। তবে মজার ব্যাপার হলো, কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে জৈব এসিডগুলো কিন্তু পানিতে পুরোপুরিভাবে বিয়োজিত না হয়ে আংশিকভাবে বিয়োজিত হয়। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে তার সবগুলো হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে না। সে জন্য এই এসিডগুলোকে দুর্বল এসিড বলে (চিত্র ৭.০১)। পক্ষান্তরে, খনিজ এসিডগুলো পানিতে পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) তৈরি করে। অর্থাৎ যতগুলো এসিডের অণু থাকে, তার সবগুলোই বিয়োজিত হয়।

তবে কিছু এসিড আছে, যেমন: কার্বোনিক এসিড (H_2CO_3), যেটি জৈব এসিড না হলেও দুর্বল এসিড।

চিত্র ৭.০১: দুর্বল ও শক্তিশালী এসিড

দুর্বল এসিড	শক্তিশালী এসিড
এসিটিক এসিড (CH_3COOH)	সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4)
সাইট্রিক এসিড ($C_6H_8O_7$)	নাইট্রিক এসিড (HNO_3)
অক্সালিক এসিড (HOOC—COOH)	হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl)

৭.১.২ প্রাত্যহিক জীবনে এসিডের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, বোলতা বা বিছু হুল ফুটালে প্রচণ্ড জ্বালা করে কেন? এর কারণ হলো বোলতা এবং বিছুর হুলে থাকে হিস্টামিন (Histamine) নামে এক ধরনের ক্ষারক পদার্থ। তাই এসব ক্ষেত্রে জ্বালা নিবারণের জন্য যে মলম ব্যবহার করা হয়, তাতে থাকে ভিনেগার অথবা বেকিং সোডা, যেগুলো এসিড কিংবা এসিড—জাতীয়। এগুলো ঐ ক্ষারকের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো নিষ্ক্রিয় করে; ফলে জ্বালা আর থাকে না।

চিত্র ৭.০২: আচার সংরক্ষণে ভিনেগার ব্যবহার করা হয়

আবার আমরা প্রায় সবাই সাধারণত মাংস, পোলাও, বিরিয়ানি এ ধরনের খাবার খাওয়ার পর কোনো ধরনের কোমল পানীয় পান করি। এটা কি আমাদের কোনো কাজে আসে? আসলে খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে নির্দিষ্ট মাত্রায় হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয়। এই মাত্রার হেরফের হলে আমাদের পরিপাকে অসুবিধা হয়। কোমল পানীয়গুলো অল্পমাত্রায় এসিডিক, তাই গুরুপাক খাবার পর কোমল পানীয় আমাদের পরিপাকে সাহায্য করে।

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা জেনেছ যে লেবু, কমলা, আপেল, পেয়ারা, আমলকী ইত্যাদি নানা রকম ফলের মাঝে আছে নানা রকমের জৈব এসিড, যেগুলো আমাদের খুবই প্রয়োজনীয়। আবার কিছু কিছু এসিড আছে, যে গুলো রোগ প্রতিরোধও করে। যেমন ভিটামিন সি বা এসকরবিক এসিড। তোমরা কি জান, ভিটামিন সি ক্ষত সারাতে খুবই সহায়ক হিসেবে কাজ করে এবং আমাদের শরীরে এর অভাবে স্কার্ভি রোগ হয়?

চিত্র ৭.০৩: বোরহানি বা দই খেলে এতে বিদ্যমান ল্যাকটিক এসিড হজমে সহায়তা করে।

আম, জলপাই ইত্যাদি নানা রকম আচার (চিত্র ৭.০২) সংরক্ষণে কী এসিড ব্যবহার করা হয় সেটি কি তোমরা জান? এটি হলো ভিনেগার বা এসিটিক এসিড (CH_3COOH)। বিয়েবাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার পর বোরহানি বা দই খেলে কোনো লাভ হয় কি? হ্যাঁ, লাভ হয়। কোমল পানীয়ের মতো বোরহানি (চিত্র ৭.০৩) বা দই খেলে এতে বিদ্যমান ল্যাকটিক এসিড হজমে সহায়তা করে।

তোমরা কি জান, কেক, বিস্কুট বা পাউরুটি ফোলানো হয় কীভাবে? এটি করা হয় বেকিং সোডা ব্যবহার করে।

তাপ দিলে বেকিং সোডা ভেঙে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, যেটি কেক বা পাউরুটিকে ফুলিয়ে তোলে।

আমরা টয়লেট পরিষ্কার করার জন্য যেসব পরিষ্কারক ব্যবহার করি, তার মূল উপাদান কী তোমরা জান? এর মূল উপাদান হলো শক্তিশালী এসিড, যেমন HCl, HNO_3 কিংবা H_2SO_4।

সৌর প্যানেলে তৈরি সৌরবিদ্যুৎ সংরক্ষণের জন্য, বা বাসাবাড়িতে আইপিএস (IPS) চালানোর জন্য এবং গাড়িতে যে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়, তার অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান হলো সালফিউরিক এসিড।

তোমরা জান যে, ফসল উৎপাদনের জন্য সার হলো অতি প্রয়োজনীয় একটি জিনিস। সার হিসেবে আমরা যেগুলো ব্যবহার করি তার অন্যতম হলো অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম সালফেট ($(NH_4)_2SO_4$) ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট ($(NH_4)_3PO_4$), আর সার কারখানায় এগুলো তৈরি করা হয় যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড (HNO_3), সালফিউরিক এসিড (H_2SO_4) এবং ফসফরিক এসিড (H_3PO_4) দিয়ে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নানা রকম এসিড। তাই আমাদের জীবনে এসিডের ভূমিকা অপরিসীম ও অনস্বীকার্য। তবে কিছু কিছু এসিড, বিশেষ করে শক্তিশালী এসিডগুলো (যেমন H_2SO_4, HNO_3, HCl) মানবদেহের জন্য যেমন মারাত্মক ক্ষতিকর, তেমনি আমাদের অনেক প্রয়োজনীয় এবং নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্রেরও অনেক ক্ষতি করে। আমাদের শরীরে কোথাও লাগলে সেই স্থান পুড়ে যায় এবং সেখানে মারাত্মক ক্ষত সৃষ্টি করে। তোমরা হয়তো এসিড ছুড়লে মানুষের শরীর কীভাবে ঝলসে যায় সেগুলো পত্রিকায় বা টেলিভিশনের খবরে দেখেছ। অন্যদিকে এসিড কাপড়ে লাগলে কাপড়ও পুড়ে যায় কিংবা ছিন্ন হয়ে যায়। একইভাবে ধাতব পদার্থসমূহ এসিডের সংস্পর্শে এলে তাও ক্ষয় হয়ে যায়। অতএব এসিডের ব্যবহারে আমাদের খুবই সাবধান হতে হবে। কোনো কারণে গায়ে এসিড পড়লে সাথে সাথে প্রচুর পানি দিয়ে সেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হবে।

দলগত কাজ

কাজ: মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব দেখা (চিত্র ৭.০৪)।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ১টি বিকার কিংবা কাচের বোতল, কিছু মাটি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

পদ্ধতি: বিকারে বা কাচের বোতলে কিছু মাটি নিয়ে (১০০ গ্রাম) ১০-২০ মিলিলিটার (কয়েক চামচ) পানি যোগ করো। নাড়ানি দিয়ে খুব ভালোভাবে নাড়া দাও। চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল

লিটমাস কাগজ বিকারের মিশ্রণে ডুবাও। কিছু সময় অপেক্ষা করো। তলানি জমা হলে লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন খাতায় লিখে রাখ।

যদি লিটমাস পেপার সংগ্রহ করতে না পার তাহলে ফুলের নির্যাস দিয়েও এই পরীক্ষাটি করতে পার। এবার তোমরা আগের শ্রেণিতে তৈরি করা নির্যাস একে একে টেস্টটিউবে নিয়ে বিকারের মিশ্রণে যোগ করে দেখো নির্যাসের রং কীভাবে পরিবর্তন হয়। মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় বা নিরপেক্ষ—তিন রকমেরই হতে পারে এবং এটি মূলত নির্ভর করে এতে কী ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বিদ্যমান তার উপর।

চিত্র ৭.০৪: মাটির অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব দেখা।

৭.১.৩ এসিডের অপব্যবহার, আইনকানুন ও সামাজিক প্রভাব

পৃথিবীর সকল সমাজেই এক-দুইজন খারাপ/নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ (চিত্র ৭.০৫) থাকে— আমাদের সমাজেও আছে। তারা নিজের প্রতিহিংসা মেটাতে অন্য মানুষের শরীরে এসিড ছুড়ে মারার মতো ভয়ানক অপরাধ করতে পারে। এসিড ছুড়ে মারার ফলে মানুষের শরীর সম্পূর্ণ ঝলসে যায়। মুখমণ্ডলে এসিড ছুড়লে সেটি বিকৃত আকার ধারণ করে। এ কারণে যারা এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হন, তারা তাদের বিকৃত চেহারা নিয়ে জনসম্মুখে আসতে চায় না, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তারা আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যারা এসিড-সন্ত্রাসের শিকার হয়, তাদের বেশির ভাগই স্কুল—কলেজের ছাত্রী বা গৃহবধূ। এসিড-সন্ত্রাসের কারণে এই সম্ভাবনাময় ও মেধাবী ছাত্রীদের পড়াশোনা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আবার গৃহবধূরা এর শিকার হলে পুরো পরিবারে নেমে আসছে দুর্বিষহ জীবন। তাই এসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের সোচ্চার হতে হবে এবং মানুষকেও এ ব্যাপারে সচেতন করতে হবে।

৭.১.৪ এসিড ছুড়লে শাস্তি

এসিড ছোড়া একটি মারাত্মক অপরাধ। বাংলাদেশ নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ অনুযায়ী এসিড ছোড়ার শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। যে এসিড ছোড়ে, সে একদিকে যেমন অন্যের জীবনটি ধ্বংস করে দিচ্ছে, অন্যদিকে

চিত্র ৭.০৫: নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ অন্যের শরীরে এসিড ছুড়ে মারার মতো ভয়ানক অপরাধ করতে পারে।

২০২১

নিজেও কঠোর শাস্তির হাত থেকে বাঁচতে পারছে না। হয়তো বাকি জীবন জেলখানায় বন্দী জীবন কাটাতে হচ্ছে। তাই আমাদের সব মানুষকে এসিড ছোড়ার ভয়াবহতার কথা বোঝাতে হবে। যারা সাধারণ মানুষের কাছে এত সহজে এসিড বিক্রি করে তাদেরকেও সতর্ক করতে হবে কিংবা শাস্তি দিতে হবে। একই সাথে কেউ এসিড দিয়ে আক্রান্ত হলে তাকে কীভাবে প্রতিরক্ষা করতে হবে (যেমন পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলা), সে ব্যাপারটিও সবাইকে জানিয়ে দিতে হবে।

৭.১.৫ নির্দেশক ব্যবহার করে বিভিন্ন বস্তুর অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব শনাক্তকরণ

আগের শ্রেণিতে তোমরা বেশ কয়েকটি ফুলের নির্যাস তৈরি করেছ এবং এদেরকে নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করে এসিড ও ক্ষারক শনাক্ত করেছ। এখন এসব নির্দেশক দিয়ে আমাদের জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত কিছু জিনিসের অম্লত্ব ও ক্ষারকত্ব পরীক্ষা করতে পারি।

দলগত কাজ

কাজ: টুথপেস্টের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব দেখা (চিত্র ৭.০৬)।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: টুথপেস্ট, লিটমাস কাগজ, বিকার বা কাচের বোতল বা গ্লাস, ফুলের নির্যাস, নাড়ানি, পানি, চিমটা।

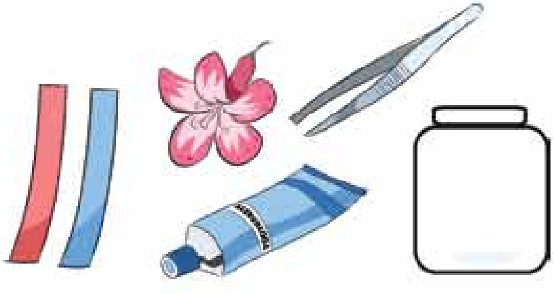

চিত্র ৭.০৬: টুথপেস্টের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব দেখা

পদ্ধতি: বিকারে ৪-৫ গ্রাম টুথপেস্ট নাও। ৫-১০ সিসি বিশুদ্ধ পানি যোগ করে ভালোভাবে নাড়ানি দিয়ে নাড়া দাও। মিশ্রণটি কিছুক্ষণ রেখে দাও। এবার চিমটা দিয়ে প্রথমে নীল লিটমাস কাগজ বিকারের মিশ্রণে ডুবাও। এ সময় এর বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ কর। একইভাবে লাল লিটমাস কাগজ ডুবিয়ে বর্ণ পরিবর্তন লক্ষ করো (চিত্র ৭.০৬)। তোমরা কী দেখতে পেলে? লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে নীল হলো আর নীল লিটমাসের কোনো পরিবর্তন হলো না। অর্থাৎ টুথপেস্ট হলো ক্ষারীয় পদার্থ। এবার একটি টেস্টটিউবে টুথপেস্টের ১-২ মিলিলিটার পরিমাপ নিয়ে তাতে সবজি ও ফুলের নির্যাস যোগ করে দেখো কী ধরনের বর্ণ পরিবর্তন হয়।

দলগত কাজ

কাজ: বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব শনাক্তকরণ (চিত্র ৭.০৭)।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: নানা রকম পানীয় (সফট ড্রিংকস) ও ফলের জুস (আম, লিচু, কমলা ইত্যাদি), বিকার, লিটমাস কাগজ, ফুলের নির্যাস।

চিত্র ৭.০৭: বিভিন্ন রকম পানীয় ও ফলের রসের অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব শনাক্তকরণ

পদ্ধতি: বিকারে বা কাচের বোতলে একে একে পানীয় নাও এবং লাল ও নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও। কী ধরনের পরিবর্তন লক্ষ করলে? লাল লিটমাস কাগজের রঙে কোনো পরিবর্তন হলো না, কিন্তু নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। এ থেকে কী বুঝা গেল? আমরা সাধারণত যেসব পানীয় ও ফলের রস পান করে থাকি, সেগুলো অম্লীয় পদার্থ। এবার প্রতিটি পানীয় ও ফলের রসে তোমাদের আগের তৈরি ফুলের নির্যাস একে একে যোগ করে দেখো কী ধরনের রং পরিবর্তন হয়।

৭.১.৬ পাকস্থলীতে এসিডিটির কারণ ও সঠিক খাদ্য নির্বাচন

তোমরা জান, পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য আমাদের সবার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের প্রয়োজন হয় এবং সেটি নিজে থেকে আমাদের পাকস্থলীতে তৈরি হয়। কোনো কারণে যদি এই এসিডের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন সেই অবস্থাকেই আমরা পাকস্থলীর এসিডিটি বলি। এখন প্রশ্ন হলো, কখন এবং কী কী কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যায়? নানা কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে (চিত্র ৭.০৮), যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে খাদ্যদ্রব্য। তোমরা নিজেরা কর করতে গিয়ে দেখেছ যে আমরা যেসব পানীয় আর ফলের রস পান করি, তার প্রায় সবই অম্লীয়। কাজেই এসব পানীয় বেশি মাত্রায় পান করলে বা খালি পেটে পান করলে সেটা এসিডিটি সৃষ্টি করতে পারে। অন্যান্য পানীয়, বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত চা, কফি-জাতীয় পানীয়গুলোও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়ায়। বেশি ভাজা, তেলযুক্ত এবং চর্বিজাতীয় খাবারও পাকস্থলীতে এসিডিটি বাড়িয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ এবং অন্যান্য অতিরিক্ত মসলা দেওয়া খাবার, চকলেট— এগুলোও এসিডিটি তৈরির কারণ।

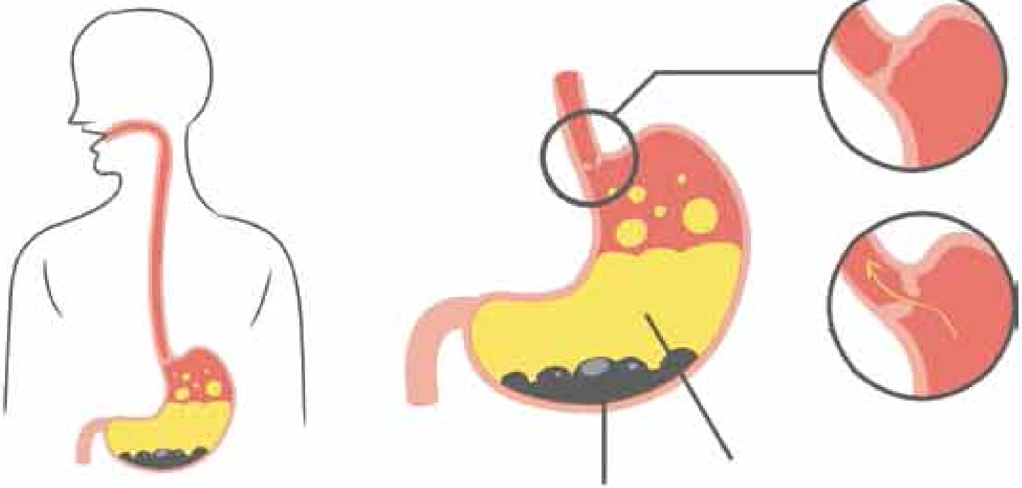

চিত্র ৭.০৮: নানা কারণে পাকস্থলীতে এসিডের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে

খাদ্য ছাড়াও আরো কিছু কারণে এসিডিটি বেড়ে যেতে পারে। এর মধ্যে একটি হলো দুশ্চিন্তা। নিয়মিত সময়মতো খাবার না খাওয়া, কিংবা প্রয়োজন মাফিক ঘুম না হলেও এসিডিটি হতে পারে। আবার কখনো কখনো ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণও এসিডিটির কারণ হতে পারে।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে উপযুক্ত খাদ্য নির্বাচন করে এসিডিটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়?

প্রথমত: যেসব খাদ্যদ্রব্য বা পানীয়ের কারণে এসিডিটি হয়, সেগুলো অতিরিক্ত গ্রহণ না করে পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে এবং প্রয়োজন হলে সাময়িকভাবে ঐ খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে।

দ্বিতীয়ত: বেশ কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে যেগুলো কিছুটা ক্ষারধর্মী এবং ফলে এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করতে পারে। ঐ সব খাদ্য গ্রহণ করে আমরা এসিডিটির হাত থেকে রক্ষা পেতে পারি। এসব খাদ্যের মধ্যে রয়েছে বেশির ভাগ শাকসবজি। যেমন: ব্রকলি, পুঁইশাক, পালংশাক, গাজর, শিম, বিট, লেটুসপাতা, মাশরুম, ভুট্টা, আলু, ফুলকপি ইত্যাদি।

আবার কিছু কিছু খাদ্যশস্য আছে (যেমন: ডাল, মিষ্টি ভুট্টা), যেগুলো এসিডিটি কমাতে সাহায্য করে। দুধজাতীয় খাবারের মধ্যে সয়া মাখন, ছাগলের দুধ থেকে তৈরি করা মাখন, সয়া দুধ, বাদাম দুধ— এগুলোও ক্ষারধর্মী, যা এসিডিটি কমাতে পারে।

নানা রকমের বাদাম, হারবাল চা, সবুজ চা, আদা চা খেয়েও অতিরিক্ত এসিড কমানো যায়।

৭.২ pH এর মান জানার প্রয়োজনীয়তা

তোমরা জান, কোনো একটি পদার্থ এসিড, ক্ষার না নিরপেক্ষ তা নির্দেশক ব্যবহার করে জানা যায়। কিন্তু তাতে কী পরিমাণ এসিড বা ক্ষার আছে, সেটি কীভাবে বুঝা যাবে? সেটি বুঝা যায় pH-এর মান পরিমাপ করে। তাহলে এবার আমরা এই pH দিয়ে কী বোঝায় তা জেনে নিই।

নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি যেখানে কোনো এসিড বা ক্ষার থাকে না, তার pH হয় ৭। আর যদি এতে এসিড যোগ করা হয় তাহলে pH-এর মান কমে যায়। যত বেশি এসিড যোগ করা যায়, pH-এর মান ততই কমে যায়। পক্ষান্তরে যদি বিশুদ্ধ পানি বা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণে ক্ষার যোগ করা হয়, তাহলে এর pH বাড়তে থাকে। যত বেশি ক্ষার যোগ করা হয়, pH-এর মান ততই বাড়তে থাকে।

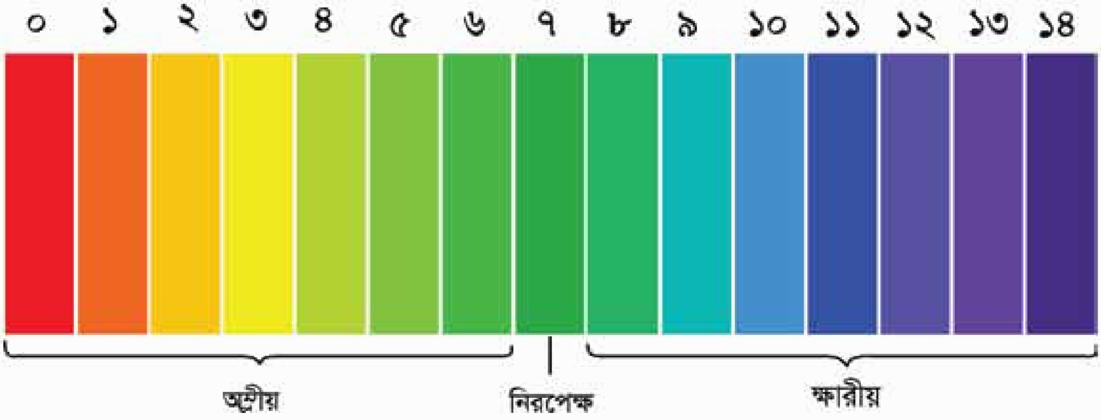

চিত্র ৭.০৯: ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট

সুতরাং বলা যায়:

কোনো দ্রবণের pH = ৭ হলে তা নিরপেক্ষ জলীয় দ্রবণ বা বিশুদ্ধ পানি হবে।
কোনো দ্রবণের pH < ৭ হলে (৭ থেকে কম হলে) তা অম্লীয় বা এসিডীয় দ্রবণ হবে।
কোনো দ্রবণের pH > ৭ হলে (৭ থেকে বেশি হলে) তা ক্ষারীয় দ্রবণ হবে।

pH-এর মান ৭ থেকে যত বেশি কম হবে, এসিডটি তত শক্তিশালী, আবার pH-এর মান ৭ থেকে যত বেশি হবে, ক্ষারকত্বও তত বেশি শক্তিশালী হবে।

মানবদেহ থেকে শুরু করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী কৃষিকাজের ক্ষেত্রে এমনকি রাসায়নিক শিল্পে pH-এর মান জানা এবং নিয়ন্ত্রণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২০২৩

তোমরা কি জান আমাদের ধমনির রক্তের pH কত? আমাদের ধমনির রক্তের pH হলো প্রায় ৭.৪। অর্থাৎ এটি সামান্য ক্ষারধর্মী। এর সামান্য হেরফের হলে (±০.৪) মারাত্মক বিপর্যয়, এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে। আবার আমাদের জিহ্বার লালার pH-এর মান ৬.৬-এর কাছাকাছি থাকলে তখন তা সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখে। আমাদের পাকস্থলীতে খাদ্য হজম করার জন্য দরকারি pH-এর মান হলো ২। এটি যথেষ্ট শক্তিশালী এসিডের পরিমাণ, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই কারণ খাবার হজম করার জন্য আমাদের পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক এসিডের মতো শক্তিশালী এসিড থাকে। এই মান ০.৫-এর মতো হেরফের হলেই তা বদহজম সৃষ্টি করে। আমাদের প্রস্রাবের pH-এর মান ৭-এর কম থাকা স্বাভাবিক।

মাটির pH সাধারণত ৪ থেকে ৮-এর ভেতর থাকে। অর্থাৎ এটি এসিডিক থেকে শুরু করে ক্ষারীয় হতে পারে। মাটির pH-এর মান ৩-এর কম অর্থাৎ বেশি অম্লীয় (Acidic) হলে মাটির অনেক দরকারি উপাদান যেমন: ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) মাটি থেকে চলে যায়। তার ফলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। এসিডিক মাটির জন্য ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম যুক্ত সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অন্যদিকে মাটির খুব ক্ষারীয় হলে অর্থাৎ pH-এর মান ৯.৫-এর বেশি হলেও মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। এক্ষেত্রে Al^{3+} (অ্যালুমিনিয়াম আয়ন) সহজেই মাটি থেকে গাছের মূলে চলে যায় এবং এতে গাছের মারাত্মক ক্ষতি হয়। ক্ষারীয় মাটির জন্য নাইট্রেট ও ফসফেট-জাতীয় সার ব্যবহার করে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অতিরিক্ত এসিড বা ক্ষার অর্থাৎ pH খুব কমে গেলে বা বেড়ে গেলে মাটিতে থাকা উপকারী অনেক অণুজীব মারা যায়, ফলে গাছপালার স্বাভাবিক জৈবিক কার্যকলাপ ব্যাহত হয়।

বাজারে মুখ ধোয়ার জন্য যেসব প্রসাধন সামগ্রী পাওয়া যায়, তাতে লেখা থাকে pH-এর মান ৫.৫, এর কারণ কী? এর কারণ আমাদের ত্বক সাধারণত এসিডিক হয় এবং এর pH ৪-৬ এর মধ্যে থাকে। তবে নবজন্ম নেওয়া শিশুদের ত্বকের pH-এর মান ৭ এর কাছাকাছি থাকে। তাই বড়দের জন্য যেসব প্রসাধনী ব্যবহৃত হয়, তা শিশুদের জন্য প্রযোজ্য নয়। এতে শিশুদের ত্বকের ক্ষতি হতে পারে।

বিভিন্ন শিল্প রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় pH নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানা রকম ঔষধ, কলমের কালি, বেকারিতে, লজেন্স জাতীয় মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য, চামড়া প্রস্তুতি ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া আলোকচিত্র-সংক্রান্ত রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, রং তৈরি ও ব্যবহারে, ধাতব পদার্থের ইলেকট্রোপ্লেটিং এরকম হাজারো ক্ষেত্রে pH-এর মান নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করা হয়।

কোন মানের pH দ্রবণে কোন বর্ণ ধারণ করবে, তা বোঝার জন্য একটি চার্ট রয়েছে (চিত্র ৭.০৯)। একে ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্ট বলে। কোনো দ্রবণে কয়েক ফোঁটা ইউনিভার্সাল নির্দেশক যোগ করলে দ্রবণ যে বর্ণ ধারণ করে, সেই বর্ণ ইউনিভার্সাল নির্দেশক কালার চার্টের বর্ণের সাথে মিলিয়ে দ্রবণের pH পরিমাপ করা হয়।

৭.৩ ক্ষার

৭.৩.১ ক্ষারকের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

অষ্টম শ্রেণিতে তোমরা ক্ষারক ও ক্ষার কী তা জেনেছ। এখন এ অধ্যায়ে এদের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানা যাক।

নির্দেশকের সাথে বিক্রিয়ার মাধ্যমে রং পরিবর্তন: তোমরা সবাই জান সকল ক্ষারক লাল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তন করে নীল করে। এছাড়া আরো কিছু নির্দেশক আছে, যেগুলো নিয়মিতভাবে পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়। (যেমন- মিথাইল অরেঞ্জ, মিথাইল রেড, ফেনলফথেলিন) এগুলোও রং পরিবর্তন করে। টেবিল: ৭.০১ এ কোন ক্ষারক নির্দেশকের কী ধরনের রং পরিবর্তন করে তা দেখানো হলো।

টেবিল ৭.০১: ক্ষারক ও নির্দেশকের বিক্রিয়ার ফলে রং পরিবর্তন

নির্দেশক	নির্দেশকের রং	ক্ষারকের ধারণকৃত রং
লাল লিটমাস কাগজ	লাল	নীল
মিথাইল অরেঞ্জ	কমলা	হলুদ
মিথাইল রেড	লাল	হলুদ
ফেনলফথেলিন	বর্ণহীন	গোলাপি

পানিতে দ্রবণীয় ক্ষারক অর্থাৎ ক্ষারসমূহ পানিতে হাইড্রক্সাইড আয়ন (OH^-) উৎপন্ন করে।

$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$
$$KOH \longrightarrow K^+ + OH^-$$
$$NH_4OH \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$$

ক্ষারক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ উৎপন্ন করে। ক্ষারক ও এসিড পরস্পর বিপরীতধর্মী পদার্থ এবং বিক্রিয়া করে একে অপরকে নিষ্ক্রিয় করে নিরপেক্ষ পদার্থ লবণ ও পানি তৈরি করে। পরে তোমরা আরো বিস্তারিতভাবে এই বিক্রিয়া শিখবে।

দলগত কাজ

কাজ: ক্ষারকের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানা (চিত্র ৭.১০)।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ক্ষারক (চুন বা $Ca(OH)_2$), এসিড (ভিনেগার) এবং একটি নির্দেশক (লাল লিটমাস কাগজ বা ফেনলফথেলিন), বিকার বা কাচের বোতল।

পদ্ধতি: বিকারে বা কাচের বোতলে ৫০ মিলিলিটার চুনের দ্রবণ নাও। লাল লিটমাস কাগজ দ্রবণে ডুবাও। লিটমাস কাগজটি নীল হয়ে গেল, তাইতো? এতে প্রমাণিত হলো যে ক্ষারক লাল লিটমাসকে নীল করে। এবার ড্রপার দিয়ে আস্তে আস্তে ভিনেগার বিকারে নেওয়া $Ca(OH)_2$ দ্রবণে যোগ করো। এবং নাড়াতে থাকো। নীল লিটমাস কাগজটি দ্রবণে ডুবিয়ে কোনো পরিবর্তন হয় কি না দেখো। প্রথম দিকে দেখবে কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ক্রমাগত ভিনেগার যোগ করতে থাক আর লিটমাস কাগজ দিয়ে রং পরিবর্তন হয় কি না খেয়াল করো। এক পর্যায়ে দেখবে নীল লিটমাস কাগজের রং পরিবর্তিত হয়ে লাল হয়ে গেল। কেন এমন হলো? কারণ হলো, এসিড যোগ করাতে তা আস্তে আস্তে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করছে। এভাবে যখন সমস্ত $Ca(OH)_2$ বিক্রিয়া করে ফেলেছে, তখন এসিড যোগ করার ফলে দ্রবণটির এসিডিক হয়ে গেছে আর সে কারণেই নীল লিটমাস লাল হয়ে গেছে।

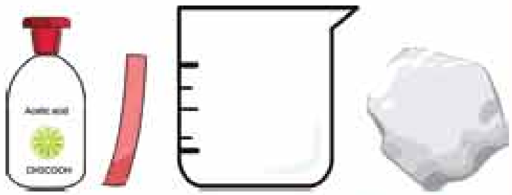

চিত্র ৭.১০: ক্ষারকের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানা

৭.৩.২ প্রাত্যহিক জীবনে ক্ষারের ব্যবহার ও সাবধানতা

তোমরা কি জান, মৌমাছি হুল ফুটালে বা পিঁপড়া কামড় দিলে জ্বলে কেন, ফুলে যায় কেন? কারণ হলো, পিঁপড়ার কামড়ের মাধ্যমে মূলত ফরমিক এসিড নিঃসৃত হয়, যা আমাদের শরীরে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে। আর মৌমাছি হুল ফুটালে ফরমিক এসিড, মেলিটিন (Melittin) এবং অ্যাপামিন (Apamin) নামক এসিডিক পদার্থ নিঃসৃত

চিত্র ৭.১১: সাবানের ক্ষারকত্ব পরীক্ষা

২০২৩

হয়, যার কারণে জ্বালাপোড়াও হয় আবার আক্রান্ত স্থান ফুলেও যায়।

এখন প্রশ্ন হলো পিপড়া কামড়ালে বা মৌমাছি হুল ফুটালে করণীয় কী?

যেহেতু এসব ক্ষেত্রে জ্বালাপোড়ার কারণ হচ্ছে এসিড, তাই আমরা এসিডকে নিষ্ক্রিয় করতে পারে এরকম মলম, লোশন (যেমন চুন) ব্যবহার করতে পারি। এরকম আরো একটি লোশন হলো ক্যালামিন (Calamine), যা মূলত জিংক কার্বোনেট ($ZnCO_3$)। বেকিং সোডা ব্যবহার করেও ভালো ফল পাওয়া যায়।

মাটির এসিডিটি দূর করতে ক্ষার: তোমরা আগেই জেনেছ, মাটিতে এসিডিটি বাড়লে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। তখন ক্ষারক ব্যবহার করে এসিডিটিকে প্রশমিত করা যায় এবং উর্বরতা ফিরিয়ে আনা যায়। এক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত ক্ষারক হলো চুন (CaO) এবং মিল্ক অব লাইম ($Ca(OH)_2$)। অবশ্য এ কাজে চুনাপাথরও ($CaCO_3$) ব্যবহার করা হয়।

বাসাবাড়িতে পরিষ্কারক হিসেবে প্রচুর পরিমাণে অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ব্যবহৃত হয়। টুথপেস্ট বা টুথ পাউডার আমাদের নিত্যদিনের একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, যা ক্ষারীয়। খাওয়ার পরে সাধারণত আমাদের মুখে এসিডীয় অবস্থা তৈরি হয়। আর টুথপেস্ট বা পাউডার দিয়ে ব্রাশ করলে একদিকে যেমন দাঁত পরিষ্কার হয়, অন্যদিকে তেমনি পেস্ট বা পাউডারের ক্ষার সৃষ্ট এসিডকে নিষ্ক্রিয় করে। ফলে দাঁতের ক্ষয় রোধ হয়।

আবার থালা-বাসন পরিষ্কার করার জন্য যে শক্ত সাবান বা তরল সাবান ব্যবহার করা হয়, সেগুলোতেও ক্ষারক থাকে (চিত্র ৭.১১)। এমনকি আমরা যে কাপড় কাচার সাবান ব্যবহার করি, তা—ও তৈরি করা হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে। একইভাবে শেভিং ফোম বা নরম সাবান তৈরি করা হয় পটাশিয়াম হাইডোক্সাইড ও চর্বি বা তেল থেকে।

তোমরা জান যে গ্যাস্ট্রিকের ব্যথা বা এসিডিটির কারণে আমরা যে এন্টাসিড খাই তা হলো ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ($Mg(OH)_2$) ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড ($Al(OH)_3$) নামের ক্ষার।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে ক্ষারক বা ক্ষারসমূহ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক কাজে লাগে।

ক্ষার ও ক্ষারক ব্যবহারে সাবধানতা: তোমরা নিজের হাতে কখনো নিজেদের জামাকাপড় পরিষ্কার করে দেখেছ কী ঘটে? একটু বেশি কাপড় একসাথে পরিষ্কার করলে দেখা যায়, হাতের তালু থেকে একটু একটু চামড়া উঠে যায়। এর জন্য দায়ী হলো সাবানে থাকা ক্ষার। এসিড যেমন মানুষের শরীরের ক্ষতি করতে পারে, তেমনি ক্ষারও শরীরের ক্ষতি করতে পারে। তাই শক্তিশালী ক্ষারীয় দ্রব্যাদি নিয়ে কাজ করার সময় হাতে রাবারের মোজা এবং গায়ে অ্যাপ্রোন পরা উচিত।

৭.৩.৩ প্রশমন এবং এর প্রয়োজনীয়তা

পাকস্থলীর এসিডিটির জন্য পেটের ব্যথা হলে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড নামক এন্টাসিড খেলে ব্যথা সেরে যায় কেন? কারণ হলো, এসিডিটির জন্য দায়ী হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইডের প্রশমন বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে অতিরিক্ত হাইড্রোক্লোরিক এসিড নিষ্ক্রিয় হয়ে যায় এবং ব্যথা আর থাকে না। বিক্রিয়াটি নিচে দেখানো হলো:

$$\text{এসিড} + \text{ক্ষার} \longrightarrow \text{লবণ} + \text{পানি}$$
$$2HCl + Mg(OH)_2 \longrightarrow MgCl_2 + 2H_2O$$
$$3HCl + Al(OH)_3 \longrightarrow AlCl_3 + 3H_2O$$

আবার চুন (CaO) ও স্ল্যাক লাইম [$Ca(OH)_2$] দিয়ে মাটির যে এসিডিটি দূর করে উর্বরতা বৃদ্ধি করা হয়, সেটিও হয় প্রশমন বিক্রিয়ার মাধ্যমে, যা নিচে দেখানো হলো:

$$\text{ক্ষার} + \text{এসিড} \longrightarrow \text{লবণ} + \text{পানি}$$
$$CaO + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O$$
$$Ca(OH)_2 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + 2H_2O$$

তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ, খাওয়ার পর আমাদের মুখে এসিড তৈরি হয় আর টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলে এসিডের কারণে দাঁতের ক্ষয়রোধ হয়। এখানেও কিন্তু একধরনের প্রশমন বিক্রিয়াই ঘটে। টুথপেস্টের pH সাধারণত ৯-১১ এর মধ্যে হয় অর্থাৎ এরা ক্ষারীয় এবং এতে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড, বেকিং সোডা, টেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট জাতীয় পদার্থ থাকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রশমন বিক্রিয়া আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

৭.৪ লবণ

৭.৪.১ লবণের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য

এর আগে তোমরা জেনেছ যে লবণ হলো এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ। এখন তোমরা এর রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য জানবে।

দলগত কাজ

কাজ: লবণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা (চিত্র ৭.১২)।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: ১টি পাত্র, খাবার লবণ, বিশুদ্ধ পানি, লাল ও নীল লিটমাস কাগজ, নাড়ানি।

পদ্ধতি: পাত্রে ৫-১০ গ্রাম লবণ নিয়ে ৫০ মিলিলিটার বিশুদ্ধ পানি যোগ কর। নাড়ানি দিয়ে ভালোভাবে নাড়া দিয়ে লবণের দ্রবণ তৈরি কর। এবার একে একে লাল ও নীল লিটমাস কাগজ যোগ করে দেখো এদের রং পরিবর্তন হয় কি না।

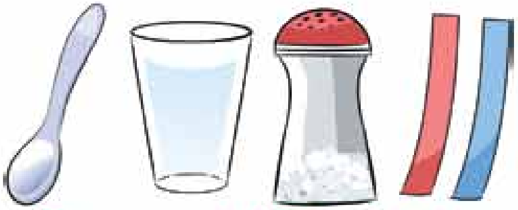

চিত্র ৭.১২: লবণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানা

লিটমাস কাগজের রং কি পরিবর্তন হলো? না, হলো না। এতে প্রমাণিত হলো যে লবণ নিরপেক্ষ পদার্থ। তবে কিছু কিছু লবণের জলীয় দ্রবণ অম্লীয় বা ক্ষারীয় হতে পারে। যেমন: বেকিং সোডা ($NaHCO_3$) বা খাবার সোডা। এটিও একটি লবণ, কিন্তু এর জলীয় দ্রবণ এসিডিক এবং এটি নীল লিটমাসকে লাল করে। এর কারণ হলো, যদিও এটি একটি লবণ কিন্তু পানিতে এটি হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে।

$$NaHCO_3 \longrightarrow Na^+ + H^+ + CO_3^{2-}$$

আবার সোডিয়াম কার্বোনেটের (Na_2CO_3) জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় এবং সেটি লাল লিটমাসকে নীল করে। এর কারণ হলো, পানিতে সোডিয়াম কার্বোনেট, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ও কার্বোনিক এসিড তৈরি করে।

$$Na_2CO_3 \longrightarrow NaOH + H_2CO_3$$

কিন্তু উৎপন্ন কার্বোনিক এসিড দুর্বল এসিড হওয়ায় তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয় না, আংশিকভাবে বিয়োজিত হয়। পক্ষান্তরে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড একটি শক্তিশালী ক্ষার বলে তা পুরোপুরি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোক্সাইড আয়ন তৈরি করে। ফলে দ্রবণে হাইড্রোক্সাইড আয়নের আধিক্য থাকে আর সে কারণেই দ্রবণটি ক্ষারীয় হয় এবং লাল লিটমাসকে নীল করে।

কার্বোনেট লবণগুলো এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য একটি লবণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও পানি তৈরি করে।

$$Na_2CO_3 + HCl \longrightarrow NaCl + H_2O + CO_2$$

$$CaCO_3 + H_2SO_4 \longrightarrow CaSO_4 + H_2O + CO_2$$

প্রায় সব লবণই কঠিন এবং গলনাংক ও স্ফুটনাংকে তাপমাত্রা অনেক বেশি হয়। বেশির ভাগ লবণই পানিতে দ্রবণীয়, তবে কিছু কিছু লবণ আছে যারা পানিতে দ্রবীভূত হয় না। যেমন: ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ($CaCO_3$), সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4), সিলভার ক্লোরাইড ($AgCl$)।

একক কাজ

কাজ: ডিমের খোসা মূলত $CaCO_3$ এবং এসিড দিয়ে এটাকে দ্রবীভূত করা সম্ভব। একটি ডিম ভিনেগারে ডুবিয়ে রাখো এবং মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে নতুন ভিনেগার দাও। দেখবে ডিমের শক্ত খোসা দ্রবীভূত হয়ে নরম তুলতুলে একটি ডিমে পরিণত হয়েছে।

৭.৪.২ লবণের ব্যবহার

লবণের ব্যবহারের কথা বলা হলে সবার আগে আমাদের খাবারের কথা চলে আসে। আমরা আমাদের খাবারে সব সময় লবণ ব্যবহার করি। লবণ ছাড়া তরকারি রান্না করলে সেটি স্বাদহীন হবে এবং আমরা অনেকেই তা খেতে পারব না। যে লবণ আমাদের খাদ্যের স্বাদ বাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তোলে, তা হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড ($NaCl$), যা সাধরণ লবণ বা টেবিল লবণ নামেও পরিচিত। তরকারি ছাড়াও আরো অনেক খাবার, যেমন: পাউরুটি, আচার, চানাচুর ইত্যাদিতে খাবার লবণ ব্যবহার করা হয়। খাবারের স্বাদ বৃদ্ধি করার জন্য আরেকটি লবণ— সোডিয়াম গ্লুটামেট ব্যবহার করা হয়, যেটি 'টেস্টিং সল্ট' নামে পরিচিত।

আমরা কাপড় কাচার যে সাবান ব্যবহার করি তা হলো মূলত সোডিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COONa$) আর শেভিং ফোম বা জেলে থাকে পটাশিয়াম স্টিয়ারেট ($C_{17}H_{35}COOK$)। কাপড় কাচার সোডা হিসেবে আমরা যে সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) ব্যবহার করি তাও একটি লবণ। আবার আমরা জীবাণুনাশক হিসেবে যে তুঁতে ($CuSO_4.5H_2O$) বা ফিটকিরি [$K_2SO_4.Al_2(SO_4)_3.24H_2O$] ব্যবহার করি, সেগুলোও লবণ।

কৃষিতে লবণের ব্যবহার

তোমরা জান যে মাটির এসিডিটি নিষ্ক্রিয় করার জন্য আমরা যে চুনাপাথর ব্যবহার করি, এই চুনাপাথর একটি লবণ। আবার আমরা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য যে সার ব্যবহার করে থাকি, তাদের বেশির ভাগই হলো লবণ। যেমন: অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট (NH_4NO_3), অ্যামোনিয়াম ফসফেট ($(NH_4)_3PO_4$), পটাশিয়াম নাইট্রেট (KNO_3) ইত্যাদি।

তুঁতে বা কপার সালফেট ($CuSO_4$) কৃষিজমিতে ব্যাকটেরিয়া ও ভাইরাস প্রতিরোধে বহুল ব্যবহৃত একটি লবণ। এটি শৈবালের উৎপাদন বন্ধে খুব কার্যকরী।

শিল্প-কারখানায় লবণ

শিল্প-কারখানায় নানা কাজে খাবার লবণ অপরিহার্য। যেমন: চামড়াশিল্পে চামড়ার ট্যানিং করতে, মাখন ও পনিরের শিল্পোৎপাদনে, কাপড় কাচার সোডা ও খাবার সোডা তৈরি করতে, সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ ইত্যাদি কাজে খাবার লবণ ব্যবহৃত হয়। বেশ কিছু লবণ যেমন: তুঁতে ($CuSO_4$), মারকিউরিক সালফেট ($HgSO_4$), সিলভার সালফেট (Ag_2SO_4) শিল্প-কারখানায় প্রভাবক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

টেক্সটাইল ও রং তৈরির কারখানায় রং ফিক্স করার কাজে লবণ প্রয়োজন হয়। ধাতুর বিশুদ্ধকরণে লবণ লাগে। রাবার প্রস্তুতিতে লবণ ব্যবহার করে রাবারকে (ল্যাটেক্স) রাবার গাছের নির্যাস থেকে আলাদা করা হয়। ঔষধ কারখানায় স্যালাইন এবং অন্যান্য ঔষধেও লবণ ব্যবহৃত হয়। ডিটারজেন্ট তৈরিতেও ফিলার হিসেবে লবণ খুবই প্রয়োজনীয়।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কৃষিতে, শিল্প-কারখানায় লবণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

দলগত কাজ

কাজ: ধাতু ও এসিড থেকে লবণ তৈরি (চিত্র ৭.১৩)।

এই পরীক্ষাটি তোমাদের স্কুলের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষকের উপস্থিতিতে করা বাঞ্ছনীয়।

প্রয়োজনীয় উপকরণ: একটি ধাতু (যেমন: Mg), পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড, একটি বিকার, চামচ, ফানেল, ১টি পাত্র, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, স্পিরিট ল্যাম্প বা বার্নার, অ্যাপ্রোন।

চিত্র ৭.১৩: ধাতু ও এসিড থেকে লবণ তৈরি

পদ্ধতি: অ্যাপ্রোণ পরে নাও। বিকারে ৫০ মিলিলিটার পাতলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও। এবার ৫-১০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম রিবন (সরু তার) বা তার গুঁড়া চামচ দিয়ে বিকারে যোগ করো। কোনো বুদবুদ উঠছে কি? না উঠলে হালকা তাপ দাও। দেখবে বুদবুদ উঠতে শুরু করবে। বুদবুদ উঠা শেষ হলে আরো কিছু

ম্যাগনেসিয়াম যোগ করো। তাপ দেয়ার পরও বুদবুদ না উঠলে বুঝতে হবে এসিড পুরোপুরি বিক্রিয়া করে ফেলেছে এবং আর কোনো এসিড বিকারে অবশিষ্ট নেই। এভাবে সমস্ত এসিড বিক্রিয়া না করা পর্যন্ত অল্প অল্প করে ম্যাগনেসিয়াম রিবন (সরু তার) বা গুঁড়া যোগ করতে থাক। এবারে ফানেল ও ফিল্টার কাগজের সাহায্যে অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম মিশ্রণ থেকে আলাদা করো। প্রাপ্ত দ্রবণকে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর বসিয়ে স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাপ দিতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না পাত্রের গায়ে লবণের ছোট ছোট দানা দেখা যায়। এবারে তাপ দেওয়া বন্ধ করে পাত্রটিকে ঠান্ডা কর। পাত্রের তলায় বা গায়ে দানাদার বস্তু কী পেয়েছ? এটি হলো ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড লবণ। এখানে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া করে $MgCl_2$ ও H_2 গ্যাস উৎপন্ন করেছে। এই হাইড্রোজেন গ্যাসের কারণেই আমরা বিকার থেকে বুদবুদ উঠতে দেখি। $MgCl_2$ পানিতে দ্রবীভূত ছিল পানি বাষ্পীভূত করে আমরা লবণটি আলাদা করতে পেরেছি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি দুর্বল এসিড?

(ক) HCl (খ) HNO_3

(গ) H_2CO_3 (ঘ) H_2SO_4

২. একটি বর্ণহীন দ্রবণে $NaOH$ মিশালে দ্রবণটি গোলাপি হয়ে গেল। দ্রবণটি কী?

(ক) মিথাইল রেড (খ) মিথাইল অরেঞ্জ

(গ) ফেনফথ্যালিন (ঘ) লিটমাস দ্রবণ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রাজির পায়ে পিঁপড়া কামড় দেওয়ায় তার পায়ে যন্ত্রণা হয় এবং পা'টি ফুলে যায়। তার মা পায়ে একটু কেরামিন লোশন লাগিয়ে দেন। এতে রাজির পায়ের জ্বালা কমে যায়।

৩. রাজির পা ফুলে যাওয়ার কারণ কোনটি?

(ক) ফরমিক এসিড (খ) অক্সালিক এসিড

(গ) এসিটিক এসিড (ঘ) নাইট্রিক এসিড

৪. পায়ে লাগানো লোশনটি:

(i) এসিডকে প্রশমিত করে

(ii) জিংক কার্বনেট জাতীয় লবণ

(iii) মেলিটিন ও অ্যাপামিন নামক এসিডিক পদার্থ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অন্তু সবসময় মাংস, তৈলাক্ত খাবার ও চকলেট খায়। একদিন অন্তুর বিরিয়ানি খাওয়ার পর তার বদহজম হয়। তার মা তাকে কোমল পানীয় খাওয়ালে সে সুস্থ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে তার বোন শৈলী সয়াদুধ, সয়ামাখন এবং ফলমূল বেশি পছন্দ করে।

(ক) আচার সংরক্ষণে কোন এসিড ব্যবহার করা হয়?

(খ) দুর্বল এসিড বলতে কী বুঝায়?

(গ) অন্তু কীভাবে সুস্থ হলো? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) অন্তু ও শৈলীর খাবারের মধ্যে কোনটি এসিডিটির কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. তুহিন সাহেবের পেটে প্রায়ই বিভিন্ন সমস্যা হয়। ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি কিছু পরীক্ষা করাতে বলেন। পরীক্ষার রিপোর্টে দেখা গেল, তার পাকস্থলীতে pH ১.৬ এবং ধমনির রক্তে pH ৭.৫। রিপোর্ট নিয়ে বাসায় ফেরার সময় সে তার দুই মাসের বাচ্চার জন্য একটি লোশন কিনতে চাইলো, যার pH ৫.৫। কিন্তু দোকানি তাকে বাচ্চার জন্য অন্যটি নিতে বললেন।

(ক) অ্যামোনিয়াম সালফেটের সংকেত লেখ?

(খ) ভিনেগারকে কেন দুর্বল এসিড বলা হয়?

(গ) দোকানি তাকে বাচ্চার লোশনটি নিতে নিষেধ করলেন কেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) তুহিন সাহেবের পাকস্থলীতে এবং রক্তে এসিড ও ক্ষারের পরিমাণ যথাযথ আছে কি? মতামত দাও।

অষ্টম অধ্যায়

আমাদের সম্পদ

মাটি আমাদের অতি প্রয়োজনীয় একটি প্রাকৃতিক সম্পদ। মাটিতে গাছপালা জন্মায়, ফসল উৎপন্ন হয়। আমাদের দায়িত্ব এই প্রাকৃতিক সম্পদকে নানা ধরনের দূষণ থেকে রক্ষা করা। একই সাথে মাটি আমাদের তেল, গ্যাস, কয়লাসহ নানা রকম খনিজ পদার্থের উৎস। তাই আমরা একদিকে যেরকম এই খনিজ উত্তোলন করে দেশকে সমৃদ্ধ করব, অন্যদিকে লক্ষ রাখব এই প্রক্রিয়ায় আমাদের মূল্যবান সম্পদটির যেন অপচয় না হয়।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- মাটি ও ভূমির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার মাটির মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- মাটির গঠন ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটির pH মান জানার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- মাটি দূষণের কারণ, ফলাফল এবং মাটি সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- মাটিতে অবস্থিত খনিজের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- খনিজের ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- প্রাকৃতিক জ্বালানির গঠন, প্রক্রিয়াকরণ, ব্যবহার এবং সংরক্ষণের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- শিক্ষার্থীর এলাকায় মাটিদূষণের কারণ ও ফলাফল অনুসন্ধান করতে পারব।
- pH পেপার দিয়ে মাটির pH নির্ণয় অথবা লিটমাস পেপার দিয়ে মাটির অম্লত্ব ও ক্ষারত্ব নির্ণয় করতে পারব।
- সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হব ও অন্যদের সচেতন করব।

৮.১ মাটি

৮.১.১ মাটির গঠন

তোমরা কি বলতে পার মাটি আমাদের কী কী কাজে লাগে?

প্রথমত: মাটিতে গাছপালা জন্মায়, আর সেই গাছপালা থেকেই আমরা খাদ্যশস্য পাই। অক্সিজেন ছাড়া আমরা এক মিনিটও বেঁচে থাকতে পারব না, সেই অত্যাবশ্যকীয় অক্সিজেন গ্যাসও আমরা পাই সেই গাছপালা থেকে। মাটি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারত না, আমরা খাদ্যশস্য আর অক্সিজেন পেতাম না। দ্বিতীয়ত: মাটিতেই আমরা ঘরবাড়ি, অফিস, রাস্তাঘাট তৈরি করি। শুধু তা-ই নয়, মাটির নিচ থেকে জীবনধারণের জন্য দরকারি পানির বড় একটি অংশ আসে। এছাড়াও আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অতি প্রয়োজনীয় জ্বালানির (যেমন: তেল, গ্যাস, কয়লা) সিংহভাগ আমরা আহরণ করি মাটির নিচ থেকে। একইভাবে সোনা, রুপা, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহাসহ নানা রকম খনিজ পদার্থ এই মাটিরই অংশ। এখন আমরা আমাদের অতি প্রয়োজনীয় এই মাটির গঠন সম্পর্কে জেনে নিই।

মাটি হলো নানারকম জৈব আর অজৈব রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। বিভিন্ন এলাকার মাটির গঠন ভিন্ন হয়। মাটিতে বিদ্যমান পদার্থগুলোকে সাধারণত চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হলো খনিজ পদার্থ, জৈব পদার্থ, বায়বীয় পদার্থ আর পানি। তবে এসব পদার্থ বেশিরভাগ সময়েই একটি আরেকটির সাথে মিশে একধরনের জটিল মিশ্রণ তৈরি করে। তাই একটিকে আরেকটি থেকে সহজে পৃথক করা যায় না। মাটিতে বিদ্যমান খনিজ পদার্থগুলো অজৈব যৌগ হয়।

মাটিতে বিদ্যমান প্রধান প্রধান খনিজ পদার্থ বা অজৈব পদার্থগুলো হলো ক্যালসিয়াম (Ca), অ্যালুমিনিয়াম (Al), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), লোহা (Fe), সিলিকন (Si), পটাশিয়াম (K) ও সোডিয়াম (Na), অল্প পরিমাণে ম্যাংগানিজ (Mn), কপার (Cu), জিংক (Zn), কোবাল্ট (Co), বোরন (B), আয়োডিন (I) এবং ফ্লোরিন (F)। এছাড়া মাটিতে কার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড, নাইট্রেট এবং ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), পটাসিয়াম (K), সোডিয়াম (Na) ইত্যাদি ধাতুর জৈব লবণও পাওয়া যায়।

মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ হিউমাস (Humus) নামে পরিচিত। হিউমাস আসলে অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, চিনি, অ্যালকোহল, চর্বি, তেল, লিগনিন, ট্যানিন এবং অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগ নিয়ে গঠিত একটি বিশেষ জটিল পদার্থ। এটি দেখতে অনেকটা কালচে রঙের হয়। এই হিউমাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা আর প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে।

আয়তন অনুসারে মাটিতে বিদ্যমান পদার্থগুলো ৮.০১ চিত্রে দেখানো হলো:

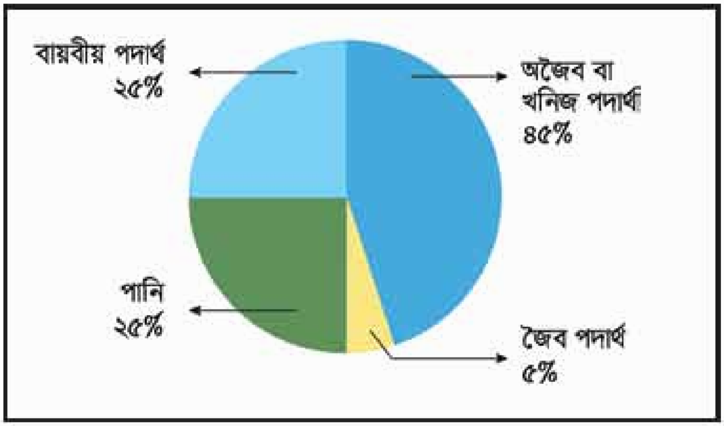

চিত্র ৮.০১: মাটির গঠন

মাটিতে বিদ্যমান পানির ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে গাছপালার জন্য। তোমাদের কি মনে প্রশ্ন জেগেছে যে মাটিতে পানি কোথায় আর কীভাবে থাকে? মাটিতে পানি থাকে মাটির কণার মাঝে থাকা ফাঁকা জায়গাগুলোতে বা রন্ধ্রে। এই রন্ধ্রের আকার-আকৃতির উপর নির্ভর করে মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা। তোমরা বল দেখি বালি আর কাদামাটির মধ্যে কোনটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বেশি? নিঃসন্দেহে কাদা মাটির। এর কারণ হলো, কাদামাটির বেলায় মাটির কণাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে থাকা রন্ধ্র খুব সূক্ষ্ম, যা পানি ধরে রাখে। অন্যদিকে বালি মাটির বেলায় রন্ধ্রগুলো বড় বড়, যে কারণে পানি আটকে থাকে না বা ধরে রাখতে পারে না।

ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্র ছাড়াও মাটির কণায় শোষিত অবস্থায়ও পানি থাকতে পারে। মাটিতে থাকা হিউমাস পানি শোষণ করে রাখতে পারে। হিউমাসে শোষিত পানি সহজে গাছপালায় স্থানান্তরিত হয় না।

মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হতো? মাটিতে পানি না থাকলে কী সমস্যা হতো তার বড় প্রমাণ হলো মরুভূমি যেখানে দু-একটি বিশেষ প্রজাতির গাছ ছাড়া আর কিছুই জন্মায় না। অর্থাৎ মাটিতে পানি না থাকলে গাছপালা জন্মাতে পারত না এবং জন্মালেও বেড়ে উঠতে পারত না। তোমরা জান যে উদ্ভিদকোষের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো প্রোটোপ্লাজম, আর এই প্রোটোপ্লাজমের শতকরা ৮৫-৯৫ ভাগই হলো পানি, যা আসে মাটি থেকে। গাছ পাতায় থাকা স্টোমাটা (Stomata) দিয়ে কিছু পানি গ্রহণ করলেও বেশির ভাগই গাছের মূলের মাধ্যমে মাটি থেকে আসে। মাটি থেকে পাওয়া পানির সাহায্যেই গাছপালা সালোকসংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজেদের খাবার তৈরি করে আর আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়। গাছপালা তার প্রয়োজনীয় পুষ্টি (যেমন: খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন, ফসফরাস ইত্যাদি) মাটি থেকে সরাসরি গ্রহণ করতে পারে না। এগুলো গ্রহণ করে মূলের সাহায্যে এবং এক্ষেত্রে পানি মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। কাজেই পানি না থাকলে উদ্ভিদ মাটি থেকে এসব পুষ্টিও গ্রহণ করতে পারত না, ফলে

এদের বেড়ে ওঠাও সম্ভব হতো না।

এবারে আসা যাক মাটিতে থাকা বায়বীয় পদার্থের প্রসঙ্গে। মাটির কণার মধ্যকার ফাঁকা স্থান বা রন্ধ্রে যেমন পানি থাকতে পারে, তেমনি বায়বীয় পদার্থ বা বাতাসও থাকতে পারে। মাটিতে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন আর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস থাকে।

মজার ব্যাপার হলো, মাটিতে থাকা গ্যাসের সাথে কিন্তু সবসময় বায়ুমণ্ডলে থাকা গ্যাসের বিনিময় হতে থাকে। অর্থাৎ বায়ুমণ্ডলের গ্যাস মাটিতে যায় এবং মাটিতে থাকা গ্যাস বায়ুমণ্ডলে চলে আসে। এই প্রক্রিয়াকে মাটির বায়ুবায়ন (Soil Aeration) বলে। এখন প্রশ্ন হলো, মাটিতে থাকা গ্যাস কি কোনো কাজে লাগে? হ্যাঁ, অবশ্যই এটি কাজে লাগে। মাটিতে নানারকম উপকারী অণুজীব (Microorganism) থাকে। এর মধ্যে কিছু অণুজীবের জন্ম আর বেড়ে ওঠার জন্য অক্সিজেন অত্যাবশ্যক, অক্সিজেন না থাকলে এরা বাঁচতে পারে না। আবার অক্সিজেন পানিতে অদ্রবণীয় অনেক খনিজ পদার্থকে ভেঙে দ্রবণীয়

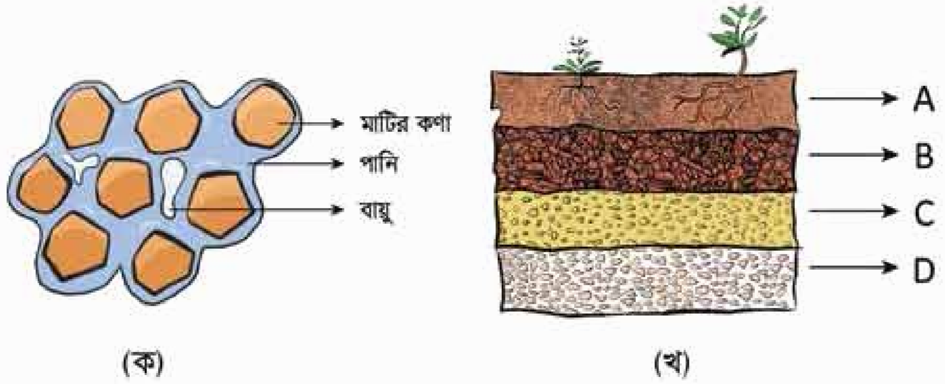

চিত্র ৮.০২: মাটির গঠন (ক) ও মাটির বিভিন্ন স্তর (খ)

পদার্থে পরিণত করে, যা পরে মাটিতে থাকা পানিতে দ্রবীভূত হয় এবং পরে উদ্ভিদে স্থানান্তরিত হয়। ৮.০২ চিত্রে মাটির কণা, পানি আর বাতাস কীভাবে থাকে সেটি দেখানো হলো।

আমরা যদি কোনো একটি স্থানের মাটির গভীরে যেতে থাকি, তাহলে কী পাব? সব জায়গায় কি মাটির গঠন একই হবে, নাকি ভিন্ন হবে? নিচের দিকে মাটির গঠন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে মাটি ৪টি সমান্তরাল স্তরে বিভক্ত। প্রতিটি স্তরকে দিগবলয় বা হরাইজোন (Horizon) বলে। সবার উপরে যে স্তরটি থাকে, তাকে বলে হরাইজোন A (Horizon A) বা টপ সয়েল (Top Soil)। এই স্তরেই উদ্ভিদ আর প্রাণীর মরা দেহে পচন শুরু হয় এবং উৎপাদিত পদার্থ, বিশেষ করে হিউমাসসহ অন্যান্য জৈব পদার্থ এই স্তরেই থাকে। এই স্তরে সাধারণত খনিজ পদার্থ থাকে না, সেগুলো পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে নিচের স্তরে চলে যায়। প্রথম স্তরের মাটি সাধারণত বালুময় হয়। মাটির দ্বিতীয় স্তরটিকে সাবসয়েল (Sub Soil) বা হরাইজোন B (Horizon B) বলে। এ স্তরে সামান্য পরিমাণ হিউমাস থাকে। তবে

এই স্তর ওপরের স্তর থেকে আসা খনিজ পদার্থে ভরা থাকে। মাটির তৃতীয় স্তরটিকে হরাইজোন C (Horizon C) বলে। মাটি তৈরি হয় শিলা থেকে, যেখানে জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত। মূল শিলা আস্তে আস্তে নরম হয়ে এক পর্যায়ে মাটির কণায় পরিণত হয়। মূল শিলা থেকে পরিবর্তিত হয়ে প্রথমে যে নরম শিলা তৈরি হয়, সেগুলো হরাইজোন C- তে থাকে। এই নরম শিলা মূল শিলা থেকে নরম কিন্তু মাটির কণা থেকে অনেক গুণ শক্ত। এই নরম শিলাই পরবর্তীতে পরিবর্তিত হয়ে মাটির কণায় পরিণত হয়। এই স্তরের নিচে থাকে Horizon D বা মূল শিলা যা খুবই শক্ত। ৮.০৩ চিত্রে মাটির এই উল্লম্ব গঠন দেখানো হলো।

৮.১.২ মাটির প্রকারভেদ

তোমরা বলতো, সব জায়গার মাটি কি এক রকম? না, একেক জায়গার মাটি একেক রকম। মাটির গঠন, বর্ণ, পানি ধারণক্ষমতা— এসব বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে মাটিকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এগুলো হলো বালু মাটি, পলি মাটি, কাদামাটি এবং দো-আঁশ মাটি। এবার আমরা বিভিন্ন প্রকার মাটির বৈশিষ্ট্যগুলো জেনে নিই।

বালু মাটি

বালু মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে এদের পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম। এটি তোমরা নিজেরাই পরীক্ষা করে দেখতে পারবে।

একক কাজ

কাজ: অল্প পরিমাণ বালু মাটি নিয়ে তাতে একটু পানি দাও। এবার হাতের তালুতে নিয়ে এই বালু মাটি দিয়ে গোল গোল ছোট মাটির বলের মতো বানাতে পার কি না দেখো। পারবে না, কারণ বালুতে মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা নেই বলে পানি যোগ করলেও বালু মাটি তা শোষণ করতে পারে না। যদি পারত তাহলে পানি মাটির কণার গায়ে লেগে থাকত আর তোমরা খুব সহজেই বলের মতো মাটির গুটি বানাতে পারতে।

বালু মাটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যে এতে বিদ্যমান মাটির কণার আকার সবচেয়ে বড়, যার ফলে কণাগুলোর মাঝে ফাঁকা জায়গা অনেক বেশি থাকে, তাই অনেক বেশি বায়বায়ন হয়। বালু মাটি তোমরা হাতে নিলে দেখবে যে এরা দানাযুক্ত। বালু মাটিতে খুব ছোট ছোট শিলা আর খনিজ পদার্থও থাকে। বালু মাটিতে হিউমাস থাকলে এটি চাষাবাদের জন্য সহজসাধ্য, কিন্তু যেহেতু এই মাটির পানি ধারণক্ষমতা কম, তাই পানি দিলে তা দ্রুত নিষ্কাশিত হয়ে যায় এবং গ্রীষ্মকালে, বিশেষ করে উদ্ভিদে পানির স্বল্পতা

দেখা যায়। তাই যে সকল ফসলাদিতে অনেক বেশি পানি লাগে, সেগুলো বালু মাটিতে ভালো হয় না। তবে যখন প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয়, যার কারণে জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, সে সকল ক্ষেত্রে বালু মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী হয়ে উঠতে পারে। কারণ, বালু মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না, যার ফলে গাছের শিকড় পঁচে না। জলাবদ্ধতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে যে এতে গাছের শিকড়ে পঁচন ধরে, যার ফলে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়।

পলি মাটি

পলি মাটির পানি ধারণক্ষমতা বালু মাটির চেয়ে বেশি। পলি মাটি চেনার উপায় কী? সামান্য পানিযুক্ত মাটি নিয়ে আঙুল দিয়ে ঘষলে যদি মসৃণ অনুভূত হয়, তাহলে বুঝতে হবে এটি পলি মাটি। পলি মাটিতে উপস্থিত পানির জন্য এটি হাতের সাথে লেগে থাকবে, যা বালু মাটির বেলায় ঘটে না। পলি মাটি খুবই উর্বর হয় আর মাটির কণাগুলো বালু মাটির কণার তুলনায় আকারেও ছোট হয়। জমিতে পলি পড়ার কথা তোমরা সবাই জান। পলি মাটির কণাগুলো ছোট হওয়ায় এরা পানিতে ভাসমান আকারে থাকে এবং একপর্যায়ে পানির নিচে থাকা জমিতে পলির আকারে জমা পড়ে। পলি মাটিতে জৈব পদার্থ ও খনিজ পদার্থ (যেমন: কোয়ার্টজ) থাকে। বালু মাটির মতো পলি মাটির কণাগুলোও দানাদার হয় এবং এতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান বেশি থাকে।

কাদা মাটি

তোমরা কাদা মাটি দেখেছ? এই মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা প্রচুর পানি ধারণ করতে পারে। এরা অনেকটা আঠালো ধরনের হয় এবং হাত দিয়ে ধরলে হাতে লেগে থাকে। এই মাটিতে মাটির কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হয়, ফলে কণাগুলোর মধ্যকার রন্ধ্র খুব ছোট আর সরু হয়। কাদা মাটি থেকে সহজে পানি নিষ্কাশিত হয় না। এই জাতীয় মাটিতে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তাই ফসলাদি বা উদ্ভিদের মূলে পচন সৃষ্টি করে। কাদা মাটিতে ফসল চাষের জন্য জৈব সার দেওয়া অত্যাবশ্যকীয় হয়ে থাকে। এই মাটিতে খনিজ পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। এই মাটি দিয়ে ঘর সাজানোর তৈজসপত্র, এমনকি গহনাও তৈরি করা হয়।

দো-আঁশ মাটি

এই মাটি বালু, পলি আর কাদা মাটির সমন্বয়েই তৈরি হয়। দো-আঁশ মাটিতে থাকা বালু, পলি আর কাদা মাটির অনুপাতের উপর নির্ভর করে দো-আঁশ মাটির ধরন কেমন হবে। দো-আঁশ মাটির একদিকে যেমন পানি ধারণক্ষমতা ভালো আবার প্রয়োজনের সময় পানি দ্রুত নিষ্কাশনও হতে পারে। তাই ফসল চাষাবাদের জন্য দো-আঁশ মাটি খুবই উপযোগী।

উপরে উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়াও আরো দুই প্রকারের মাটি পাওয়া যায়। একটি হলো পিটি মাটি (Peaty Soil), অন্যটি খড়িমাটি (Chalky Soil)। পিটি মাটি তৈরি হয় মূলত জৈব পদার্থ থেকে; আর

২০২৫

সে কারণে এতে অন্য সব মাটি থেকে জৈব পদার্থের পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। সাধারণত ডোবা আর আর্দ্র এলাকায় এই মাটি পাওয়া যায়। এই মাটিতে পুষ্টিকর উপাদান কম থাকে, তাই ফসল উৎপাদনের জন্য এটি তেমন উপযোগী নয়। অন্যদিকে খড়িমাটি ক্ষারীয় হয় এবং এতে অনেক পাথর থাকে। এই মাটি সাধারণত দ্রুত শুকিয়ে যায় এবং সে কারণে ফসল উৎপাদনের জন্য খুব একটা উপযোগী নয় বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে। এছাড়া খড়িমাটিতে গাছপালার জন্য অত্যাবশ্যকীয় আয়রন আর ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহে ঘাটতি থাকে।

৮.১.৩ মাটির pH

ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ একটি মানদণ্ড হলো এর pH। মাটির pH মান জানা থাকলে এটি এসিডিক, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ সেটি বোঝা যায়। বেশির ভাগ ফসলের বেলাতেই মাটির pH নিরপেক্ষ হলে অর্থাৎ এর মান ৭ বা তার খুব কাছাকাছি হলে সর্বোচ্চ উৎপাদন পাওয়া যায়। তাই কোনো একটি জমির মাটি পরীক্ষা করে যদি দেখা যায় এর pH ৭-এর চেয়ে বেশ কম বা অনেক বেশি তাহলে এর pH ৭ করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। তবে কিছু কিছু ফসল আছে, যেমন: আলু এবং গম— এরা মাটির pH ৫-৬ হলে সর্বোচ্চ উৎপাদন দেয়। অন্যদিকে কিছু ফসল যেমন: যব, মাটির pH ৮ হলে ভালো উৎপাদন হয়। তাহলে বুঝতেই পারছ ভালো ফলনের জন্য মাটির pH অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং মাটির pH অনুযায়ী ফসল নির্বাচন করা বেশ জরুরি।

৮.১.৪ মাটির দূষণের কারণ ও ফলাফল

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমরা পানিদূষণ সম্পর্কে জেনেছ। মাটিদূষণ আর পানিদূষণ একটির সাথে আরেকটি সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ পানিদূষণের জন্য যেসব কারণ দায়ী, সেগুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাটি দূষণেরও কারণ। এখন তাহলে আমরা মাটিদূষণের নির্দিষ্ট কিছু কারণ জেনে নিই।

শিল্প-কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য

তোমরা কি জান, আমাদের দেশে শিল্প-কারখানা ও গৃহস্থালির বর্জ্য কী করা হয়? বেশির ভাগ সময় শিল্প-কারখানা ও শহরাঞ্চলের গৃহস্থালির বর্জ্য মাটির নিচে গর্ত করে পুঁতে ফেলা হয় বা কখনো কখনো একটি খোলা জায়গা বা ডাস্টবিনে জড়ো করে রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে প্রায় সব সময়েই বাড়ির আশপাশেই জঞ্জাল ফেলা হয়। এসব বর্জ্যের পচনশীল দ্রব্যগুলো জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে পচতে থাকে এবং জৈব সারে পরিণত হয়।

তোমরা কি ধারণা করতে পার এই জাতীয় দূষণের ফলাফল কেমন হতে পারে?

যেহেতু শিল্প-কারখানার বর্জ্যে মারকারি, জিংক, আর্সেনিক ইত্যাদি থেকে শুরু করে এসিড, ক্ষার, লবণ, কীটনাশক—এ ধরনের হাজারো রকমের মারাত্মক ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, তাই এই জাতীয়

দূষণের প্রভাবও হয় বহুমাত্রিক। যেমন: মারকারি আর অন্যান্য ধাতব পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান উপকারী অণুজীবগুলোকে মেরে ফেলে, যার ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়। আবার মাত্রাতিরিক্ত লবণ, এসিড বা ক্ষার গাছপালা আর ফসলের ক্ষতি করে। এই জাতীয় বর্জ্যে থাকা প্রোটিন বা অ্যামিনো এসিড ব্যাকটেরিয়ার দ্বারা ভেঙে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস, সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস কিংবা ফসফরাসের অক্সাইড তৈরি করে, যার কারণে মাটি দূষিত হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বড় চিন্তার কারণ হচ্ছে, এ ধরনের দূষণের ফলে ক্ষতিকর পদার্থ মাটি থেকে খাদ্যে এবং খাদ্য থেকে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীদেহে প্রবেশ করে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হতে পারে। শুধু তা-ই নয়, এই জাতীয় দূষণের ফলে মাটির জৈব রাসায়নিক ধর্মের পরিবর্তন ঘটতে পারে, যেটি ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিঃসরণ

পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র বা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কারখানা থেকে দুর্ঘটনা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে বের হয়ে আসা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে মাটির মারাত্মক দূষণ হতে পারে। রেডন (Rn), রেডিয়াম (Ra), থোরিয়াম (Th), সিজিয়াম (Cs), ইউরেনিয়াম (U) ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় পদার্থ শুধু যে মাটির উর্বরতাই নষ্ট করে তা নয়, এরা প্রাণীদেহের ত্বক ও ফুসফুসের ক্যান্সারের কারণ হতে পারে। উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয়তার ফলে গাছপালাও মরে যায়। এছাড়া অন্যান্য ক্ষতিকর পদার্থের মতো এরাও খাদ্যশৃংখলের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবেশ করে ভয়াবহ রোগ সৃষ্টি করে।

তোমরা কি চেরোনোবিল দুর্ঘটনার কথা জান?

দলগত কাজ

কাজ: চেরোনোবিল দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করে এর ভয়াবহতা নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করো।

অতিরিক্ত পলি থেকে মাটিদূষণ

নদীভাঙনের কথা তোমরা সবাই জান। নদী ভাঙনের ফলে নদীর পাড় ভাঙা মাটি বা অন্য কোনোভাবে সৃষ্ট মাটি কিংবা পানিতে অদ্রবণীয় পদার্থ পানির সাথে প্রবাহিত হয়ে একপর্যায়ে কোথাও না কোথাও তলানি আকারে জমা পড়ে। এগুলো কখনো নদ-নদী, খাল-বিল ইত্যাদির তলদেশে জমা হতে পারে আবার কখনো ফসলি জমির উপর জমা হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এই সমস্ত তলানিতে নানারকম ক্ষতিকর পদার্থ থাকতে পারে। এই জাতীয় তলানি ফসলি জমির ওপর পড়লে সেটি জমির উপরিভাগ, যা ফসল উৎপাদনে মূল ভূমিকা পালন করে, তার ওপর একটা আস্তরণ তৈরি করে। ফলে এই জমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। এসব পদার্থ নদীগর্ভে জমা হলে কী হয় তা তোমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইতিমধ্যে জেনে গেছ।

খনিজ পদার্থ আহরণের দ্বারা মাটির দূষণ

খনি থেকে মূল্যবান খনিজ পদার্থ বা তেল, গ্যাস ও কয়লার মতো প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের সময় প্রচুর মাটি খনন করে সরিয়ে ফেলতে হয়। এতে যেমন বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ফসলহানি ঘটে, ঠিক তেমনি মাটিদূষণের ফলে মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি অনেক সময় এর ফলে সৃষ্ট মাটি ক্ষয়ের কারণে তা আশপাশের জলাভূমি ভরাট করে মারাত্মক পরিবেশ বিপর্যয় ঘটাতে পারে।

অনেক খনিই বন এলাকায় থাকে, যে কারণে খনি খননের কারণে বনজ সম্পদ ধ্বংস হওয়ার পাশাপাশি পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে। যার ফলে ঐ সকল স্থানে মাটিদূষণ ঘটে। এছাড়া খনিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা (যা সচরাচর ঘটেই চলেছে) ঘটলে তা আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মাটির উৎপাদনশীলতা নষ্ট করে দিতে পারে।

এছাড়া অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছা ধ্বংসকারী দ্রব্যাদি, গাছপালার অবশিষ্টাংশ, প্রাণিজ বর্জ্য, মাটির ক্ষয় এমনকি কৃষিকাজে উন্নত প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারের ফলেও মাটিদূষণ হয় এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

মানুষের মলমূত্র, পাখির বিষ্ঠা বা অন্যান্য প্রাণীর মলমূত্র থেকে কি মাটিদূষণ হতে পারে? হ্যাঁ, অবশ্যই পারে। কারণ, এসব মলমূত্রে রোগ সৃষ্টিকারী নানারকম জীবাণু থাকে, যারা মাটিতে বেড়ে উঠে এবং পরবর্তী সময়ে মানুষের শরীরে ছড়িয়ে পড়ে রোগ সৃষ্টি করে।

৮.১.৫ মাটি সংরক্ষণ কৌশল

মাটি আমাদের একটি অতি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। আমাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসাসহ অন্যান্য যে সকল চাহিদা রয়েছে, তার সবগুলোই প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে মাটির উপর নির্ভরশীল। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় এই সম্পদটি নানাভাবে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এবং এর উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। ঝোড়ো বাতাস মাটি উড়িয়ে নেয়, ভারী বৃষ্টিপাত, নদীর পানির স্রোত বা নদীর ভাঙন ইত্যাদি নানা কারণে মাটি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মাটি ক্ষয় হলে এর উর্বরতা ধ্বংসের পাশাপাশি মাটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আমরা গাছপালা ও বনজঙ্গল কেটে, পাহাড় কেটে শিল্প-কারখানা স্থাপন করে (যেমন: ইটভাটা) প্রতিনিয়ত মাটির ক্ষয়সাধন করে চলেছি। তোমরা সবাই জান যে সাম্প্রতিক কালে পাহাড়ধসে চট্টগ্রাম এলাকায় অনেক প্রাণহানি ঘটছে, যার মূল কারণ পাহাড় কেটে মাটির ক্ষয়সাধন। এই ক্ষয় বন্ধ না হলে এটি আমাদের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হতে পারে।

ক্ষয়রোধ করে মাটি সংরক্ষণ

মাটি সংরক্ষণের সবচেয়ে কার্যকর এবং সহজ কৌশল হলো মাটিতে বেশি করে গাছ লাগানো। মাটিতে তৃণগুল্ম ও দূর্বা কিংবা অন্য যেকোনো ঘাসজাতীয় উদ্ভিদ এবং অন্যান্য গাছপালা থাকলে ভারী বৃষ্টিপাতও

মাটির ক্ষয়সাধন করতে পারে না। গাছের শিকড় মাটির ভিতরে থাকায় সেটি মাটিকে দৃঢ়ভাবে আটকে রাখে এবং সরে যেতে দেয় না। জমিতে ফসল তোলার পর গোড়া উপড়ে না তুলে জমিতে রেখে দিলে একদিকে যেমন জমির উর্বরতা বাড়ে, অন্যদিকে তেমনি জমির ক্ষয়ও কমে যায়।

বৃষ্টি হলে সাধারণত ঢালু জায়গায় মাটির ক্ষয় বেশি হয়। কাজেই ঢালু জায়গা দিয়ে যেন পানি প্রবাহিত না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা, তবে এই কাজ সবসময় খুব সহজ নয়। এরকম ক্ষেত্রে ঢালু জায়গায় ঘাস, ধনচে বা কলমিজাতীয় গাছ লাগিয়ে মাটির ক্ষয়রোধ করা যায়। গ্রাম এলাকায় অনেকেই ঘাস কেটে বা তুলে গবাদিপশুকে খাওয়ায়। এক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে ঘাস মাটি থেকে তুলে ফেললে সেটি মাটির ক্ষয়সাধন করে। তাই ঘাস কাটার সময় একেবারে মাটি ঘেঁষে কাটা উচিত নয়। এ ব্যাপারে মানুষকে সচেতন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় গরু, ছাগল, ভেড়া—এগুলো মাঠে ছেড়ে দেওয়া হয় ঘাস খাওয়ার জন্য। এরা যেন মাটির উপরে থাকা ঘাসের আচ্ছাদন সমূলে খেয়ে না ফেলে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। বনের গাছ কাটার ফলে অনেক সময় বিস্তীর্ণ এলাকা গাছশূন্য এবং অনাচ্ছাদিত হয়ে পড়ে। কাজেই নতুন গাছ লাগানোর ব্যবস্থা না করে বনের গাছ কখনোই কাটা ঠিক নয়। অন্যথায় কোনোভাবে মাটির ক্ষয়সাধন রোধ করা যাবে না।

রাসায়নিক সারের পরিবর্তে যতটুকু সম্ভব জৈব সার ব্যবহার করা উচিত, কারণ জৈব সারে থাকা উপাদান ও হিউমাস পানি শোষণ করতে পারে। ফলে অল্প বৃষ্টিপাতে মাটির ক্ষয় হয় না। এছাড়া রাসায়নিক সার মাটিতে বসবাসকারী অনেক উপকারী পোকামাকড় অণুজীব ধ্বংস করে দেয়, যার ফলে মাটির উর্বরতাও নষ্ট হয়ে যায়। একই জমিতে বারবার একই ফসল চাষ করলেও উর্বরতা নষ্ট হয়। তাই একই জমিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করা উচিত।

নদীভাঙনের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় বন্ধ করা

নদীর পাড়ে কলমি, ধনচে ইত্যাদি গাছ লাগানো যায়। নদী অত্যধিক খরস্রোতা হলে নদীর পাড়ে বালুর বস্তা ফেলে বা কংক্রিটের তৈরি ব্লক দিয়ে ভাঙন ঠেকানো ছাড়া অন্য কোনো উপায় থাকে না।

৮.২ মাটিতে অবস্থিত সাধারণ খনিজ

আমরা যে নানারকম খনিজ লবণ, পেন্সিলের সিস, ট্যালকম পাউডার, চীনা মাটির থালা-বাসন এরকম হাজারো জিনিস ব্যবহার করি, তার অধিকাংশই মাটি কিংবা শিলা থেকে পাওয়া খনিজ পদার্থ। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থই কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়। এদের নির্দিষ্ট রাসায়নিক সংযুক্তি থাকে। এখন পর্যন্ত প্রকৃতিতে প্রায় ২৫০০ রকমের খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে। খনিজ পদার্থ ধাতব কিংবা অধাতব দুটোই হতে পারে। ধাতব খনিজ পদার্থের মাঝে অন্যতম হলো লোহা (Fe), তামা (Cu), সোনা (Au) কিংবা রুপা (Ag)। অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে রয়েছে কোয়ার্টজ (Quartz), মাইকা (Mica) কিংবা খনিজ লবণ।

কয়লা, গ্যাস, পেট্রোল এসব কী খনিজ পদার্থ? হ্যাঁ, অবশ্যই এগুলোও খনিজ পদার্থ। তবে এদেরকে জৈব খনিজ পদার্থ বলে। এদের সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী পাঠে বিস্তারিত জানতে পারবে।

টেবিল ৮.১: কয়েকটি সাধারণ খনিজ পদার্থের ব্যবহার

ক্রমিক নং	খনিজ পদার্থ	ব্যবহার
০১	ম্যাগনেটাইট (Fe_3O_4)	লোহা তৈরিতে
০২	চুনাপাথর ($CaCO_3$)	ঘরবাড়ি তৈরিতে এবং সিমেন্ট, সোডা, গ্লাস, লোহা ও স্টিল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া মাটি এসিডিক হলেও এটি ব্যবহার করে মাটিকে প্রশমন করা হয়।
০৩	কোয়ার্টজ (SiO_2)	কাচ, সিরিচ কাগজ, রেডিও বা ঘড়ি তৈরিতে।
০৪	সিলভার বা রুপা (Ag)	গহনা ও ধাতব মুদ্রা তৈরিতে।
০৫	মাইকা (Mica)	বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ নিরোধক হিসেবে।
০৬	জিপসাম ($CaSO_4.2H_2O$)	সিমেন্ট ও প্লাস্টার অব প্যারিস তৈরির কাঁচামাল।
০৭	ধাতব পাইরাইটস	সালফার এবং নানা রকম ধাতু তৈরিতে।
০৮	সোনা ও হীরা	গহনা তৈরিতে।
০৯	গ্যাস, কয়লা, পেট্রোল	জ্বালানি হিসেবে, রান্নার কাজে, গাড়ি ও শিল্পকারখানায়।

খনিজ পদার্থের ভৌত ধর্ম

খনিজ পদার্থগুলো সাধারণত দানাদার বা কেলাসাকার হয়। অনেক খনিজ পদার্থ আছে, যাদের রাসায়নিক সংযুক্তি একই কিন্তু তাদের কেলাস গঠন ভিন্ন যে কারণে তাদের ভৌত ধর্মও ভিন্ন। যেমন- গ্রাফাইট ও ডায়মন্ড। যদিও দুটি পদার্থই কার্বন দিয়ে গঠিত, কিন্তু গঠনের ভিন্নতার কারণে গ্রাফাইট (যা আমরা পেন্সিলে ব্যবহার করি) নরম হয় কিন্তু ডায়মন্ড বা হীরা এখন পর্যন্ত জানা খনিজের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন খনিজ পদার্থ।

খনিজ পদার্থগুলো সাধারণত কঠিন হয় এবং একেকটি খনিজের কাঠিন্য একেক রকম। বেশি কঠিন খনিজ খুব সহজেই কম কঠিন খনিজে দাগ কাটতে পারে; কিন্তু কম কঠিন খনিজ বেশি কঠিন খনিজে দাগ কাটতে পারে না। কাঠিন্য অনুযায়ী সবচেয়ে নরম খনিজ হলো ট্যালক (Talc), যা দিয়ে ট্যালকাম পাউডার তৈরি হয় এবং আগেই বলা হয়েছে, সবচেয়ে কঠিন খনিজ হলো হীরা বা ডায়মন্ড। খনিজ পদার্থের নির্দিষ্ট দ্যুতি থাকে। ধাতব খনিজ যেমন: পাইরাইটস ধাতুর মতোই দ্যুতি প্রদর্শন করে অর্থাৎ অনেকটা ধাতুর মতোই চকচক করে। খনিজ হীরা অধাতু এবং এটিকে দেখে সাধারণ কাচের মতো মনে

হতে পারে কিন্তু এটি কাটার পর এর দ্যুতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে, যেগুলো খুব স্বচ্ছ এবং এর মধ্যে আলো প্রবেশ করতে পারে। যেমন: কোয়ার্টজ বা সিলিকা, আবার কিছু কিছু খনিজ পদার্থ আছে, যার মধ্য দিয়ে আলো প্রবেশ করলেও এর মধ্য দিয়ে কোনো বস্তু দেখা যায় না, যেমন: অ্যারাগনাইট। অন্যদিকে এমন খনিজও আছে, যার মধ্য দিয়ে মোটেই আলো প্রবেশ করতে পারে না, যেমন: ক্যালসাইট (Calcite) বা চুনাপাথর। সাধারণত প্রতিটি খনিজ পদার্থেরই একটা নির্দিষ্ট বর্ণ আছে, যা দিয়ে একটি থেকে আরেকটিকে আলাদা করা যায়।

বেশির ভাগ খনিজ পদার্থে ফাটল থাকে, যা দেখে অনুমান করা যায় এটি ভাঙলে কী ধরনের আকার-আকৃতিবিশিষ্ট ছোট ছোট টুকরা পাওয়া যাবে। বেশির ভাগ খনিজ পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৫-৩.৫-এর মধ্যে হয়, তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে।

রাসায়নিক ধর্ম: খনিজ পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম নির্ভর করে এতে বিদ্যমান উপাদানের উপর।

৮.৩ বাংলাদেশে প্রাকৃতিক জ্বালানির উৎস

বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানির মধ্যে অন্যতম হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম। এছাড়া রান্নার কাজে ব্যবহৃত কাঠের খড়ি, গাছের পাতা, পাটকাঠি, ধানের গুঁড়া এবং খড় বা গোবর দিয়ে তৈরি লাকড়ি, এগুলোকেও প্রাকৃতিক জ্বালানি হিসেবে গণ্য করা যায়। এখন আমাদের দেশে বহুল ব্যবহৃত গ্যাস, কয়লা ও পেট্রোলিয়াম সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নেওয়া যাক।

৮.৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস

তোমরা কি জান আমরা বাসায় গ্যাসের চুলায় বা সিএনজি (CNG) পাম্প স্টেশন থেকে গাড়িতে যে গ্যাস নিই, তাতে আসলে কী গ্যাস থাকে? এতে থাকে প্রাকৃতিক গ্যাস, যা মূলত মিথেন (CH_4) গ্যাস, তবে সামান্য পরিমাণে অন্যান্য পদার্থ যেমন: ইথেন, প্রোপেন এবং বিউটেনও থাকে। এছাড়া এতে অতি সামান্য পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন সালফাইড, হাইড্রোজেন, আর্গন এবং হিলিয়াম থাকে।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয়? প্রাকৃতিক গ্যাস কীভাবে তৈরি হয় তা নিয়ে কিছুটা ভিন্ন মত আছে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত অনুযায়ী, প্রাকৃতিক গ্যাস তৈরি হয় মৃত গাছপালা ও প্রাণীদেহ থেকে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মরে যাওয়া গাছপালা ও প্রাণীর পচা দেহাবশেষ কাদা ও পানির সাথে ভূগর্ভে জমা হয়। সময়ের সাথে সাথে এগুলো বিভিন্ন রকম শিলা স্তরে ঢাকা পড়ে। শিলা স্তরের চাপে পচা দেহাবশেষ ঘনীভূত হয় এবং প্রচন্ড চাপে ও তাপে দেহাবশেষে বিদ্যমান জৈব পদার্থ প্রাকৃতিক গ্যাসে ও পেট্রোলিয়ামে পরিণত হয়। প্রকৃতিতে এভাবে উৎপন্ন গ্যাসের খনিকে আমরা গ্যাসকূপ বলি।

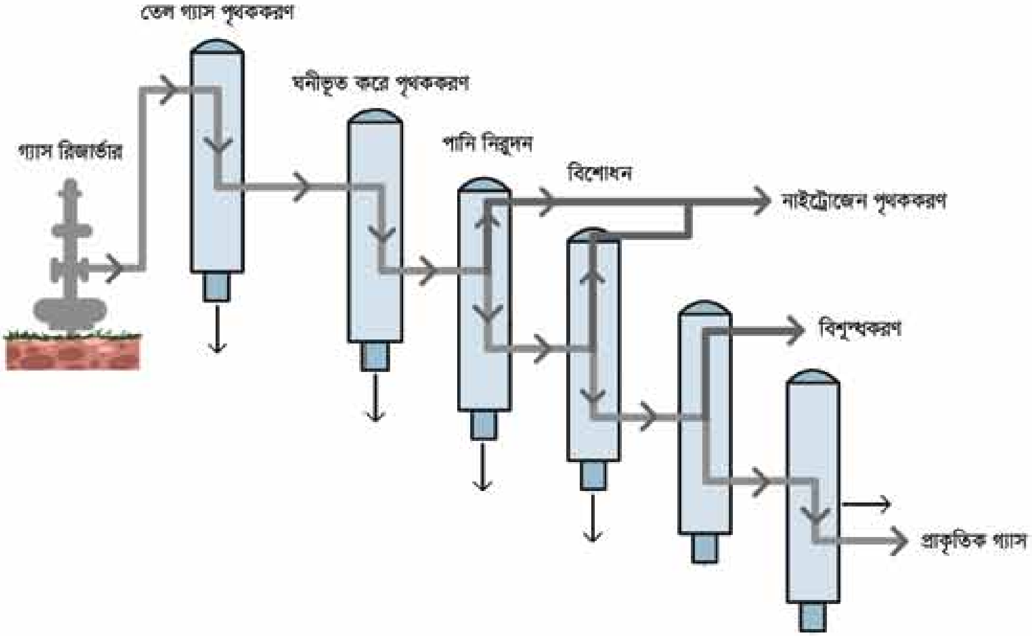

চিত্র ৮.০৩: প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ

প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ

প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রক্রিয়াকরণ একটি জটিল শিল্পপ্রক্রিয়া, যেটি কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় (চিত্র ৮.০৩)। সাধারণত যেখানে গ্যাসকূপ পাওয়া যায়, সেখানেই এর প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। প্রক্রিয়াকরণ অনেকাংশে নির্ভর করে গ্যাসের গঠন অর্থাৎ এতে বিদ্যমান অন্যান্য পদার্থের উপর। সাধারণত গ্যাসকূপে গ্যাস ও তেল একসাথে থাকে। তাই প্রথমেই তেলকে গ্যাস থেকে আলাদা করা হয়। এরপর প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা বেনজিন ও বিউটেন ঘনীভূত করে আলাদা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসে থাকা পানি দূর করার জন্য নিরুদকের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। অতঃপর গ্যাসে থাকা দূষকগুলো (H_2S, CO_2) পৃথক করা হয়। এরপর প্রাপ্ত গ্যাসের মিশ্রণ থেকে নাইট্রোজেন আলাদা করা হয়। এই অবস্থায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস বিশুদ্ধ মিথেন গ্যাস, যেটি পাইপলাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়।

ব্যবহার

প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা নানা কাজে ব্যবহার করি। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ইউরিয়া সার উৎপাদন। শতকরা প্রায় ২১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ইউরিয়া সারের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বেশির ভাগ বিদ্যুৎও উৎপন্ন করা হয় প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে। শতকরা প্রায় ৫১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাসই বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। প্রায় শতকরা ২২ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় শিল্প-কারখানায়, ১১ ভাগ বাসা-বাড়িতে এবং ১১ ভাগ জ্বালানি হিসেবে। এছাড়া প্রায় শতকরা ১ ভাগ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে জ্বালানির কাজে ব্যবহৃত হয়। বাকি শতকরা ৫ ভাগ অপচয় (System Loss) হয়। আমাদের দেশে ২০০৩ সাল থেকে যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা শুরু হয়েছে।

সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ

তোমাদের কি মনে হয় আমাদের যে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুত আছে তা অফুরন্ত? না, মোটেও তা নয়। মজুত প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং সীমিত। ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে একসময় তা শেষ হয়ে যাবে। তাই এই মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে আমাদের অত্যন্ত সচেতন হতে হবে, কোনোভাবেই এটিকে অপচয় করা যাবে না। অনেকে বাসায় বিনা প্রয়োজনে গ্যাসের চুলা জ্বালিয়ে রাখে এবং এতে অতি মূল্যবান এই সম্পদের অপচয় করে, যা কোনোমতেই সমীচীন নয়। এসব বিষয় নিয়ে সবাইকে যার যার নিজের বাসায় এবং এলাকার সবাইকে সচেতন করতে হবে।

৮.৩.২ পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম হলো খনিজ তেল, অর্থাৎ খনিতে পাওয়া তরল জ্বালানি পদার্থ। সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে খনিতে পেট্রোলিয়ামও থাকে। প্রোপেন ও বিউটেন স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় (২৫$^{\circ}$ সেলসিয়াস) গ্যাসীয় হলেও উচ্চ চাপে তরল অবস্থায় থাকে বলে এরাও পেট্রোলিয়ামের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া গ্যাসোলিন, কেরোসিন, ডিজেল— এগুলো সবই পেট্রোলিয়াম।

পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ

খনি থেকে প্রাপ্ত তেল মূলত নানারকম হাইড্রোকার্বন এবং অন্যান্য পদার্থের (যেমন- সনালফার) মিশ্রণ, তাই বেশিরভাগ সময়েই তা সরাসরি ব্যবহারের উপযোগী হয় না। সেজন্য অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে নিতে হয়। প্রায় ৪০০$^{\circ}$ সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আংশিক পাতন করে/ আংশিক পাতনের মাধ্যমে অপরিশোধিত তেলের উপাদানগুলোকে আলাদা করা হয়।

পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার

পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থের বড় একটি অংশ ব্যবহৃত হয় যানবাহনে জ্বালানি হিসেবে। কৃষিজমিতে সেচকাজে, ডিজেলচালিত ইঞ্জিনে জ্বালানি হিসেবে প্রচুর পরিমাণে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়। এছাড়া শিল্প-কারখানায় সার, কীটনাশক, মোম, আলকাতরা, লুব্রিকেন্ট, গ্রিজ ইত্যাদি তৈরিতেও পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

৮.৩.৩ কয়লা

কয়লা হলো কালো বা কালচে বাদামি রঙের একধরনের পাললিক শিলা। এতে বিদ্যমান মূল উপাদান হচ্ছে কার্বন। তবে স্থানভেদে এতে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে হাইড্রোজেন (H_2), সালফার (S), অক্সিজেন

(O_2) কিংবা নাইট্রোজেন (N_2) থাকে। কয়লা একটি দাহ্য পদার্থ, তাই জ্বালানি হিসেবে এর বহুল ব্যবহার রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস আর খনিজ তেলের মতো কয়লা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuel) হলেও এর গঠন প্রক্রিয়া আলাদা। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে জলাভূমিতে জন্মানো প্রচুর ফার্ন, শৈবাল, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা মরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কয়লা তৈরি হয়েছে। গাছপালায় বিদ্যমান জৈব পদার্থে থাকা কার্বন প্রথমে জলাভূমির তলদেশে জমা হয়। এভাবে জমা হওয়া কার্বনের স্তর আস্তে আস্তে পলি বা কাদার নিচে চাপা পড়ে যায় এবং বাতাসের সংস্পর্শ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরকম অবস্থায় কার্বনের স্তর আরো ক্ষয় হয়ে পানিযুক্ত, স্পঞ্জের মতো ছিদ্রযুক্ত জৈব পদার্থে পরিণত হয়, যাকে বলা হয় পিট (Peat)। পিট অনেকটা হিউমাসের মতো পদার্থ। পরবর্তীতে উচ্চ চাপে ও তাপে এই পিট পরিবর্তিত হয়ে কার্বনসমৃদ্ধ কয়লায় পরিণত হয়। কয়লা তিন রকমের হয়। যেমন: অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস এবং লিগনাইট। অ্যানথ্রাসাইট হলো সবচেয়ে পুরোনো ও শক্ত কয়লা, যা প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে তৈরি এবং এতে শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ কার্বন থাকে। বিটুমিনাস কয়লা প্রায় ৩০০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো এবং এতে শতকরা ৫০-৮০ ভাগ কার্বন থাকে। লিগনাইট কয়লা ১৫০ মিলিয়ন বছরের পুরোনো আর এতে সর্বোচ্চ শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত কার্বন থাকে।

প্রক্রিয়াকরণ

ভূগর্ভের কয়লার খনি থেকে মেশিনের সাহায্যে কয়লা উত্তোলন করা হয়। কয়লা উত্তোলনের জন্য দুটি পদ্ধতি আছে। একটি হলো ওপেন পিট মাইনিং (Open Pit Mining) আর অন্যটি হলো ভূগর্ভস্থ মাইনিং (Underground Mining)। সাধারণত কয়লার স্তর ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি থাকে বলে ওপেন পিট মাইনিং পদ্ধতি বেশি ব্যবহৃত হয়। মেশিন দিয়ে ভূগর্ভ থেকে কয়লা তোলার পর কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে সেগুলো প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে নেওয়া হয়। সেখানে কয়লায় থাকা অন্যান্য পদার্থ যেমন : ময়লা, শিলা কণা, ছাই, সালফার— এগুলোকে পৃথক করে ফেলা হয়।

ব্যবহার

তোমরা কি জান, কোন কোন কাজে কয়লা ব্যবহার করা হয়? বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কয়লা ব্যবহৃত হয় ইটের ভাটায়। জ্বালানি হিসেবে শিল্প-কারখানায় এবং বাসাবাড়িতে জ্বালানি হিসেবেও সামান্য কিছু কয়লা ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনে এখনো কয়লা ব্যবহৃত না হলেও পৃথিবীর সব দেশেই বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার খুবই বেশি। এছাড়া হোটেল-রেস্তোরাঁয় কাবাব-জাতীয় খাবার তৈরিতে এবং কর্মকার ও স্বর্ণকারগণ বিভিন্ন সামগ্রী এবং অলংকার তৈরির সময় কয়লা ব্যবহার করে থাকেন।

প্রাকৃতিক জ্বালানির সংরক্ষণে নবায়নযোগ্য শক্তি: আলোচিত প্রাকৃতিক জ্বালানির সবগুলোই এক সময় নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তাই এগুলোর ব্যবহার কমানো ও সংরক্ষণের জন্য আমরা নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াতে পারি। সৌরশক্তি, বায়ুপ্রবাহ, পানির স্রোত— এগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা প্রাকৃতিক জ্বালানির উপর চাপ কমাতে পারি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শক্তি সংরক্ষণ করতে পারি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সবচেয়ে নরম খনিজ কোনটি?

(ক) হীরা (খ) ট্যাল্ক
(গ) সিলিকা (ঘ) চুনাপাথর

২. সাবসয়েল স্তরের মাটি:

(i) শিলাচূর্ণে ভরপুর
(ii) খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ
(iii) জৈব পদার্থসমৃদ্ধ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

টোকিও শহরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছাকাছি মাটিতে কোনো উদ্ভিদ জন্মে না কেবল মাশরুম ভালো জন্মে।

২০২৫

৩. এই মাটিতে কোনটির আধিক্য রয়েছে?

(ক. শিলা (খ) খনিজ পদার্থ

(গ) জৈব পদার্থ (ঘ) তেজস্ক্রিয় পদার্থ

৪. কোন মাটিতে ভালো ফসল ফলে?

(ক) বালু ও খনিজ মিশ্রিত মাটিতে (খ) খনিজ ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত মাটিতে

(গ) বালি ও পলি মিশ্রিত মাটিতে (ঘ) বালি, পলি ও কাদা মিশ্রিত মাটিতে

পরবর্তী চিত্রটি থেকে ৫ ও ৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

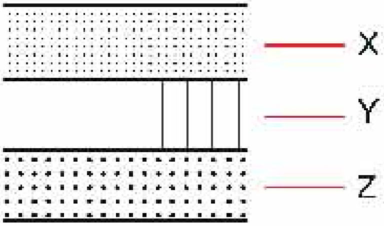

৫. কোন স্তরে শিলাচূর্ণ থাকে?

(ক) X স্তরে (খ) Y স্তরে

(গ) Z স্তরে (ঘ) Z স্তরের নিচে

৬. সবচেয়ে উপরের স্তরের মাটিতে ভালো ফসল হওয়ার কারণ হলো, এ মাটিতে:

(ক) জৈব পদার্থ থাকে (গ) শিলাচূর্ণ বিদ্যমান

(খ) খনিজ উপাদান থাকে (ঘ) অণুজীব থাকে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বকুলদের এলাকার মাটি শিলা ও খনিজ পদার্থ মিশ্রিত। এ মাটির কণাগুলো আকারে বড়। পানি খুব তাড়াতাড়ি সরে যায়। অপরদিকে শাহীনদের এলাকার মাটির কণাগুলো আকারে ছোট এবং জৈব ও খনিজ পদার্থসমৃদ্ধ।

(ক) বায়বায়ন কাকে বলে?

(খ) হরাইজোন কীভাবে তৈরি হয়?

(গ) বকুলদের এলাকার মাটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) বকুল ও শাহীনদের এলাকার মধ্যে কোনটিতে বেশি ফসল ফলবে? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

২. পরবর্তী চিত্র তিনটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

চিত্র A

চিত্র B

চিত্র C

(ক) পেট্রোলিয়াম কী?

(খ) জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কী বুঝায়?

(গ) A চিত্রের জ্বালানিটি খনি থেকে তুলে কীভাবে ব্যবহার উপযোগী করা হয়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) চিত্র B-এর শক্তি উৎপাদনের জন্য A ও C জ্বালানিটির মধ্যে কোনটি বেশি সাশ্রয়ী? যুক্তিসহ মতামত দাও।

নবম অধ্যায়

দুর্যোগের সাথে বসবাস

বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খরা ইত্যাদি নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশে লেগেই আছে। এসব দুর্যোগে জানমালের অপূরণীয় ক্ষয়ক্ষতি আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে বড় অন্তরায়। পরিবেশের ওপর মানুষের নানারকম হস্তক্ষেপের ফলে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাম্প্রতিক কালে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- পরিবেশগত সমস্যা সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবেলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয় ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সুস্থ জীবনযাপনে মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- নিজ এলাকায় মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় একটি অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করতে পারব।
- দুর্যোগ প্রতিরোধ এবং দুর্যোগের করণীয় বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি বিষয়ে পোস্টার অঙ্কন করতে পারব।
- পরিবেশ সংরক্ষণে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করব।

৯.১ জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাব

৯.১.১ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

তোমরা ইতোমধ্যে আবহাওয়া, জলবায়ু এবং তাদের পরিবর্তনের কারণ সম্পর্কে জেনেছ। এখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ফলাফল আর তার প্রভাব সম্পর্কে জেনে নিই।

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এর মাঝেই লক্ষণীয় পর্যায়ে চলে এসেছে। নিচে এগুলো তুলে ধরা হলো।

ঋতুর পরিবর্তন

বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ এবং একসময় প্রতিটি ঋতুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এ ঋতুচক্রের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে দেখা যাচ্ছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ, দুই মাস বর্ষাকাল হলেও দেখা যাচ্ছে যে আশ্বিন মাসেও ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে, শুধু তা-ই নয়, তা অসময়ে বন্যার কারণ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে শীতকাল ধীরে ধীরে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে। এটিও লক্ষণীয় যে গ্রীষ্মকালে অনেক বেশি গরম পড়ছে এবং মাঝে মাঝে দেশের কোনো কোনো এলাকার দিনের তাপমাত্রা ৪৫-৪৮° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে যাচ্ছে। অন্যদিকে শীতের সময় কখনো কখনো তাপমাত্রা অনেক বেশি কমে যাচ্ছে। অস্বাভাবিক এই গরম আর শীতের কারণে কোথাও কোথাও প্রাণহানি পর্যন্ত ঘটছে।

বন্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বন্যা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার এবং অনেকাংশেই দরকারি। বন্যার ফলে জমিতে পলি পড়ে, যা জমির উর্বরতা বাড়ায়, এতে ফসল উৎপাদন ভালো হয়। কিন্তু সাম্প্রতিককালে জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন এবং অসময়ে প্রলয়ংকরী বন্যা লক্ষ করা যাচ্ছে। আগের দিনে এ ধরনের বন্যা যে হয়নি তা নয়, তবে এত ঘন ঘন হয়নি। ১৯৮৮, ১৯৯৫, ১৯৯৮, ২০০৫ সালে বাংলাদেশে প্রলয়ংকরী বন্যায় জানমালের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। এ কারণে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে। বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চল বন্যাপ্রবণ নয়, যেমন: যশোর, ঢাকা সে সকল অঞ্চলও মাঝে মাঝে এখন বন্যায় প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

চিত্র ৯.০১: নদীভাঙন

নদীভাঙন

নদীমাতৃক বাংলাদেশে নদীভাঙন (চিত্র ৯.০১)

একটি স্বাভাবিক ঘটনা হলেও সাম্প্রতিককালে তা অনেক বেড়ে গিয়েছে। এতে একদিকে যেমন বিপুল জনগোষ্ঠী ঘর-বাড়ি হারিয়ে গৃহহীন হয়ে পড়ছে, অন্যদিকে আবাদি জমিও নদীগর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বিশাল জনসংখ্যার দেশটির জন্য এটি মারাত্মক একটি সমস্যা। নদীভাঙনের ফলে গৃহহারা লোকজন যাযাবরের মতো বা শহর অঞ্চলের বস্তিতে অমানবিক জীবনযাপন করছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, বিগত তিন দশকে প্রায় ১৮০,০০০ হেক্টর জমি শুধু পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা এই তিন নদীগর্ভে হারিয়ে গেছে।

খরা

কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় খরা বাংলাদেশের জন্য একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণতা। এর ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, যা বৃষ্টিপাতের উপর প্রচণ্ড প্রভাব ফেলছে। কোনো কোনো অঞ্চলে বৃষ্টিপাত একেবারেই কমে গিয়ে খরার সৃষ্টি করছে। জলবায়ুজনিত সৃষ্ট খরায় বাংলাদেশে ফসল উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হতে পারে।

পানির লবণাক্ততা

জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে সমুদ্রে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ভূখণ্ড পানির নিচে তলিয়ে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মূল ভূখণ্ডে ঢুকে নদ-নদী, ভূগর্ভের পানি এবং আবাদি জমিও লবণাক্ত হয়ে পড়বে। তখন একদিকে যেমন খাওয়ার পানির প্রচণ্ড অভাব দেখা যাবে, অন্যদিকে তেমনি জমিতে লবণাক্ততার জন্য ফসল উৎপাদনও ব্যাহত হবে। অতি সাম্প্রতিককালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৮৩০,০০০ হেক্টর জমি লবণাক্ততার কারণে কৃষি অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কাজেই জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে লবণাক্ত পানির কারণে বাংলাদেশে ভয়াবহ খাদ্যঝুঁকিতে পড়তে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া না হয় তাহলে জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত কারণে ২১০০ সালের মধ্যে ৩০% খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পাবে। ২০৫০ সাল নাগাদ চাল আর গমের উৎপাদন যথাক্রমে ৮.৮% এবং ৩২% হ্রাস পাবে।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় উপকূলীয় বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার প্রায় ১৩% কৃষিজমি এর মাঝেই লবণাক্ততার শিকার হয়ে গেছে। ২০৫০ সাল নাগাদ তা ১৬% এবং ২১০০ সাল নাগাদ সেটি ১৮% এ পৌঁছাবে।

সামুদ্রিক প্রবাল ঝুঁকি

সামুদ্রিক প্রবাল তাপমাত্রার প্রতি খুব সংবেদনশীল। সাধারণত ২২-২৮^{0} সেলসিয়াস তাপমাত্রা প্রবালের জীবনযাপনের জন্য উপযোগী। এই তাপমাত্রার ১-২^{0} বেড়ে গেলেই তা প্রবালের জন্য মারাত্মক হুমকি

হিসেবে কাজ করে। এক গবেষণায় পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৬০ সালে সেন্টমার্টিন দ্বীপে যে পরিমাণ প্রবাল ছিল, ২০১০ সালে তার প্রায় ৭০% বিলীন হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এক্ষেত্রে পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি ছাড়াও পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা না থাকাও এর অন্যতম কারণ।

বনাঞ্চল

বাংলাদেশের একমাত্র ম্যানগ্রোভ বন হলো সুন্দরবন, যা শুধু যে জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ এক বন তা নয়, এটি আমাদের মহামূল্যবান সম্পদ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে এর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। এছাড়া এই অঞ্চলে সাইক্লোন, হ্যারিকেন প্রতিরোধে এই সুন্দরবন রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিককালের ঝড়ে এর বড় একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে যে সমুদ্রের পানির উচ্চতা যদি ৪৫ সেন্টিমিটার বাড়ে, তাহলে আমাদের একমাত্র এই ম্যানগ্রোভ বনের ৭৫% পানির নিচে তলিয়ে যাবে। আর যদি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ১ মিটার বাড়ে, তাহলে প্রায় পুরো সুন্দরবন এবং এর জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাবে।

মৎস্যসম্পদ

এক সময় বাংলাদেশের নদ-নদী, পুকুর কিংবা বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অনেক নদীতে এখন আর আগের মতো পর্যাপ্ত মাছ পাওয়া যায় না। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে মাছের বাসস্থান, খাদ্য সংগ্রহ এবং জৈবিক নানা প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে, এমনকি মাঝে মাঝে মাছ মারাও যায়। অনেক মাছ এবং মাছের পোনা পানির তাপমাত্রা ৩২° সেলসিয়াসের বেশি হলে মরে যায়। যেহেতু উচ্চ তাপমাত্রা (৩৫° সেলসিয়াস) রোগজীবাণু জন্মাতে সাহায্য করে, তাই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে মাছে রোগ সংক্রমণ বেশি হয় এবং মাছের মড়ক লাগে। এছাড়া লবণাক্ত পানি মূল ভুখণ্ডের মিঠা পানিতে ঢুকে পড়লে মিঠা পানির মাছও আর বাঁচতে পারবে না।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে ঘন ঘন প্রলয়ংকরী বন্যায় মারাত্মক পানিদূষণ হয় এবং পানিবাহিত নানা ধরনের রোগ, বিশেষ করে কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব ঘটে। অসময়ে বন্যা-খরার কারণে ফসলের ক্ষতি হয়, খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়, যা খাদ্যঘাটতি সৃষ্টি করে। পানির মতো বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা বাড়লে রোগজীবাণু বেশি জন্মাবে এবং নানারকম রোগ সংক্রমণ বেড়ে যাবে। আগে আমরা বাংলাদেশে কখনো অ্যানথ্রাক্স রোগের কথা শুনিনি। কিন্তু গত ৩-৪ বছর যাবৎ বর্ষার মৌসুমে বাংলাদেশে, বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। এতে গবাদিপশু ও মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে। এ এলাকার পশু চিকিৎসক ও খামারিদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ উপযুক্ত চিকিৎসায় ভালো হয়ে গেলেও গবাদিপশুর জন্য মৃত্যু অবধারিত। জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে অ্যানথ্রাক্সের মতো আরো অনেক প্রাণঘাতী রোগ-জীবাণু সৃষ্টি হতে পারে।

জীববৈচিত্র্য

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য জীববৈচিত্র্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সঠিক উদ্যোগে নেওয়া না হলে জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে ৩০% জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

সাইক্লোন

সাইক্লোনের মতো ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ আরো ঘন ঘন এবং অনেক বেশি ধ্বংসাত্মক আকার ধারণ করবে। এ বিষয়ে এই অধ্যায়েই তোমরা আরো বিস্তারিত জানবে।

৯.১.২ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

জলবায়ু পরিবর্তন-সংক্রান্ত প্রভাব মূল্যায়নের জন্য গঠিত Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-এর চতুর্থ মূল্যায়ন রিপোর্ট (AR4) অনুযায়ী, জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের প্রভাব অনেক মারাত্মক এবং তা ধীরে ধীরে বেড়েই চলছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা গত ১০০ বছরে প্রায় ০.৭^{0} সেলসিয়াস বেড়েছে। ১৯৬১-২০০৩ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা গড়ে প্রতিবছরে ১.৮ সেন্টিমিটার করে বেড়েছে। ইতোমধ্যেই পাহাড় পর্বতে জমে থাকা বরফের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। ১৯৯৫-২০০৬ পর্যন্ত ১২ বছরের মধ্যে ১১ বছরই প্রচণ্ড গরম পড়েছে। ঐ রিপোর্ট অনুযায়ী পরবর্তী দুই দশকে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা প্রতি দশ বছরে গড়ে ০.২-০.৩^{0} সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যাবে। অনুমান করা হচ্ছে, ২১০০ সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ১.১-৬.৪^{0} সেলসিয়াস পর্যন্ত বাড়তে পারে। তখন নাতিশীতোষ্ণ ও বিষুবরেখা থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা বেড়ে যাবে কিন্তু বিষুবরেখার নিকটবর্তী ও মাঝামাঝি স্থানে পানির প্রাপ্যতা কমে যাবে। অর্থাৎ কোনো কোনো অঞ্চলে প্রলংয়করী বন্যার আশঙ্কা বেড়ে যাবে, আর কোনো কোনো অঞ্চল ভয়াবহ খরার কবলে পড়বে। ২০৮০ সালের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ৩৪ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। সত্যি যদি তা-ই হয়, তাহলে বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের বেশির ভাগ পানির নিচে তলিয়ে যাবে। তোমরা কি জান, মালদ্বীপ ও ভারতের কিছু অংশ ইতিমধ্যেই পানিতে ডুবে গেছে? বিগত কয়েক বছরে সাইক্লোন, টাইফুন, হ্যারিকেন এরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ অনেক বেড়েছে, ভবিষ্যতে তা আরো প্রকট হওয়ার আশংকা আছে। প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়, আইলা, সিডর, নার্গিস, ক্যাটরিনার কথা আমরা সবাই জানি। এ ধরনের ভয়াবহ দুর্যোগ আরো ঘন ঘন হবে এবং তার মাত্রা আরো ভয়ানক হতে পারে।

৯.২ পরিবেশগত সমস্যা

বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি স্থান এখন নানা রকম পরিবেশগত সমস্যায় জর্জরিত। তোমরা কি এরকম সমস্যাগুলো অনুধাবন করতে পারছ? নানা রকম পরিবেশগত সমস্যার মধ্যে অন্যতম হলো জনসংখ্যা বৃদ্ধি (Population Growth)। এটি একদিকে যেমন একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আবার অনেক

২০২৩

পরিবেশগত সমস্যার মূল কারণও এটি। তোমরা কি জান, বর্তমানে সারা বিশ্বে জনসংখ্যা কত? প্রায় সাত বিলিয়ন। বর্তমানে যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে তাতে করে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ১০ বিলিয়ন। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ১৯৫০ সালের পর থেকে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ বনভূমি উজাড় হয়ে গেছে। সাথে সাথে হাজার হাজার বনজ গাছপালা এবং জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে খোদ বাংলাদেশেই হাজার হাজার একর আবাদি জমি নষ্ট হচ্ছে। এটিই স্বাভাবিক, কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদি সব রকমের চাহিদা বেড়ে যায় এবং কর্মসংস্থানের উপর চাপ সৃষ্টি হয়। কর্মসংস্থানের চাপ সামলানোর জন্য নতুন নতুন শিল্প-কারখানা তৈরি করতে গিয়ে আবাদি জমি এবং বনভূমি পর্যন্ত উজাড় হয়ে যাচ্ছে। বিপুল জনসংখ্যার জন্য চাহিদার ব্যাপক বৃদ্ধি পাওয়ায় আজ নদ-নদীতে মাছের যেন রীতিমত আকাল পড়ে গেছে। বাংলাদেশ মাছ চাষে পৃথিবীর চতুর্থতম দেশ এবং "মাছে ভাতে বাঙালি" এই কথাটি ধরে রাখার জন্যে প্রাকৃতিক মাছের উপর ভরসা না করে এখন চাষ করা মাছের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে।

১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশে উৎপাদিত মোট খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল প্রায় ১৯.৩২ মিলিয়ন মেট্রিক টন, যা ২০০৭-২০০৮ সালে দাঁড়ায় প্রায় ৩০ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ২০১০-১১ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। প্রায় ২০ বছর সময়ের ব্যবধানে খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে বাংলাদেশ আজ খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে মাঝে মাঝেই ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। তোমরা কি জান, ১৯৯১-৯২ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত ছিল? বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ কোটির মতো, যেটি এখন প্রায় ১৬ কোটি। আমাদের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যদি কম হতো তাহলে আজ বাংলাদেশে খাদ্যশস্য অনেক বেশি উদ্বৃত্ত থাকত, সেগুলো রফতানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করা যেত যা দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত। কাজেই জনসংখ্যার এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে এবং অন্যদেরকেও সচেতন করতে হবে।

এখন প্রশ্ন হলো, জনসংখ্যা কেন এভাবে বৃদ্ধি পায়?

তোমরা জান যে একটি এলাকায় একদিকে যেমন শিশুর জন্ম হয়, অন্যদিকে তেমনি নানা বয়সের লোক মৃত্যুবরণ করে। কোনো এলাকায় শিশু জন্মহার এবং মৃত্যুহার সমান হলে ঐ এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে না। কিন্তু একটি এলাকায় যে কয়জন লোক মৃত্যুবরণ করে, তার চেয়ে শিশুর জন্মের সংখ্যা যদি বেশি হয়, তা হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। এ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া না পাওয়া অবশ্য আরো দুটি অবস্থার ওপর নির্ভর করে আর সে দুটি হলো বহির্গমন এবং বহিরাগমন। বহির্গমনের ফলে একটি দেশের জনসংখ্যা কমে যায় আর বহিরাগমন বা বাইরে থেকে আগমনের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ হলো এখানে জন্মহার মৃত্যুহারের চেয়ে অনেক বেশি।

আরেকটি পরিবেশগত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো নগরায়ণ (Urbanization)। এটিও আসলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সম্পৃক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কর্মসংস্থানের জন্য গ্রামীণ জনসংখ্যার বড় একটি অংশ শহরমুখী হয়ে পড়েছে। একই সাথে শহরাঞ্চলেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যে খুব একটা কম তাও নয়। গ্রামীণ জনপদের শহরমুখিতা এবং শহরাঞ্চলের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য শহর এলাকার আবাসন-সংকট প্রকট আকার ধারণ করেছে এবং এর ফলে আশপাশের আবাদি জমি ধ্বংস করে বা জলাভূমি ভরাট করে নগরায়ণ করা হচ্ছে। নতুন নগরায়ণের বেলায় প্রায় সময়েই ভালো বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহসহ অন্যান্য নাগরিক সুবিধা না থাকায় জীবনযাপনে নানারকম সমস্যা তৈরি হচ্ছে।

৯.২.১ বৈশ্বিক উষ্ণতা (Global Warming)

এর আগের শ্রেণিতে তোমরা বৈশ্বিক উষ্ণতা কী তা জেনেছ। এর মূল কারণ হলো কার্বন ডাই-অক্সাইডসহ ওজোন, মিথেন, সিএফসি, নাইট্রাস অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প, যেগুলো গ্রিন হাউস গ্যাস নামে পরিচিত, সেগুলোর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। গ্রিন হাউস গ্যাসগুলো বাড়ার কারণ কী? এই গ্যাসগুলোর মূল উৎস হলো যানবাহন, শিল্প-কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট ধোঁয়া, রেফ্রিজারেটর কিংবা শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রে ব্যবহৃত গ্যাস। এছাড়া কিছু কিছু প্রাকৃতিক কারণ (যেমন: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, গবাদিপশুর মলমূত্র, প্রাকৃতিকভাবে গাছপালার ক্ষয়) ইত্যাদি দায়ী। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে যানবাহন, শিল্প-কারখানা, বিদ্যুতের চাহিদা বেড়ে যাচ্ছে, ফলে গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণও বেড়ে যাচ্ছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বনভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। এ কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে গাছপালার দ্বারা কার্বন ডাই-অক্সাইডের শোষণ কমে যাচ্ছে, যার ফলে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণ এই গ্রিন হাউস গ্যাসের নিঃসরণ না কমালে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাবে (চিত্র ৯.০২) যার ফলে জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটবে। জলবায়ুজনিত পরিবর্তন ঘটলে পরিবেশে কী ধরনের বিরূপ প্রভাব পড়বে, সেটি তোমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই জেনেছ।

৯.২.২ কার্বন দূষণ (Carbon Pollution)

বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়াকেই কার্বন দূষণ বলে। বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ কেন বেড়ে যায় সেটা তোমরা আগের পাঠে জেনেছ।

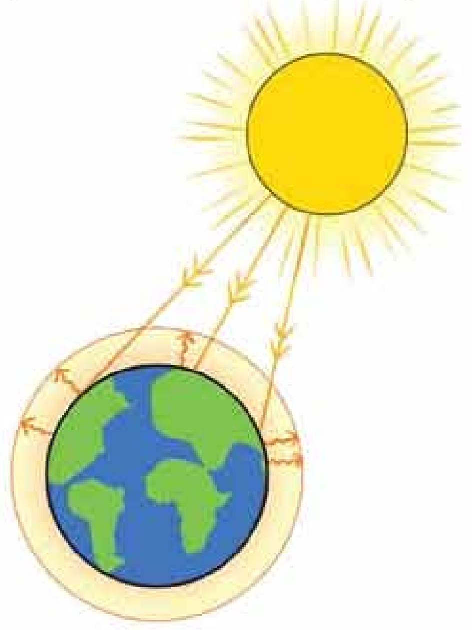

চিত্র ৯.০২: গ্রিন হাউস এফেক্ট

৯.২.৩ বনশূন্য করা (Deforestation)

বনশূন্য করা একটি মারাত্মক পরিবেশগত সমস্যা। তোমরা ইতোমধ্যেই জেনেছ যে বনশূন্য করা বা বনভূমির উজাড় হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে জনংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘর-বাড়ি, রাস্তাঘাট, অন্ন, বস্ত্র ইত্যাদি সব রকম চাহিদা বৃদ্ধি পায়। আর প্রতিটি চাহিদাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বনশূন্য করার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৯.৩ দুর্যোগ সৃষ্টির কারণ, প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল এবং তাৎক্ষণিক করণীয়

৯.৩.১ বন্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের জন্য বন্যা (চিত্র ৯.০৩) একটি নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় প্রতিবছরই বন্যায় দেশের কোনো না কোনো অঞ্চলে ফসল, গবাদিপশু এবং অন্যান্য সম্পদের মারাত্মক ক্ষতি হয়, যা মাঝে মাঝে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৭৪, ১৯৮৭, ১৯৮৮, ১৯৯০, ১৯৯৫, ২০০৪ এবং ২০০৭ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭৪ সালে এই ক্ষতির মাত্রা এত বেশি ছিল যে সেটি বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো কেন বন্যা হয়, এই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ কী? বন্যা হওয়ার পিছনে বেশ কিছু জটিল কারণ আছে। যার মাঝে অন্যতম কারণটি হচ্ছে নদ-নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কমে যাওয়া। নদীভাঙন, বর্জ্য অব্যবস্থাপনাসহ নানা কারণে নদ-নদী ভরাট হয়ে যাওয়ায় নদ-নদীগুলোর পানি ধারণক্ষমতা কমে গেছে। যে কারণে ভারী বর্ষণ বা উজানের অববাহিকা থেকে আসা পানি খুব সহজে সাগরে যেতে পারে না এবং নদী ভরে দুকূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে। এছাড়া মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বঙ্গোপসাগরের সৃষ্ট জোয়ারের কারণে উজানের পানি অনেক সময় নদ-নদীর মাধ্যমে সাগরে যেতে পারে না। ফলে নদ-নদীর আশপাশের এলাকায় বন্যা সৃষ্টি হয়। আবার বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকা সমতল হওয়ায় বৃষ্টির পানি সহজে নদ-নদীতে গিয়ে পড়তে পারে না। কাজেই বিস্তীর্ণ এলাকা, বিশেষ করে উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়ে যায়। সাম্প্রতিক কালে ঘূর্ণিঝড় আইলা ও সিডর এবং এদের প্রভাবে সৃষ্ট বন্যার কথা আমরা সবাই জানি।

এখন আমরা এই বন্যা প্রতিরোধ, মোকাবিলার কৌশল, করণীয় ও উপায় সম্পর্কে জেনে নেই। যেহেতু বন্যা সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হলো নদ-নদীসমূহের সীমিত পানি ধারণক্ষমতা। তাই বন্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে নদী খনন করে এদের পানি ধারণক্ষমতা বাড়াতে হবে যেন, ভারী বর্ষণ বা উজানের পানি এলেও বন্যা না হয়। বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা

হচ্ছে। ১৯৬০ সালের পর থেকে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০০০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। তবে প্রায় প্রতিবছরই অনেক জায়গায় বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে ভাঙনের ফলে (বিশেষ করে সিরাজগঞ্জ জেলায়) বিস্তীর্ণ এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। অনেক সময়েই এটি ঘটে সংশ্লিষ্ট বিভাগ কিংবা ব্যক্তিদের অদক্ষতা বা অব্যবস্থাপনার কারণে।

চিত্র ৯.০৩: বন্যা

নদী শাসন করেও বন্যা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা নেওয়া যায়। নদী শাসন হচ্ছে, নদীর পাড়ে পাথর, সিমেন্টের ব্লক, বালির বস্তা, কাঠ বা বাঁশের ঢিবি তৈরি করে এগুলোর মাধ্যমে বন্যা প্রতিরোধ করা। এছাড়া নদীর পাড়ে গাছ লাগানো, পানিপ্রবাহের জন্য স্লুইস গেট নির্মাণ— এগুলোও নদী শাসনেরই অংশ।

বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী

বন্যা সম্পর্কে আগাম পূর্বাভাস এবং সতর্কবাণী প্রচার করে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ অনেকখানিই কমানো যেতে পারে। বাংলাদেশের ৫৮টি নদীর উৎপত্তিস্থল হচ্ছে ভারত, নেপাল ও ভুটান। তাই সঠিক পূর্বাভাস দেওয়া অনেক সময়েই সম্ভব হয় না। কাজেই আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আঞ্চলিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে, যেন আগে থেকেই এ সংক্রান্ত সব তথ্য পাওয়া যায় এবং তার উপর ভিত্তি করে একটা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

এছাড়া নিচু এবং বন্যাপ্রবণ এলাকায় যেন জনবসতি গড়ে উঠতে না পারে, সেজন্য ভূমি ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং করণীয় সম্পর্কে জনসচেতনতা তৈরি করা বন্যা মোকাবেলায় অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। তাই এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ভয়াবহ বন্যা হলে সরকারি উঁচু ভবন কিংবা স্থাপনা যেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সাময়িক আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। আবার উঁচু স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র বা মালামাল সংরক্ষণ কেন্দ্র, উঁচু রাস্তাঘাট, উঁচু স্থানে বাজার কিংবা স্কুল ইত্যাদি তৈরি করে বন্যা মোকাবেলা করা যায়। বন্যার সময় বেশির ভাগ রাস্তাঘাট পানিতে ডুবে যায়। তখন চলাচলের জন্য স্পিডবোট এবং নৌকার ব্যবস্থা রাখাও বন্যা মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বন্যার আগাম প্রস্তুতিও বন্যা মোকাবিলার একটি কৌশল হিসেবে গণ্য করা হয়। বিপুল জনসংখ্যা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়লে এবং আগে থেকে পর্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য, পানি, ঔষধপত্র ইত্যাদির ব্যবস্থা করে না রাখলে তা ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে। কোনো একটি এলাকা বন্যাকবলিত হলে তখন সেখানকার মানুষের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা থাকে না। বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই তাদের পুনর্বাসনের জন্য যথেষ্ট ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৯.৩.২ খরা (Drought)

খরা একটি মারাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। খরার সময় মাটিতে পানির পরিমাণ কমতে কমতে মাটি পানিশূন্য হয়ে যায় এবং এর ফলে মাটিতে গাছপালা বা শস্য জন্মাতে পারে না। ব্রিটিশরা একটানা দুই সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হলে তাকে খরা (Absolute Drought) আর একটানা ৪ সপ্তাহ ০.২৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত না হলে তাকে আংশিক খরা (Partial Drought) বলে। রাশিয়াতে একটানা ১০ দিন মোট ৫ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টি না হলে তাকে খরা বলে আর আমেরিকাতে একটানা ৩০ দিন বা তার বেশি সময়ের মধ্যে যেকোনো ২৪ ঘণ্টায় ৬.২৪ মিলিমিটার বৃষ্টি না হলে তারা ঐ অবস্থাকে খরা হিসেবে ধরে নেয়।

চিত্র ৯.০৪: খরা

খরা একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ (চিত্র ৯.০৪)। খরা হলে ফসল উৎপাদন কমে যায় এবং এটি দুর্ভিক্ষের কারণও হতে পারে। খরার ফলে শুধু মানুষ নয়, গবাদিপশুর জন্যও খাদ্যসংকট দেখা দেয়। কৃষিনির্ভর শিল্প-কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হয়, যেটি কর্মসংস্থানের জন্য একটি বড় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। খরার কারণে মাটির উর্বরতা কমে যায়। দীর্ঘস্থায়ী খরার কারণে দেশে সামাজিক এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা (রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, বগুড়া, কুষ্টিয়া, যশোর) খরার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। বাংলাদেশে ১৯৭৮-৭৯ সালে ভয়াবহ খরা হয়েছিল। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, এই খরায় ক্ষতির পরিমাণ ১৯৭৪ সালের ভয়াবহ বন্যার চেয়েও বেশি ছিল।

কেন খরা হয়? খরা হওয়ার বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে, যার মাঝে অন্যতম হচ্ছে দীর্ঘদিন শুষ্ক আবহাওয়া থাকা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃষ্টিপাত না হওয়া। বাষ্পীভবন এবং প্রস্বেদনের পরিমাণ বৃষ্টিপাতের চেয়ে বেশি হলেও এমনটি ঘটতে পারে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত উন্নয়ন, বৃক্ষনিধন এবং গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে বায়ুমণ্ডল ধীরে ধীরে রুক্ষ ও শুষ্ক হয়ে উঠেছে, ফলে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে, যেটি খরা সৃষ্টির মূল কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাত কমে খরা সৃষ্টি হওয়ার জন্য পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের মেরু অঞ্চলে সৃষ্ট এল-নিনো (El-Nino) নামে জলবায়ুর পরিবর্তনচক্রকে দায়ী করা হচ্ছে।

খরার জন্য দায়ী একটি অন্যতম কারণ হচ্ছে গভীর নলকূপের সাহায্যে ভূগর্ভের পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে পানির স্তর অস্বাভাবিকভাবে নিচে নেমে যাওয়া। এছাড়া নদীর গতিপথ পরিবর্তন, উজান থেকে পানি সরিয়ে নেওয়া, পানি সংরক্ষণ প্রক্রিয়ার অভাব, ওজোন স্তরের ক্ষয়— এগুলোও খরা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

এখন প্রশ্ন হলো, খরা প্রতিরোধে বা খরা মোকাবিলার জন্য কী করা যেতে পারে? যেহেতু খরার মূল কারণ হলো পানির অপর্যাপ্ততা, তাই পানির সরবরাহ বাড়ানোই হচ্ছে খরা মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর উপায়। বাংলাদেশের প্রায় ৫৫টি নদীর উৎসস্থল ভারত। শুষ্ক মৌসুমে ভারতের ঐ সকল নদ-নদীর পানির গতিপথ পরিবর্তন এবং পানি প্রত্যাহার বাংলাদেশে খরার অন্যতম কারণ। এর আগে গঙ্গা নদীর পানিও ভারত একতরফাভাবে ব্যবহার করত। ১৯৯৬ সালে ভারত এবং বাংলাদেশের মধ্যে পানি বণ্টন চুক্তির কারণে বাংলাদেশ এখন শুষ্ক মৌসুমে পানির ন্যায্য হিস্যা পাচ্ছে। গঙ্গার পানির চুক্তির মতো তিস্তাসহ অন্যান্য নদীর পানি বণ্টনের জন্য ভারতের সাথে পানি বণ্টন চুক্তি করার চেষ্টা চলছে, যেন শুষ্ক মৌসুমে ভারত একতরফাভাবে উজান থেকে পানি সরিয়ে নিতে না পারে।

কিছু ফসল আছে যেগুলো মাটিতে পানি কম থাকলেও জন্মাতে পারে। যেমন: গম, পিঁয়াজ, কাউন ইত্যাদি। খরা পীড়িত এলাকার মানুষকে এ জাতীয় ফসল চাষ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। সেই সাথে সাথে যে সমস্ত ফসল উৎপাদনে অনেক বেশি পানির প্রয়োজন হয়, যেমন: ইরি ধান, সেগুলো

২০২১

চাষে খরাপীড়িত এলাকার মানুষদের নিরুৎসাহিত করা যেতে পারে।

খরা মোকাবেলা করার জন্য পুকুর, নদ-নদী, খাল-বিল খনন করে পানি ধরে রেখে তা খরার সময় ব্যবহার করার জন্য সবাইকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

কৃত্রিমভাবে বৃষ্টি সৃষ্টি করে কিছু কিছু দেশ খরা মোকাবেলার চেষ্টা করেছে কিন্তু সেটি খুব একটা কার্যকর হয়নি।

৯.৩.৩ সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)

সাইক্লোন শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ "Kyklos" থেকে, যার অর্থ হলো Coil of Snakes বা সাপের কুণ্ডলী। সাইক্লোনের স্যাটেলাইট ছবি থেকে দেখা যায়, প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন বাতাস কুণ্ডলীর আকারে ঘুরপাক খাচ্ছে (চিত্র ৯.০৫)। অর্থাৎ নিম্নচাপের কারণে যখন বাতাস প্রচণ্ড গতিবেগে ঘুরতে থাকে, তখন সেটাকে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় বলে। দক্ষিণ এশিয়াতে আমরা যেটাকে সাইক্লোন বলি, আমেরিকাতে সেটাকে হ্যারিকেন (Hurricane) এবং দূরপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাইফুন (Typhoon) বলে।

চিত্র ৯.০৫: ঘূর্ণিঝড়

বাংলাদেশের উত্তরে হিমালয় পর্বত, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং মাঝখানে ফানেল আকৃতির উপকূলীয় এলাকা বিদ্যমান। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ সাইক্লোনের জন্য খুব ঝুঁকিপূর্ণ দেশ। ১৯৬০ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫০ বার বাংলাদেশে সাইক্লোন আঘাত এনেছে। এর মধ্যে ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৫, ১৯৭০, ১৯৮৫, ১৯৯১, ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন ছিল প্রলয়ংকরী। তবে ১৯৭০ সালের সাইক্লোনটি সর্বকালের সবচেয়ে প্রলয়ংকরী সাইক্লোন হিসেবে পৃথিবীর ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছে। এ ঝড়ে প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণহানি ঘটেছিল। ১৯৯১ সালে ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার প্রাণহানি ঘটেছে। ২০০৭ ও ২০০৯ সালের সাইক্লোন সিডর (চিত্র ৯.০৬) ও আইলাতে যথাক্রমে ১০ হাজার ও ৭ হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটেছে। এছাড়া এই সাইক্লোনে লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল। এ দুটি সাইক্লোনে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে প্রায় ১.৭ বিলিয়ন ও ৬০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

চিত্র ৯.০৬: ঘূর্ণিঝড়ের ধ্বংসে

সাইক্লোন সৃষ্টির কারণ ও করণীয়

যেহেতু সাইক্লোন সৃষ্টি হয় গভীর সমুদ্রে, তাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সহজসাধ্য নয়। তবে যে দুটি কারণ মূলত সাইক্লোন সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা হলো নিম্নচাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা। সাধারণত সাইক্লোন তৈরি হতে সাগরের তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াসের বেশি হতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত বঙ্গোপসাগরে প্রায় সারা বছরই এই তাপমাত্রা বিদ্যমান থাকে। সমুদ্রের উত্তপ্ত পানি বাষ্পীভবনের ফলে উপরে উঠে যখন জল কণায় পরিণত হয় তখন বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপটি বাতাসে ছেড়ে দেয়। সে কারণে বাতাস উত্তপ্ত হয় এবং বাষ্পীভবন আরো বেড়ে যায়, ফলে বায়ুমণ্ডল অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে। নিম্নচাপ সৃষ্টি হলে আশপাশের বাতাস সেখানে ছুটে আসে, যা বাড়তি তাপমাত্রার কারণে ঘুরতে ঘুরতে উপরে উঠতে থাকে এবং সাইক্লোন সৃষ্টি করে। এই প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণিঝড়ের বাতাসের বেগ অনেক বেশি হয়। তবে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৬৩ কিলোমিটার বা তার চাইতে বেশি হলে সেটাকে সাইক্লোন হিসেবে গণ্য করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে সবচেয়ে শক্তিশালী সাইক্লোন হয়েছিল ১৯৯১ সালে। তখন বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ২২৫ কিলোমিটার।

এখন প্রশ্ন হলো, সাইক্লোনের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কি কোনো উপায় আছে? আর সাইক্লোন হলে আমাদের করণীয়ই বা কী? সাইক্লোন অত্যন্ত শক্তিশালী। একটি দুর্বল সাইক্লোনও শক্তিতে মেগাটন শক্তির কয়েক হাজার পারমাণবিক বোমার সমান। তাছাড়া যেহেতু সাইক্লোন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, তাই এটি প্রতিরোধ করা প্রায় অসাধ্য। সম্প্রতি আমেরিকাতে ঝড়ের সময় সিলভার আয়োডাইড (AgI) নামক রাসায়নিক দ্রব্য বাতাসে ছড়িয়ে পানিকে শীতল করে ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ কমানোর চেষ্টা করা হলেও নানা ধরনের সীমাবদ্ধতার কারণে এটি ঠিকভাবে কাজ করেনি। এছাড়া সাগরে তেল বা অন্যান্য

রাসায়নিক দ্রব্য ছিটিয়ে বাষ্পীভবন কমিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তাভাবনা করা হয়। তবে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করা কখনোই বাস্তবভিত্তিক নয়। তাহলে কী করা যেতে পারে?

আমাদের ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রক্রিয়া জোরদার করে মানুষের প্রাণ বাঁচানোর এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়ের আরেকটি মারাত্মক দিক হলো জলোচ্ছ্বাস। তাই ঘূর্ণিঝড় প্রবন এলাকায় উঁচু করে মজবুত আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের সময় নিচু এলাকায় বসবাস করা মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। জলোচ্ছ্বাস ঠেকানোর জন্য উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ তৈরি করা যেতে পারে। সাথে সাথে সেখানে প্রচুর গাছপালা লাগিয়েও ক্ষতির পরিমাণ কমানো সম্ভব।

ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলার জন্য যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হবে। বাংলাদেশ ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশে রেড ক্রিসেন্টের যৌথ উদ্যোগে ইতোমধ্যেই সাইক্লোন প্রস্তুতি কার্যক্রম চালু আছে। এর আওতায় প্রায় ৩২০০০ স্বেচ্ছাসেবী উপকূলীয় এলাকায় জনসচেতনতা বৃদ্ধিসহ অন্যান্য কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৭ সালে সাইক্লোন 'মোরা' বাংলাদেশকে আঘাত করেছিল, সময়মতো যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ায় তখন মাত্র ৭ জনের প্রাণহানি ঘটেছিল।

আমাদের অতিপরিচিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলো কালবৈশাখী। সাধারণত এপ্রিল থেকে মে মাসের ভেতর আমাদের দেশে কালবৈশাখী ঝড় হয়। সাধারণত ঈশান কোণে (North) মেঘ জমা হয়ে কিছুক্ষণের মাঝে আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়ে কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। এই ঝড়ে বাতাসের বেগ ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৮০ কিলোমিটারের মতো হতে পারে। ঝড়ের বেগ ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটারের বেশি হলে এটাকে টর্নেডো বলা হয়। বাংলাদেশ ছাড়াও আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও রাশিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশেই টর্নেডো আঘাত হানে। টর্নেডোর সবচেয়ে ক্ষতিকর দিক হচ্ছে এটি হঠাৎ করে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড ধ্বংসযজ্ঞ করে ফেলতে পারে। টর্নেডো শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'Tonada' থেকে, যার অর্থ হলো Thunder storm বা বজ্রঝড়। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর বেলাতেও প্রচণ্ড বেগে বাতাস ঘূর্ণির আকারে প্রবাহিত হয় এবং এর যাত্রাপথে যা পড়ে তার সবই ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। টর্নেডোর বিস্তার মাত্র কয়েক মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৫-৩০ কিলোমিটার হতে পারে। সাইক্লোনের সাথে টর্নেডোর মূল পার্থক্য হচ্ছে যে, সাইক্লোন সৃষ্টি হয় সাগরে এবং এটি উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে আর টর্নেডো যে কোনো স্থানেই সৃষ্টি হতে পারে কিংবা আঘাত হানতে পারে। সাইক্লোনের মতো টর্নেডোর জন্যও লঘু বা নিম্নচাপ সৃষ্টি হতে হয়। এর ফলে উষ্ণ বাতাস উপরে উঠে যায় এবং ঐ শূন্য জায়গা পূরণের জন্যই শীতল বাতাস ছুটে এসে টর্নেডোর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে একটি প্রলয়ংকরী টর্নেডো আঘাত হানে ১৯৮৯ সালে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়াতে। ঐ আঘাতের ফলে টর্নেডোর গতিপথের মধ্যে প্রায় সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শতাধিক টর্নেডো বাংলাদেশে আঘাত হেনেছে।

স্মরণকালের ভয়াবহ টর্নেডোর মধ্যে একটি হলো ১৯৬৯ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলার ডেমরা থানায়। ঐ টর্নেডোতে বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৬৪৪ কিলোমিটার। যেহেতু টর্নেডোর বেলায়

পূর্বাভাস কিংবা সতর্কবাণী প্রচার করা সম্ভব হয় না, তাই এক্ষেত্রে আগাম প্রস্তুতি নেওয়া যায় না। তাই দুর্গত এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে দ্রুত ত্রাণ সরবরাহ এবং পুনর্বাসন কাজ করাই হচ্ছে একমাত্র সমাধান। এরকম সময় সরকারি এবং বেসরকারি সব সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় করে কাজ করা খুবই জরুরি।

৯.৩.৪ সুনামি (Tsunami)

Tsunami জাপানি শব্দ। 'সু' অর্থ বন্দর এবং 'নামি' অর্থ ঢেউ। সুতরাং সুনামি অর্থ হলো বন্দরের ঢেউ। এটি একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সমুদ্রতলদেশে ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস এবং নভোজাগতিক ঘটনা সুনামি সৃষ্টি করতে পারে। সুনামিকে পৃথিবীর তৃতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। মহাসাগর এবং সাগরের তলদেশের প্লেট যখন একটির সাথে আরেকটির সংঘর্ষ হয়ে বিচ্যুত হয়, তখন সেখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সৃষ্টি হয়। সেই ভূমিকম্পের কারণে লক্ষ লক্ষ টনের সমুদ্রের পানি বিশাল ঢেউ তৈরি করে (চিত্র ৯.০৭)। এই ঢেউ ধাবমান হয়ে যত বেশি তীরভূমির কাছাকাছি যায়, তত দীর্ঘ হয়ে ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। এই ঢেউয়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ৫০০ থেকে ৮০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। খোলা সমুদ্রে এই ঢেউয়ের উচ্চতা মাত্র দুই থেকে তিন ফুট পর্যন্ত থাকে। কিন্তু ঢেউ যতই তীরের দিকে এগিয়ে যায়, ততই তার উচ্চতা বাড়তে থাকে। তখন ঢেউয়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার দূরত্ব ১০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে, অগভীর পানিতে সুনামি একটি ধ্বংসাত্মক জলোচ্ছ্বাসে রূপ নেয়। অগ্রসরমাণ জলরাশি ভয়ঙ্কর স্রোত সৃষ্টি করে নেমে যাওয়ার আগে ১০০ ফুট পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। একটি সুনামি উপকূলের ব্যাপক এলাকা প্লাবিত করতে পারে।

সাধারণত সমুদ্রের তলদেশে একটা ভূমিকম্প হলে সুনামি তৈরি হয়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে শুরু করে সমুদ্র অতিক্রম করে সুনামিকে উপকূলে পৌঁছাতে খানিকটা সময়ের প্রয়োজন। এই সময়টুকুর ভেতরে সাধারণত উপকূল এলাকায় সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। ২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বর স্মরণকালের ভয়ঙ্কর একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা দ্বীপের কাছাকাছি ভারত মহাসাগরের তলদেশে সৃষ্টি হয়েছিল ট্রাস্টনিক ভূমিকম্প। ইউরেশিয়ান প্লেট ও অস্ট্রেলিয়ান প্লেটের সংঘর্ষে সৃষ্টি হওয়া এই মারাত্মক ভূকম্পনটি ছিল রিখটার স্কেলে নয় মাত্রার। এই ভূকম্পনের ফলে ভারত মহাসাগরের একাংশ সুমাত্রার অন্য একটি অংশকে সজোরে চাপ দেয়। এই প্রবল চাপে সমুদ্রতলের ৬০০ মাইলব্যাপী এলাকায় ভাঙনের সৃষ্টি হয়। এই ভাঙনের ফলে স্থানচ্যুতি ঘটে লক্ষ লক্ষ টন জলরাশির। বিশাল জলরাশি ভয়ানক বেগে সমুদ্রপৃষ্ঠের দিকে ধেয়ে আসে এবং বিশাল ঢেউয়ের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউ মহাপ্লাবনে রূপ নিয়ে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারত, থাইল্যান্ড, মালদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়া ছাড়িয়ে কেনিয়া, সোমালিয়াসহ ১২টি আফ্রিকান দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। জলোচ্ছ্বাসে তিন লাখের মতো মানুষ নিহত হয়। শুধু ইন্দোনেশিয়ায় সুমাত্রার আচেহ প্রদেশেই নিহত হয়েছে এক লাখ মানুষ। তারপর বেশি লোক নিহত হয়েছে শ্রীলঙ্কায়। সুনামির জলোচ্ছ্বাসে ভারত মহাসাগরের বহু ছোট ছোট দ্বীপ সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এসব দ্বীপে বসবাসকারী বহু আদিবাসী গোষ্ঠী প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে সবচেয়ে বেশি নিহত হয়েছে শিশু ও

নারী, মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে হাজার হাজার মানুষ। ভূতত্ত্ববিদ ও সমুদ্র বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এই সুনামির তীব্রতা এতটাই প্রবল ছিল যে পৃথিবী তার অক্ষে ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা নড়ে যায়। এছাড়া ভূকম্পনের ফলে যে বিপুল পরিমাণ শক্তির বিকিরণ হয় সেটি ছিল সাড়ে নয় হাজার পারমাণবিক বোমার সমান ক্ষমতাসম্পন্ন। সমুদ্র তলদেশে ব্যাপক ভাঙনের ফলে এতদিনকার ভারত মহাসাগরের সমুদ্রপথের দিকনির্দেশনার মানচিত্রটি পর্যন্ত এলোমেলো হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নতুন করে ভারত মহাসাগরে নৌচলাচলের মানচিত্র তৈরি করতে হবে; নইলে ভবিষ্যতে জাহাজ চলাচলে বিঘ্ন ঘটতে পারে।

চিত্র ৯.০৭: সুনামি

২০০৪ সালের ২৬ ডিসেম্বরের সুনামিতে বাংলাদেশের কোনো ক্ষতি হয়নি। অগভীর পানিতে যাওয়ার সময় সুনামি তার শক্তি হারায়। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে ১৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত অগভীর পানি এবং এই অগভীর পানি বাংলাদেশকে সুনামির কবল থেকে রক্ষা করে থাকে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলোর চেয়ে সুনামিতে বাংলাদেশের ক্ষতি সামান্য। শুধুমাত্র কুয়াকাটার সমুদ্র উপকূলে সে সময় মাছ ধরা ট্রলার ডুবে দুজন জেলে মারা গিয়েছিল।

১৭৬২ সালের ২ এপ্রিল বঙ্গোপসাগরের আরাকান অঞ্চলে সংঘটিত একটি ভূমিকম্প থেকে সৃষ্ট সুনামি বাংলাদেশে আঘাত হেনেছিল। তখন কক্সবাজার এবং পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। এর প্রভাবে ঢাকার বুড়িগঙ্গায় পানি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে শত শত নৌকা ডুবে বহু লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

৯.৩.৫ এসিড বৃষ্টি (Acid Rain)

সাধারণত বৃষ্টিপাত এমনিতেই খানিকটা এসিডিক। তবে যখন বৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিমাণ এসিড বিদ্যমান থাকে, তখন তাকে এসিড বৃষ্টি বলে। তোমরা কি জান, এসিড বৃষ্টিতে কী কী এসিড

থাকে? এসিড বৃষ্টিতে সালফিউরিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বেশি থাকে এবং অল্প পরিমাণে হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। এসিড বৃষ্টি পরিবেশে মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে। এসিড বৃষ্টিতে এসিডের প্রতি সংবেদনশীল অনেক গাছ মরে যায়। এছাড়া কিছু অতি প্রয়োজনীয় উপাদান (যেমন: Ca, Mg) এসিড বৃষ্টিতে দ্রবীভূত হয়ে মাটি থেকে সরে যায়, যা ফসল উৎপাদনে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এসিড বৃষ্টি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় পানিসম্পদ এবং জলজ প্রাণীগুলোর। তোমরা জান যে, পানিতে এসিড থাকলে pH ৭-এর কম হয়। pH-এর মান ৫-এর কম হলে বেশির ভাগ মাছের ডিম নষ্ট হয়ে যায়। তখন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হয়। মাছের রেণু বা পোনা এসিডের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। এসিডের মাত্রা বেশি হলে পুরো জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। মানুষের শরীরের জন্যও এসিড বৃষ্টি ক্ষতিকর। এসিড বৃষ্টি মানবদেহে হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের সমস্যা, অ্যাজমা ও ব্রঙ্কাইটিসের মতো মারাত্মক রোগের সৃষ্টি করতে পারে ।

এসিড বৃষ্টি কেন হয়?

এসিড বৃষ্টির জন্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্য-সৃষ্ট দুই কারণই জড়িত। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মাঝে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, দাবানল, বজ্রপাত, গাছপালার পচন ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস বের হয়, যা পরে বাতাসের অক্সিজেন আর বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে নাইট্রিক এসিড এবং সালফিউরিক এসিড তৈরি করে। একইভাবে বিভিন্ন শিল্প-কারখানা বিশেষ করে কয়লা বা গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, ইটের ভাটা (চিত্র ৯.০৮), যানবাহন, গৃহস্থালির চুলা ইত্যাদি উৎস থেকেও সালফার ডাই-অক্সাইড বের হয়, যা এসিডে পরিণত হয় এবং বৃষ্টির পানির সাথে মিশে এসিড বৃষ্টি তৈরি করে।

চিত্র ৯.০৮: ইটের ভাটা

এখন দেখা যাক এসিড বৃষ্টি হলে আমাদের কী কী করণীয় আছে? যেহেতু বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লা থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইড ও সালফার ডাই-অক্সাইড গ্যাস তৈরি হয়, সেহেতু ব্যবহারের আগে কয়লা পরিশোধন করে সালফার ও নাইট্রোজেন মুক্ত করে নিতে হবে। পরিবেশ সচেতন অনেক দেশেই ইতোমধ্যেই এই ব্যবস্থা চালু আছে। পরিশোধন ব্যবস্থা না থাকলে কয়লার পরিবর্তে বিকল্প জ্বালানি ব্যবহার করা যেতে পারে।

এসিড বৃষ্টি হলে মাটির pH কমে যায় এবং সেক্ষেত্রে লাইমস্টোন বা চুনাপাথর ব্যবহার করে এসিডিটি কমানো যায়।

এছাড়া শিল্প-কারখানা এবং যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। শিল্প-কারখানায় দূষণরোধক পদ্ধতি অবশ্যই বাধ্যতামূলক করে দিতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে এসিড বৃষ্টি খুব একটা হয় না। যেসব দেশে শিল্প-কারখানা অনেক বেশি, সেখানে এর আশঙ্কাও অনেক বেশি। পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ, আমেরিকা, কানাডা এবং চীনের দক্ষিণ উপকূলীয় অঞ্চলে ও তাইওয়ানে ঘন ঘন এসিড বৃষ্টি হয়।

৯.৩.৬ ভূমিকম্প (Earthquake)

পৃথিবীর ভেতরে হঠাৎ সৃষ্ট কোনো কম্পন যখন ভূপৃষ্ঠে আকস্মিক আন্দোলন সৃষ্টি করে, সেটাকেই ভূমিকম্প বলে। ভূমিকম্পন কয়েক সেকেন্ড থেকে মিনিট খানেক পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে এবং পর্যায়ক্রমে একাধিকবার ঘটতে পারে। মৃদু ভূমিকম্প আমরা অনেক সময় অনুভব করতে পারি না, কিন্তু শক্তিশালী বা প্রবল ভূমিকম্প সহজেই অনুভব করা যায়।

ভূমিকম্প কি প্রাকৃতিক দুর্যোগ? হ্যাঁ, এটি অবশ্যই একটি ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যা মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটি দেশ বা অঞ্চল পুরোপুরি ধ্বংস করে দিতে পারে (চিত্র ৯.০৯)। এমনকি

চিত্র ৯.০৯: ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত একটি বিল্ডিং

বড় ভূমিকম্প নদীর গতিপথও পরিবর্তন করতে পারে। ভূমিকম্পের ফলে আমাদের অন্যতম প্রধান নদী ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ বদলে গিয়েছে। আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত বড় ধরনের ভূমিকম্প না হলেও বিশেষজ্ঞদের মতে বাংলাদেশ বড় ধরনের ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। পৃথিবীর মাঝে জাপান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা বলে চিহ্নিত। তোমরা নিশ্চয়ই ২০১০ সালে হাইতিতে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্প, ২০১১ সালে জাপানের ভূমিকম্প এবং ২০১৫ সালে নেপালের ভূমিকম্পের ধ্বংসযজ্ঞের কথা শুনেছ। জাপানের ভূমিকম্পের পর সেখানে সৃষ্ট সুনামি নিউক্লিয়ার শক্তি কেন্দ্রে আঘাত করে একটি নিউক্লিয়ার দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল।

এখন প্রশ্ন হলো, কীভাবে এই ভূমিকম্প হয়? আমাদের ভূগর্ভ (Earth's Crust) কতগুলো ভাগে বিভক্ত, যাদেরকে টেকটনিক প্লেট (Tectonic Plate) বলে। এই টেকটনিক প্লেট কিন্তু স্থিতিশীল নয়, এগুলো চলমান। চলমান একটি প্লেট আরেকটি প্লেটে চাপ দেওয়ার কারণে সেখানে শক্তি সঞ্চিত হয়। যখন হঠাৎ করে প্লেটগুলো সরে যায়, তখন সঞ্চিত শক্তি বের হয়ে ভূমিকম্প সৃষ্টি করে। ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা হয় রিখটার স্কেলে। রিখটার স্কেলে ৫ মাত্রার বেশি ভূমিকম্প আমরা অনুভব করতে পারি। রিখটার স্কেলে এক মাত্রা বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ তার শক্তি তিরিশ গুণ বেড়ে যাওয়া। একটি ভূমিকম্প যত বড় হয় তত দূর থেকে সেটি অনুভব করা যায়।

৯.১০ চিত্রে বাংলাদেশ এবং তার আশপাশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পগুলো দেখানো হয়েছে। ছবিতে নিশ্চয়ই দেখছ বাংলাদেশের ভেতরে সাম্প্রতিক কালে কোনো বড় ভূমিকম্প হয়নি, কিন্তু আশপাশে ঘটে যাওয়া ভূমিকম্পন অনুভূত হয়েছে। ১৮৮৪ সালে মানিকগঞ্জ এলাকায় রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার বড় একটি ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৯৭ সালে শিলংয়ে ৮.৭ মাত্রায় একটি বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। যেহেতু অতীতে এই অঞ্চলে বড় ভূমিকম্প হয়েছে, তাই আমাদের ধরে নিতে হয় ভবিষ্যতেও হতে পারে। সেটি কখন হবে যেহেতু আমাদের জানা নেই, তাই সব সময়েই প্রস্তুত থাকতে হবে।

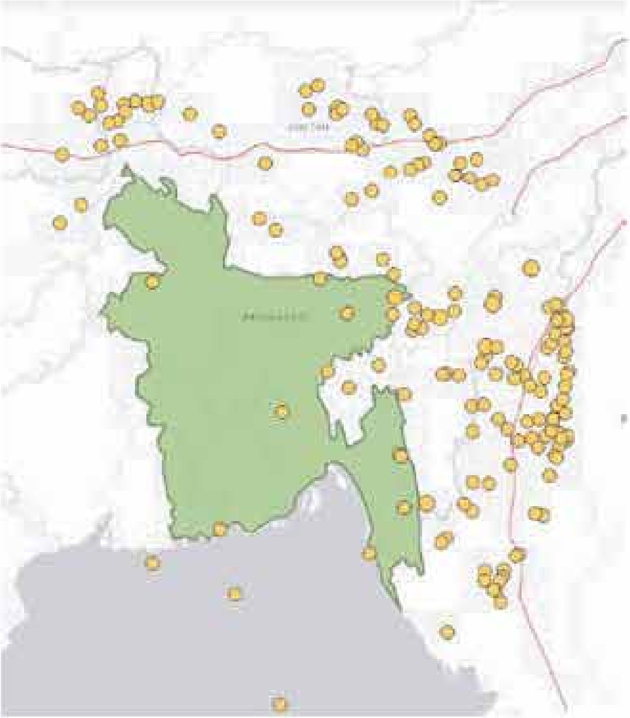

চিত্র ৯.১০: ১৯৭১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং তার আশেপাশে ঘটে যাওয়া ৫ মাত্রা থেকে বড় ভূমিকম্প

ভূমিকম্প হলে করণীয় কী? এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় আছে কি?

২০২৪

ভূমিকম্পের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবে এতে জানমালের ক্ষয়ক্ষতি কমানো যায়। সেক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো নিয়ম মেনে ঘর-বাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা তৈরি করা। আমাদের দেশে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে যে সকল বড় বড় দালান-কোঠা তৈরি করা হয়, সেখানে অবশ্যই ভূমিকম্প প্রতিরোধক ব্যবস্থা থাকতে হবে। তা না হলে বড় ধরনের ভূমিকম্প হলে তা ভয়াবহ পরিণাম ডেকে আনতে পারে। ২০১০ সালে হাইতিতে রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে তিন লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। অথচ তার থেকে ত্রিশ গুণ থেকে বেশি শক্তিশালী ৮.২ রিখটার স্কেলের একটি ভূমিকম্পে ২০১৪ সালে চিলিতে মাত্র ছয়জন মানুষ মারা গিয়েছিল। তার কারণ ভূমিকম্প প্রবণ চিলি নিয়ম করে তাদের দেশে ভূমিকম্প সহনীয় বিল্ডিং তৈরি করতে শুরু করেছে। এছাড়া ভূমিকম্প হলে জরুরি ভিত্তিতে সরকারি ও অন্যান্য সংস্থার সমন্বয়ে দ্রুত ত্রাণ তৎপরতা ও উদ্ধারকাজ নিশ্চিত করতে হবে এবং তার জন্য আগাম প্রস্তুতি থাকতে হবে। বেশ কয়েকটি বিষয় সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে।

ভূমিকম্পের আগে করণীয়

১. সম্ভব হলে সব বাসাতেই অগ্নিনির্বাপক প্রস্তুতি থাকা দরকার। এর সাথে প্রাথমিক চিকিৎসা কিট, ব্যাটারি চালিত রেডিও, টর্চ লাইট কিছু বাড়তি ব্যাটারি, শুকনো খাবার এবং পানি রাখার ব্যবস্থা করা।

২. কীভাবে ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হয় সেটি শিখে নাও।

৩. বাসায় গ্যাস, ইলেকট্রিসিটি এবং পানির সরবরাহ কীভাবে বন্ধ করতে হয় সেটি জেনে নাও।

৪. ভূমিকম্পের পর প্রয়োজনে কোথায় কীভাবে পরিবারের সদস্যদের সাথে মিলিত হতে হবে, সেটি আগে থেকে সবার সঙ্গে কথা বলে ঠিক করে নাও।

৫. উঁচু শেলফে ভারী জিনিস রাখা যাবে না, ভূমিকম্পের সময় সেগুলো নিচে পড়ে লোকজনকে আহত করতে পারে।

৬. ভূমিকম্পের সময় কী করতে হবে, সেটি স্কুল কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে "ড্রিল" করে শিখে নাও।

ভূমিকম্পের সময় করণীয়

১. ভূমিকম্পের সময় ভয়ে এবং আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হওয়া যাবে না। নিজেকে বোঝাও পৃথিবীর মানুষ ভূমিকম্পের সাথে জন্ম থেকে বসবাস করে আসছে এবং মাথা ঠান্ডা রাখলে বড়

শক্ত টেবিলের নীচে আশ্রয় নাও

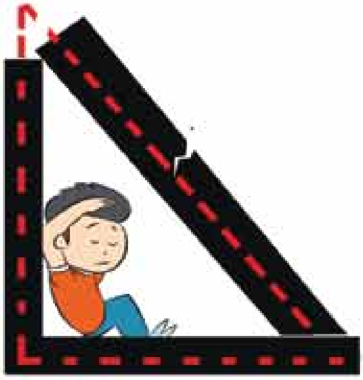

অথবা ঘরের কোণায় চলে যাও যাতে কিছু ভেঙ্গে পড়লেও সরাসরি গায়ের ওপরে না পড়ে একটা ত্রিভুজাকৃতির জায়গা থেকে যায় তোমার ওপর।

বাইরে থাকলে আতঙ্কিত না হয়ে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।

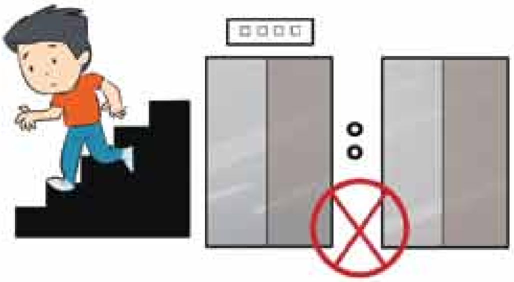

বিল্ডিং থেকে একান্ত নামতে চাইলে সিঁড়ি দিয়ে নামাই নিরাপদ

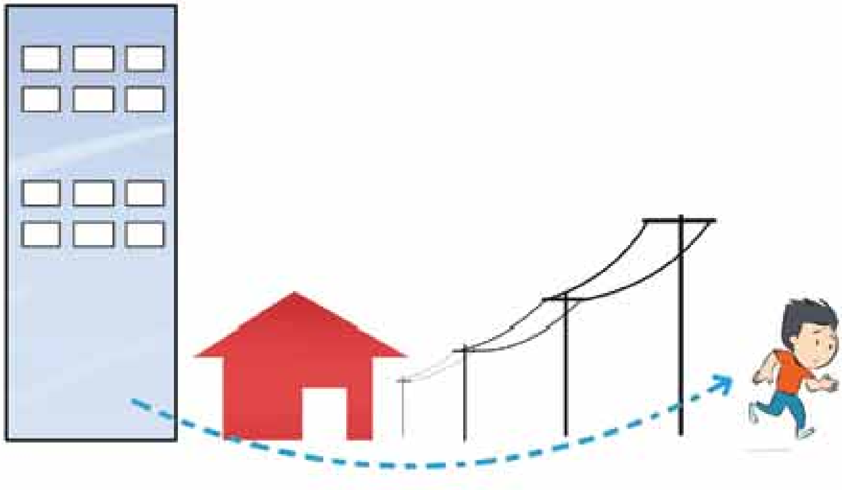

উঁচু কাঠামো, **বৈদ্যুতিক** থাম– ইত্যাদি থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরে যেতে হবে।

চিত্র ৯.১১: ভূমিকম্পের সময় করণীয়

ভূমিকম্পের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

২. তুমি যদি ঘরের ভেতরে থাকো তাহলে ভিতরেই থাকা, হুড়োহুড়ি করে বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করো না। দেয়ালের পাশে দাঁড়াও। কাচের জানালা থেকে দূরে থাকো। প্রয়োজনে শক্ত টেবিলের নিচে আশ্রয় নাও। কখনোই লিফট দিয়ে নামার চেষ্টা করো না।

৩. তুমি যদি ঘরের বাইরে থাকো তাহলে বাইরেই থাকো, ঘরের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করো না। ইলেকট্রিক পোল কিংবা বড় বিল্ডিং থেকে দূরে সরে যাও, উপর থেকে মাথার উপর কিছু পড়তে পারে।

৪. কোনোভাবেই ম্যাচ জ্বালিও না, গ্যাসপাইপ ভেঙে বাতাসে গ্যাসের মিশ্রণ আগুনের জন্য খুবই বিপজ্জনক।

ভূমিকম্পের পরে করণীয়

১. বড় ভূমিকম্প হয়ে থাকলে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের পরীক্ষা করে দেখো কেউ আহত হয়েছে কি না। আহত হলে প্রাথমিক চিকিৎসা দাও। গুরুতর আহত হলে হাসপাতালে নাও, মনে রেখো সত্যিকারের বড় ভূমিকম্প হলে হাসাপাতালে অসংখ্য মানুষকে জরুরি চিকিৎসা দিতে হয়। কাজেই যার প্রয়োজন বেশি তাকে আগে চিকিৎসা দেওয়া হবে।

২. পানি, ইলেকট্রিসিটি, গ্যাসলাইন পরীক্ষা করো, যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে সরবরাহ বন্ধ করে দাও। বাসায় গ্যাসের গন্ধ পেলে ঘরের দরজা-জানালা খুলে ঘরের বাইরে যাও।

৩. রেডিওতে খবর শোনার চেষ্টা কর। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টেলিফোন ব্যবহার করে নেটওয়ার্ক অচল করে দিও না, জরুরি কাজের জন্য ত্রাণ বাহিনীকে টেলিফোন ব্যবহার করতে দাও। বড় ভূমিকম্পের পর টেলিফোন অচল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও থাকতে পারে।

৪. ক্ষতিগ্রস্ত বিল্ডিংয়ের বাইরে থেকো। ভাঙা কাচ ইত্যাদিতে যেন পা কেটে না যায়, সেজন্য খালি পায়ে হাঁটাহাটি করবে না।

৫. সমুদ্র উপকূলে বসবাস করলে সমুদ্র থেকে দূরে সরে যাও। সুনামি এসে আঘাত করতে পারে।

৬. ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংয়ের নিচে আটকা পড়লে. ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা না করে উদ্ধারকারীদের জন্য অপেক্ষা কর। নিজের শক্তি বাঁচিয়ে রাখো, উদ্ধারকারী দল এলে তাদেরকে সংকেত দেওয়ার জন্য কোনো কিছুতে নিয়মিতভাবে আঘাত করে দৃষ্টি আকর্ষণ কর।

৭. বড় ভূমিকম্প হলে আফটার শক হিসেবে আরো ভূমিকম্প হতে পারে, সে জন্য প্রস্তুত থেকো।

দলগত কাজ

কাজ: ভূমিকম্পে করণীয় কাজগুলো দিয়ে পোস্টার এবং লিফলেট তৈরি করে তোমরা এলাকায় বিতরণ করো।

দলগত কাজ

কাজ: ভূমিকম্পের সময় করণীয় কাজের একটি ড্রিলের আয়োজন করো।

৯.৪ মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশের গুরুত্ব

আমাদের জীবনধারণের জন্য যে আবশ্যকীয় উপাদান আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বাতাস। বাতাস বা অক্সিজেন ছাড়া আমরা কতক্ষণ বাঁচতে পারি? খুব বেশি হলে দুই কিংবা তিন মিনিট। এই বাতাস যদি দূষিত হয়, অর্থাৎ এতে যদি নানা রকম ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ (যেমন: CO, SO_2, SO_3, NO_2 ইত্যাদি), ধূলাবালির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা থাকে, তবে সেটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে অক্সিজেনের সাথে আমাদের শরীরে প্রবেশ করে এবং প্রাণঘাতী ফুসফুসের ক্যান্সারের মতো নানা রকম রোগ সৃষ্টি করতে পারে। একইভাবে এই রাসায়নিক পদার্থ গাছপালা, মাটি এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। বাতাসের মতো পানিও আমাদের জীবনধারণের জন্য খুবই জরুরি একটি উপাদান। নদ-নদীর পানি দূষিত হলে সেখানে মাছসহ অন্যান্য জলজ প্রাণী মারাত্মক হুমকির মুখে পড়বে এবং পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হবে। বাতাস এবং পানির মতো পরিবেশের প্রতিটি উপাদানই আমাদের জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। তাই এই পরিবেশ যদি মানসম্মত এবং উন্নত না হয় তাহলে এক সময় সেটি জীববৈচিত্র্যের জন্য বড় রকমের হুমকি হয়ে দাঁড়াবে এবং এক সময় আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই কঠিন হয়ে পড়বে। তাই এ ব্যাপারে আমাদের নিজেদের যেমন সচেতন হতে হবে, ঠিক সেরকম আশপাশে সবাইকে সচেতন করতে হবে।

৯.৪.১ প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার তাৎপর্য

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতা হলো আমাদের প্রকৃতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা। আমাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ হচ্ছে বাতাস, পানি, মাটি, গাছপালা, প্রাণিজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ, তেল, গ্যাস

ইত্যাদি। আমাদের জীবনধারণের জন্য প্রতিটি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ। বাতাস, পানি না থাকলে বা ধ্বংস হলে আমরা যেমন বাঁচতে পারব না, তেমনি তেল, গ্যাস আর গাছপালা ছাড়াও বেঁচে থাকা অসম্ভব। আমরা যদি আমাদের প্রকৃতি সংরক্ষণে কার্যকর ভূমিকা না নিই, গাছপালা বনজ সম্পদ নিধন বন্ধ না করি, বাতাস, পানি ইত্যাদি দূষণ বন্ধ না করি, তাহলে আমাদের এই প্রকৃতি একসময় আর বাসযোগ্য থাকবে না এবং আমরা আমাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারব না।

৯.৪.২ প্রকৃতির সংরক্ষণশীলতার বিভিন্ন কৌশল

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার বেশ কয়েকটি কৌশল আছে। সেগুলো হলো:

১. সম্পদের ব্যবহার কমানো

আমরা পরিমিত সম্পদ ব্যবহার করে সম্পদ রক্ষা করতে পারি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাজার থেকে কিছু কিনে আনলে একটি নতুন প্যাকেট দেওয়া হয়। আমরা যদি একটি প্যাকেটই বারবার ব্যবহার করি, তাহলে সম্পদের ব্যবহার সীমিত করা সম্ভব। আজকাল প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমরা টিস্যু, ন্যাপকিন ব্যবহার করি। একটুখানি সতর্ক হলেই এগুলোর ব্যবহার কমিয়ে দেওয়া সম্ভব। এবার তোমরা নিজেরা বের কর আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কোন কোন কাজে এভাবে সম্পদের ব্যবহার কমিয়ে প্রকৃতি সংরক্ষণ করতে পারি।

একসময় অফিস-আদালতের সকল কাজকর্মে কাগজ ব্যবহার করতে হতো। এখন বেশির ভাগ কাজ কম্পিউটার ব্যবহার করে করা হয় বলে কাগজের ব্যবহার কমে গেছে। অনেক অফিস কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কাগজের ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করে "কাগজবিহীন অফিস" প্রকল্প হাতে নিয়েছে। কাগজ তৈরি হয় গাছপালা থেকে, কাগজের ব্যবহার কমানোর অর্থই হলো গাছপালা কম কাটতে হবে আর তাতে বনজ সম্পদ রক্ষা পাবে অর্থাৎ প্রকৃতির সংরক্ষণ হবে।

২. দূষণ থেকে সম্পদ রক্ষা করা

আমাদের প্রকৃতি বা সম্পদ দূষিত হলে সেটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো নদ-নদীর পানি। তোমরা অনেকে হয়তো বুড়িগঙ্গা নদীর কথা জান। দূষণের ফলে নদীর পানি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে আজ আর বুড়িগঙ্গা নদীতে মাছ তো দূরের কথা, কোনো জলজ প্রাণীই খুঁজে পাওয়া কঠিন। বুড়িগঙ্গা নদীর মতো বাংলাদেশের অনেক নদীই দূষণের শিকার হয়েছে। এসব দূষণ রোধ করা না গেলে এমন এক সময় আসবে যখন নদ-নদীতে মাছই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনিয়ন্ত্রিত কল-কারখানা, যানবাহনের ধোঁয়া ইত্যাদির কারণে বাংলাদেশের অনেক শহরে বিপজ্জনকভাবে বায়ুদূষণ হয়েছে। বায়ুদূষণে পৃথিবীর প্রথম ১০০টি শহরের মাঝে বাংলাদেশের আটটি শহরের নাম রয়েছে।

৩. একই জিনিস বারবার ব্যবহার করা

সম্ভব হলে একই জিনিস বারবার ব্যবহার করে প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। আজকাল কম্পিউটারের প্রিন্টারে বা ফটোকপি মেশিনে অসংখ্য কাগজ ব্যবহার করা হয় এবং অনেক সময়েই সেখানে শুধু একটি পৃষ্ঠা ব্যবহার করা হয়। একটুখানি সচেতন হলেই কাগজের অন্য পৃষ্ঠা আমাদের নানা কাজে ব্যবহার করতে পারি। ব্যানার বিলবোর্ডে যে পলিথিন ব্যবহার করা হয়, সেগুলো অনেক উন্নত মানের, সেগুলো সংগ্রহ করে ব্যাগ তৈরি বা অন্য কাজে ব্যবহার করা যায়। প্রতিদিন আমরা অনেক প্লাস্টিকের বোতল ছুড়ে ফেলে দিই। খুব সহজেই সেগুলো পুনর্ব্যবহার বা Recycle করা সম্ভব। আমাদের ব্যবহার্য অনেক জিনিস শিল্প-কারখানায় তৈরি হলেও তা কোনো না কোনো পর্যায়ে প্রকৃতির উপরই নির্ভরশীল। কাজেই একই জিনিস বারবার ব্যবহারে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর চাপ কমে এবং এতে প্রকৃতি সংরক্ষণ হয়।

৪. ব্যবহৃত জিনিস ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করা

পুরাতন জিনিস একেবারে ফেলে না দিয়ে তা থেকে নতুন জিনিস তৈরি করেও প্রকৃতি সংরক্ষণ করা যায়। আমাদের কালচারে সেটি আমরা বহু আগে থেকে করে আসছি, কাঁথা হচ্ছে তার উদাহরণ। পুরাতন কাপড় বা শাড়ি ফেলে না দিয়ে সেগুলো দিয়ে কাঁথা তৈরি করা হতো। ঠিক সেরকম পুরাতন কাগজ দিয়ে ঠোঙা, পুরোনো টায়ার থেকে স্যান্ডেল কিংবা গৃহস্থালির বর্জ্য থেকে জৈব সার এ ধরনের নানা রকম জিনিসের কথা বলা যায়।

৫. প্রাকৃতিক সম্পদ পুরোপুরি রক্ষা করা

প্রকৃতি সংরক্ষণশীলতার একটি অনন্য উপায় হলো এর বিরোধিতা না করে একে রক্ষা করা বা এতে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা। তোমরা হয়তো জান, অনেক দুষ্কৃতকারীরা সুন্দরবনে হরিণ, বাঘ এগুলো শিকার করে বা চুরি করে গাছ কাটে। শীতের পাখিকে ধরে বাজারে বিক্রয় করে, সমুদ্র উপকূলে অনিয়ন্ত্রিত অপরিকল্পিত জাহাজ ভাঙা শিল্প গড়ে তুলে সমুদ্রের পানিকে দূষিত করা। এসব কার্যক্রম বন্ধ করাই হলো প্রকৃতি সংরক্ষণ। সুন্দরবনের খুব কাছে কলকারখানা বসিয়ে বায়ুদূষণ করে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য নষ্ট করে। সুন্দরবনের মতো আমাদের অনেক প্রাকৃতিক সম্পদ অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যা রোধ করা অতি আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

দলগত কাজ

কাজ: তোমাদের স্কুলের আশপাশে কোথায় কোথায় পরিবেশদূষণ হচ্ছে, সেগুলো চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন লিখো। স্কুলের মাধ্যমে সেটি যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাঝে পাঠিয়ে দেখো পরিবেশদূষণ বন্ধ করা যায় কি না।

দলগত কাজ

কাজ: তোমার এলাকায় মানসম্মত ও উন্নত পরিবেশ সৃষ্টির অন্তরায় কী এবং সে জন্য করণীয় কী হতে পারে, সেগুলো চিহ্নিত কর। ৪-৫ জন বন্ধু বা সহপাঠী মিলে একটি গ্রুপ তৈরি করো। নিজ নিজ এলাকার পরিবেশগত সমস্যা চিহ্নিত কর। এক্ষেত্রে পানিদূষণ, যত্রতত্র ময়লা ফেলা, খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি বিবেচনায় রাখ। এসব দূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে পোস্টার বা লিফলেট তৈরি করে সবার মাঝে বিলি কর। পত্রপত্রিকায় চিঠি লিখো, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সহযোগিতা কাজে লাগাও। প্রয়োজনবোধে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, সরকারি কর্মকর্তা, পরিবেশবাদী সংগঠন, বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নাও।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দুর্যোগটি শুধু সাগরে সংঘটিত হয়?

(ক) কালবৈশাখী (গ) সুনামি
(খ) ভূমিকম্প (ঘ) বন্যা

২. গ্রিন হাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণ—

(i) যানবাহন
(ii) শিল্পকারখানা
(iii) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (গ) ii ও iii
(খ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাশের চিত্র অবলম্বনে ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩. চিত্রে প্রদর্শিত কারখানা থেকে কোন গ্যাস নির্গত হয় না?

(ক) SO_2 (গ) NH_3

(খ) CO_2 (ঘ) NO_2

৪. উপরের কারখানা হতে নির্গত গ্যাসের মাধ্যমে সৃষ্ট এসিড বৃষ্টি মানুষের কোন রোগটি সৃষ্টি করে?

(ক) বহুমূত্র (গ) ক্যান্সার

(খ) অ্যাজমা (ঘ) হার্ট অ্যাটাক

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নওশাদ মিয়ার বাড়ি বরগুনা জেলায়। তার বয়স ৭০ বছর। ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডরে তিনি ছাড়া সবাই মারা যান। ঘরবাড়ি সবকিছু ঝড়ে উড়ে যায়। ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়ে স্বেচ্ছাসেবক দল কয়েক মাইল দূরের আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার পরামর্শ দেন। নওশাদ মিয়া এবং তার পরিবার কেউ আশ্রয়কেন্দ্রে যাননি। সাঈদ সাহেব আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ায় তার বাড়িঘর ধ্বংস হলেও পরিবারের সকল সদস্য বেঁচে আছে। আত্মীয়-পরিজনহীন অসহায় বৃদ্ধ নওশাদ মিয়া এখন শুধুই আফসোস করেন যে কেন তিনি সাঈদ সাহেবের সাথে সবাইকে নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে গেলেন না?

(ক) সাইক্লোন কী?

(খ) বৈশ্বিক উষ্ণতা ব্যাখ্যা করো।

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘূর্ণিঝড় কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) নওশাদ মিয়া ঘূর্ণিঝড়ের কবল হতে রেহাই পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ নিতে পারতেন? বিশ্লেষণ করো।

২. তুলি পড়ালেখা শেষ করে রাত ১২টায় ঘুমাতে গেল। হঠাৎ লক্ষ করল, তার শোবার খাট ও সিলিং ফ্যান কাঁপছে এবং ঘরের তাকে হালকা জিনিসপত্র নিচে পড়ে যাচ্ছে। তুলি পরদিন সকালে লক্ষ করল, আশাপাশের কিছু পুরাতন বিল্ডিং ফেটে গিয়েছে, আবার কোনোটি ভেঙে গিয়েছে এবং হেলে পড়েছে। তুলি বুঝতে পারল রাতে এক ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটিত হয়েছিল।

(ক) খরা কী?

(খ) বাংলাদেশ ঘূর্ণিঝড়-কবলিত দেশ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করো।

(গ) তুলির লক্ষ করা প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে সৃষ্টি হয়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) উদ্দীপকের প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? বিশ্লেষণ করো।

দশম অধ্যায়

এসো বলকে জানি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিদিনই আমাদের কোনো কিছুকে টানতে হয়, ঠেলতে হয় কিংবা ধাক্কা দিতে হয়। কোনো বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে চাইলেই আমরা সেটাকে টানি, ঠেলি বা ধাক্কা দিই অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি। বল প্রয়োগ করে স্থির বস্তুকে গতিশীল করা যায়, আবার গতিশীল বস্তুর গতি পরিবর্তন করা যায়, এমনকি গতি থামিয়েও দেওয়া যায়। এ অধ্যায়ে আমরা জড়তা, বল, স্থিতি এবং গতি আলোচনা করব। গতির উপর বলের প্রভাব বোঝার জন্য আমরা নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে বলের প্রকৃতি জানব। নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে বলের পরিমাপ করব এবং নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে বলের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- বস্তুর জড়তা এবং বলের গুণগত ধারণা নিউটনের গতির প্রথম সূত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বিভিন্ন প্রকার বলের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্যবহারিক জীবনে ঘর্ষণের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- স্থিতি ও গতির ওপর বলের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে বলের পরিমাপ করতে পারব।
- সহজ পরীক্ষণের সাহায্যে বল পরিমাপ করতে পারব।
- নিউটনের তৃতীয় সূত্রের সাহায্যে সংঘটিত কয়েকটি জনপ্রিয় ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আমাদের জীবনে বলের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারব।

১০.১ ধাক্কা ও টানা: বল

কোনো কিছুকে দূরে সরাতে চাইলে আমরা সেটাকে ঠেলি বা ধাক্কা দিই। আবার কোনো কিছুকে কাছে আনতে চাইলে আমরা তাকে টানি। কোনো বস্তুর উপর অন্য বস্তুর ধাক্কা বা টানাই হচ্ছে বল প্রয়োগ। যখনই আমরা কোনো কিছুকে ঠেলি বা টানি, উঠাই বা নামাই তখন আমরা আসলে বল প্রয়োগ করি। যখন কোনো কিছুকে মোচড়াই বা ছিঁড়ি, প্রসারিত করি বা সংকুচিত করি, তখনো বল প্রয়োগ করতে হয় কিন্তু এই অধ্যায়ে আমরা শুধু বলের মাধ্যমে গতি পরিবর্তনের বিষয়টি আলোচনা করব। আমরা সবাই দেখেছি স্থির বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করা হলে সেটি নড়ে আবার নড়তে থাকা বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে সেটি থামানো যায়। অর্থাৎ বল প্রয়োগ করে বস্তুর গতির পারিবর্তন করা যায়। বিজ্ঞানী নিউটন বল, ভর, জড়তা ও গতির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে তিনটি সূত্র প্রকাশ করেন। এই তিনটি সূত্র নিউটনের গতিবিষয়ক সূত্র নামে পরিচিত। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা বস্তুর জড়তা ও বল সম্পর্কে ধারণা পাই। এ প্রসঙ্গে **নিউটনের প্রথম সূত্র** হলো:

> বাইরে থেকে কোনো বল প্রয়োগ না করলে স্থির বস্তু স্থিরই থাকবে এবং সমবেগে চলতে থাকা বস্তু সমবেগে চলতে থাকবে।

নিউটনের প্রথম সূত্রের প্রথম অংশ নিয়ে কারো সমস্যা হয় না, কারণ আমরা সব সময়েই দেখেছি স্থির বস্তুকে ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত সেটা নিজে থেকে নড়ে না, স্থির থেকে যায়। দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে সমস্যা, কারণ আমরা কখনোই কোনো চলন্ত বস্তুকে অনন্তকাল চলতে দেখি না। ধাক্কা দিয়ে কোনো বস্তুকে গতিশীল করে ছেড়ে দিলেও দেখা যায় কোনো বল প্রয়োগ না করলেও শেষ পর্যন্ত বস্তুটা থেমে যায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়, যেকোনো কিছুকে সমবেগে চালিয়ে নিতে হলে ক্রমাগত বুঝি সেটাতে বল প্রয়োগ করে যেতে হয়। নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে আমরা জানতে পেরেছি সেটা সত্যি নয়, সমবেগে চলতে থাকা কোনো বস্তু যদি থেমে যায় তাহলে বুঝতে হবে সেখানে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘর্ষণ, বাতাসের বাধা এ রকম অনেক কিছু আসলে উল্টো দিক থেকে বল প্রয়োগ করে চলমান একটা বস্তুকে থামিয়ে দেয়। যদি সত্যি সত্যি সব বল বন্ধ করে দেওয়া যেত, তাহলে আমরা সত্যিই দেখতে পেতাম সমবেগে চলতে থাকা একটা বস্তু অনন্তকাল ধরে চলছে।

১০.১.১ জড়তা

আমরা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে দেখি, প্রত্যেক বস্তু যে অবস্থায় আছে, সে অবস্থায় থাকতে চায়। বস্তু স্থির থাকলে স্থির থাকতে চায় আর গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চায়। বল প্রয়োগ না

করা পর্যন্ত বস্তু যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা, সেটাই হচ্ছে জড়তা।

স্থিতিশীল বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতাকে বলে স্থিতি জড়তা এবং গতিশীল বস্তুর সমবেগে গতিশীল থাকার প্রবণতাকে বলে গতি জড়তা।

জড়তার ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা

থেমে থাকা বাস হঠাৎ চলতে শুরু করলে বাসযাত্রীরা পিছনের দিকে হেলে পড়েন জড়তার কারণে। বাস যখন থেমে থাকে, তখন যাত্রীর শরীরও স্থির থাকে। কিন্তু হঠাৎ বাস চলতে শুরু করলে যাত্রীদের শরীরের বাসের সিটে বসে থাকা বাসসংলগ্ন অংশ গতিশীল হয় কিন্তু শরীরের উপরের অংশ জড়তার জন্য স্থির থাকে এবং স্থির থাকতে চায় বলে পিছনে হেলে পড়ে।

চলন্ত বাস থেকে নামতে গেলে ঠিক তার বিপরীত ব্যাপারটি ঘটে। পুরো শরীরটি গতিশীল অবস্থায় পা যখন মাটি স্পর্শ করে, তখন শরীরের নিচের অংশ স্থির হয়ে গেলেও উপরের অংশ গতিশীল থেকে যায় এবং যাত্রী সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়।

একক কাজ

কাজ: একটি গ্লাসের উপর একটা কার্ড, বোর্ড বা শক্ত কাগজ রেখে তার উপর কয়েন রাখ। (চিত্র: ১০.০১)। হঠাৎ কার্ডটিকে জোরে টোকা দাও। কী দেখলে?

কয়েনটি গ্লাসের মধ্যে পড়ে গেল কেন? হঠাৎ জোরে টোকা দেওয়ার জন্য কার্ডটি সরে গেল, কিন্তু জড়তার কারণে কয়েনটি তার নিজস্ব স্থির অবস্থান বজায় রাখতে চাওয়ার জন্য গ্লাসের মধ্যে পড়ে গেল।

চিত্র ১০.০১: জড়তার পরীক্ষা

গাড়ি চালনার সময় গাড়ির সব আরোহীকে গতি জড়তার বিপদ থেকে রক্ষা পেতে সিটবেল্ট পরতে হয়। সিটবেল্ট ছাড়া চলমান গাড়ির চালক যদি হঠাৎ ব্রেক করেন, কিংবা দুর্ঘটনার মাঝে পড়ে তখন জড়তার কারণে তিনি সামনে ঝুঁকে পড়বেন এবং স্টিয়ারিং কিংবা উইন্ড স্ক্রিনে আঘাত পাবেন (চিত্র ১০.২)। চিত্রের দ্বিতীয় অংশে দেখা যাচ্ছে,

চিত্র ১০.০২: গতি জড়তার উদাহরণ

সিট বেল্ট চালককে উইন্ড স্ক্রিনে আঘাত পাওয়া থেকে রক্ষা করছে।

কোনো বস্তুর দিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও আমরা জড়তার প্রভাব অনুভব করি। যদি কোনো বাস বা গাড়ি হঠাৎ বাঁক নেয়, তাহলে যাত্রীরা অন্য পাশে ঝুঁকে পড়ে। এর কারণ আরোহীও বাস বা গাড়ির গতির দিকে গতিশীল ছিলেন, বাস বা গাড়ি হঠাৎ দিক পরিবর্তন করলেও জড়তার কারণে আরোহীর মূল দিক বজায় রেখে গতিশীল থাকতে চান, তাই বাসের সাপেক্ষে অন্য পাশে সরে যান।

১০.২ বলের পরিমাণ ও নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র

আমরা নিউটনের প্রথম সূত্র থেকে জেনেছি যে বস্তুর গতির অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে অর্থাৎ স্থির বস্তুকে গতিশীল করতে হলে বা গতিশীল বস্তুর গতির পরিবর্তন করতে হলে বল প্রয়োগ করতে হবে। বস্তুর জড়তা থাকার কারণে এ বল প্রয়োগ করতে হয়। যে বস্তুর জড়তা যত বেশি, তার অবস্থা পরিবর্তনের জন্য তত বেশি বল দিতে হবে। জড়তার পরিমাণ হচ্ছে ভর, সুতরাং যে বস্তুর ভর যত বেশি হবে, গতির পরিবর্তন করতে হলে সেই বস্তুর উপর তত বেশি বল প্রয়োগ করতে হবে।

একটি নির্দিষ্ট ভরের বস্তুর উপর কতখানি বল প্রয়োগ করা হলে বস্তুটির বেগের কতখানি পরিবর্তন হবে, নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র সেটি ব্যাখ্যা করেছে। তবে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি জানার আগে আমাদের দুটো রাশির কথা জানতে হবে। একটি হচ্ছে ভরবেগ অন্যটি ত্বরণ।

ভরবেগ: ভরবেগ হচ্ছে ভর এবং বেগের গুণফল। অর্থাৎ কোনো বস্তুর ভর m এবং বেগ v হলে ভরবেগ p হচ্ছে :

$$p = mv$$

যদি ভরের পরিবর্তন না হয়, তাহলে ভরবেগের পরিবর্তন হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের সাথে ভরের গুণফল। অর্থাৎ m ভরের কোনো বস্তুর বেগ u থেকে বেড়ে v হলে তার ভরবেগের পরিবর্তন $m(v-u)$।

ত্বরণ: ত্বরণ হচ্ছে বেগের পরিবর্তনের হার। অর্থাৎ কোনো বস্তুর বেগ যদি t সময়ে u থেকে পরিবর্তিত হয়ে v হয়, তাহলে তার ত্বরণ a হচ্ছে:

$$a = \frac{(v-u)}{t}$$

আমরা যদি ভরবেগ এবং ত্বরণ বুঝে থাকি তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি বোঝা খুবই সহজ।

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রটি হলো, বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সমানুপাতিক। তবে বলকে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যে আমরা সমানুপাতিক না বলে "সমান" বলতে পারি। অর্থাৎ

২০২১

আমরা বলতে পারি, কোনো বস্তুর ভরবেগ t সময়ে mu থেকে পরিবর্তিত হয়ে mv হলে তার ভরবেগের পরিবর্তনের হার $ma = m(v-u)/t$ প্রযুক্ত বল F-এর সমান হবে। অর্থাৎ,

$$F = \frac{m(v-u)}{t} = ma$$

বলের একক নিউটন। যে পরিমাণ বল এক কিলোগ্রাম ভরের কোনো বস্তুর ওপর প্রযুক্ত হয়ে এক মিটার/সেকেন্ড² ত্বরণ সৃষ্টি করে তাকে এক নিউটন (N) বলে।

উদাহরণ

একটি বস্তুর ভর ২০ কেজি। এর ওপর একটি বল প্রযুক্ত হওয়ায় এর ত্বরণ হলো ২ মি./সে²। প্রযুক্ত বলের মান কত ছিল?

সমাধান: এখানে, বস্তর ভর, m = ২০ কেজি

ত্বরণ, a = ২ মি/সে²

বল, F = ?

আমরা জানি, F = ma

= ২০ কেজি × ২ মি/সে²

= ৪০ নিউটন

উত্তর: ৪০ নিউটন

১০.৩ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বল

তুমি যদি হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দেওয়ালে একটা ঘুষি দাও, তাহলে নিশ্চিতভাবেই তুমি তোমার হাতে ব্যথা পাবে। ঘুষির মাধ্যমে "তুমি" দেওয়ালকে বল দিয়েছ, যদি দেওয়ালের ব্যথা অনুভব করার ক্ষমতা থাকত তাহলে সেটি ব্যথা অনুভব করত কিন্তু তুমি কেন ব্যথা পেয়েছ? কারণটি তুমি নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ। তুমি যখন তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে দেওয়ালে বল প্রয়োগ করেছ, তখন দেওয়ালটিও তোমার মুষ্টিবদ্ধ হাতে পাল্টা একটা বল প্রয়োগ করেছে। এটি সব সময়েই সত্যি, কোথাও বল প্রয়োগ করলে সেটিও পাল্টা বল প্রয়োগ করে।

একক কাজ

কাজ: একটি রাবার ব্যান্ড হাত দিয়ে ধরে দেখ সেটি কত লম্বা। এবারে একটা ছোট বই সুতা দিয়ে রাবার ব্যান্ডের সাথে বেঁধে ঝুলিয়ে দাও, দেখবে রাবার ব্যান্ডটি খানিকটা লম্বা হয়ে বইটিকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমরা জানি, বইটির ওজন আছে, ওজন হচ্ছে বল, কাজেই এই বল বইটিকে নিচের দিকে টানছে। বল প্রয়োগ করলে বস্তু গতিশীল হয় কিন্তু এই বইটি গতিশীল নয় বইটি স্থির, কারণ উপর থেকে রাবার ব্যান্ডটি প্রসারিত হয়ে বইটিকে উপরের দিকে টেনে ওজনের বলটুকু নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে।

অর্থাৎ আমরা বলতে পারি, বইটা রাবার ব্যান্ডকে নিচের দিকে টানছে (তাই রাবার ব্যান্ডটা একটু খানি লম্বা হয়ে গেছে) আবার রাবার ব্যান্ডটা বইটাকে উপরের দিকে টানছে। (তাই বইটা নিচে পড়ে না গিয়ে স্থির হয়ে আছে)।

উপরের উদাহরণগুলো থেকে আমরা দেখতে পাই, আমরা যখনই কোথাও কোনো বল প্রয়োগ করি, তখনই বিপরীত দিকে একটা বল তৈরি হয়। একটি বলকে ক্রিয়া (বল) বলা হলে অন্যটিকে আমরা প্রতিক্রিয়া (বল) বলতে পারি।

আইজ্যাক নিউটন তিনি তাঁর গতিবিষয়ক তৃতীয় সূত্রে বলেছেন: প্রত্যেক ক্রিয়া বলেরই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল আছে।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বল সবসময়ই একটি অন্যটির ওপর কাজ করে—কখনোই একই বস্তুর ওপর কাজ করে না। অর্থাৎ A বস্তু যদি B বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করে তাহলে B বস্তু A বস্তুর উপর বিপরীত দিকে সমান বল প্রয়োগ করবে। প্রতিক্রিয়া বলটি ততক্ষণই থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ক্রিয়া বলটি থাকবে। ক্রিয়া থেমে গেলে প্রতিক্রিয়াও থেমে যাবে। এ ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলদ্বয় বস্তুগুলোর স্থিরাবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় বা সাম্যাবস্থায় থাকা বা একে অপরের সংস্পর্শে থাকা বা না থাকার ওপর নির্ভরশীল নয়—সর্বত্রই বর্তমান থাকে।

ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কয়েকটি উদাহরণ

নিউটনের তৃতীয় সূত্র বোঝার সবচেয়ে সোজা উপায় হচ্ছে আমরা কীভাবে হাঁটি সেটা বোঝা। আমরা সবাই হাঁটতে পারি, এর পেছনে কি পদার্থবিজ্ঞান আছে, সেটা না জেনেই সবাই হাঁটে। কিন্তু তোমরা যেহেতু পদার্থবিজ্ঞান শিখতে শুরু করেছ, তোমাদের খুব সহজ একটা প্রশ্ন করা যায়। তুমি যেহেতু স্থির অবস্থা থেকে হাঁটতে পার, কাজেই আসলে তোমার একটি ত্বরণ হচ্ছে, যার অর্থ তোমার উপর

বল প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু আমরা সবাই জানি, কেউ আমাদের উপর বল প্রয়োগ করে না। আমরা নিজেরাই হাঁটি। কেমন করে সেটা সম্ভব?

নিউটনের তৃতীয় সূত্র না জানা থাকলে আমরা কখনোই হাঁটার বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে পারতাম না। আমরা যখন হাঁটি, তখন আমরা পা দিয়ে মাটিতে ধাক্কা দিই (অর্থাৎ বল প্রয়োগ করি), তখন মাটিটা নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী আমাদের শরীরে সমান এবং বিপরীত বল প্রয়োগ করে (চিত্র ১০.০৩)। এই সমান এবং বিপরীত বলটা দিয়েই আমাদের ত্বরণ হয়, আমরা হাঁটি। একইভাবে মাঝি যখন লগি দিয়ে নদীর তলার মাটিকে ধাক্কা দেয়, তখন নৌকা সামনের দিকে এগিয়ে যায় (চিত্র ১০.০৪)।

চিত্র ১০.০৩: একজন মানুষ হাঁটার সময় পা দিয়ে যখন মাটিকে ধাক্কা দেয়, তখন মাটিও মানুষটিকে পাল্টা ধাক্কা দেয়।

চিত্র ১০.০৪: মাঝি লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়টা যাদের বুঝতে একটু সমস্যা হচ্ছে, তাদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া যায়, শক্ত মাটিতে হাঁটা সোজা কিন্তু ঝুরঝুরে বালুর উপর হাঁটা সোজা না, তার কারণ বালুর ওপর বল প্রয়োগ করা যায় না, বালু সরে যায়— তাই নিউটনের তৃতীয় সূত্রের পাল্টা বলটাও ঠিকভাবে পাওয়া যায় না। ব্যাপারটা আরো অনেক স্পষ্ট করে দেওয়া যায় যদি কাউকে অসম্ভব মসৃণ একটা মেঝেতে সাবান পানি কিংবা তেল দিয়ে পিচ্ছিল করে হাঁটতে দেওয়া হয়। সেখানে ঘর্ষণ খুব কম, তাই আমরা পিছনে বল প্রয়োগ করতেই পারব না এবং সে জন্য তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে আমাদের ওপর কোনো বলও পাব না। আর তাই হাঁটতেও পারব না (বিশ্বাস না হলে চেষ্টা করে দেখতে পার)। বল প্রয়োগ করলে বিপরীত এবং সমান বল পাওয়া যায়, যদি প্রয়োগ করতেই না পারি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া বল পাব কেমন করে? আর হাঁটব কেমন করে?

তুমি ওজন মাপার যন্ত্রের উপর দাঁড়াও। সেখানে তোমার ওজন দেখতে পাবে, এটি হচ্ছে ওজন মাপার যন্ত্রের উপর তোমার প্রযুক্ত বল। এখন তুমি যদি উপরে উঠতে চাও তাহলে নিশ্চিতভাবে নিচ থেকে তোমার উপর উপরের দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে। সেই বলটি কোথা থেকে আসবে?

একক কাজ

কাজ: তুমি একটি লাফ দিয়ে দেখো। দেখবে মুহূর্তের জন্য ওজন মাপার যন্ত্রের কাঁটাটি সরে গিয়ে অনেক বেশি ওজন দেখাচ্ছে। তুমি এই বাড়তি বলটুকু মুহূর্তের জন্য নিচের দিকে প্রয়োগ করেছ এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ওজন মাপার যন্ত্রটি তোমার উপর উপরের দিকে বল প্রয়োগ করছে। সেই প্রতিক্রিয়া বলের কারণে তুমি উপরে উঠতে পেরেছ।

একক কাজ

কাজ: একটি বেলুন নিয়ে একে ভালোভাবে ফোলাও। হাত দিয়ে শক্ত করে মুখ বন্ধ করে রাখ। এর পর হঠাৎ হাত ছেড়ে বেলুনটিকে মুক্ত করে দাও। (চিত্র: ১০.০৫)। কী দেখলে? তুমি দেখবে বেলুনটি উড়ে বেড়াচ্ছে! বেলুনটিকে যখন ফোলানো হয়েছে তখন বেলুনের রাবারটি প্রসারিত হয়ে ভিতরকার বাতাসের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করেছে। যখন তুমি বেলুনের মুখটি ছেড়ে দিয়েছ, তখন বেলুনটি ভেতরকার বাতাসের উপর বল প্রয়োগ করে বেলুনের মুখ দিয়ে সজোরে বের করতে শুরু করেছে। বেলুনটি যখন বাতাসের উপর বল প্রয়োগ করতে শুরু করেছে, তখন বেলুনের বাতাসও বেলুনটির উপর বল প্রয়োগ করতে শুরু করেছে। এই বলের কারণে বেলুনটি বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করেছে।

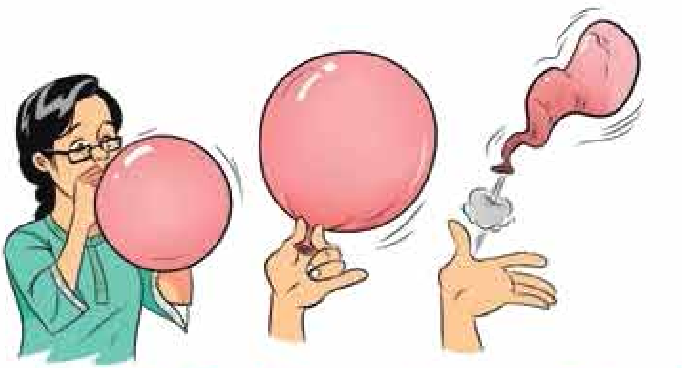

চিত্র ১০.০৫: বেলুন থেকে পিছন দিকে বাতাস বের হওয়ার সময় বেলুনটি সামনে এগিয়ে যায়।

১০.৪ বলের প্রকৃতি (Nature of Force)

১০.৪.১ চারটি মৌলিক বল

পৃথিবীতে কত ধরনের বল আছে জিজ্ঞেস করা হলে তোমরা নিশ্চয়ই বলবে অনেক ধরনের। কোনো কিছুকে যদি ধাক্কা দিই, সেটা একটা বল, ট্রাক যখন বোঝা টেনে নিয়ে যায়, সেটা একটা বল, ঝড়ে যখন গাছ উপড়ে পড়ে, সেটা একটা বল, চুম্বক যখন লোহাকে আকর্ষণ করে সেটা একটা বল, বোমা বিস্ফোরণে যখন ঘরবাড়ি উড়িয়ে দেয়, সেটা একটা বল, ক্রেন যখন কোনো কিছুকে টেনে তোলে সেটা একটা বল। একটুখানি সময় দিলেই এ রকম নানা ধরনের বলের তোমরা একটা বিশাল তালিকা তৈরি করতে পারবে।

কিন্তু চমকপ্রদ ব্যাপারটি কী জান? প্রকৃতিতে মাত্র চার রকমের বল রয়েছে, ওপরে যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, সেগুলোকে বিশ্লেষণ করা হলে দেখা যাবে, এগুলো ঘুরে-ফিরে এই চার রকমের বাইরে কোনোটা নয়। আসলে মৌলিক বল মাত্র চারটি। সেগুলো হচ্ছে: মহাকর্ষ বল, তড়িৎ চৌম্বক বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল, দুর্বল নিউক্লীয় বল ও সবল নিউক্লীয় বল।

মহাকর্ষ বল (Gravitation)

এই সৃষ্টিজগতের সকল বস্তু তাদের ভরের কারণে একে অপরকে যে বল দিয়ে আকর্ষণ করে, সেটাই হচ্ছে মহাকর্ষ বল। এই মহাকর্ষ বলের কারণে গ্যালাক্সির ভেতরে নক্ষত্ররা ঘুরপাক খায় কিংবা সূর্যকে ঘিরে পৃথিবী ঘোরে, পৃথিবীকে ঘিরে চাঁদ ঘোরে। পৃথিবীর মহাকর্ষ বল যখন আমাদের ওপর কাজ করে, আমরা সেটাকে বলি মাধ্যাকর্ষণ। এই মাধ্যাকর্ষণ বল আমাদেরকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনে রেখেছে এবং এর কারণেই আমরা নিজেদের ওজনের অনুভূতি পাই।

পদার্থবিজ্ঞানের একটি চমকপ্রদ বল হচ্ছে মহাকর্ষ বল। ভর আছে সেরকম যেকোনো বস্তু অন্য বস্তুকে মহাকর্ষ বল দিয়ে আকর্ষণ করে।

তড়িৎ চৌম্বক বল বা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় বল (Electromagnetic Force)

চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে সেটা দিয়ে কাগজের টুকরোকে আকর্ষণ করা বা চুম্বক দিয়ে অন্য চুম্বককে আকর্ষণ-বিকর্ষণ আমাদের অনেকেই কখনো না কখনো করেছি। যদিও তড়িৎ বা বিদ্যুৎ এবং চুম্বকের বলকে আলাদা ধরনের বল মনে হয়, আসলে দুটি একই বল শুধু দুইভাবে দেখা যায়। শুধু এই বলটা আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ দুটোই করতে পারে অন্যগুলো শুধু আকর্ষণ করতে পারে বিকর্ষণ করতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় এটা অনেক শক্তিশালী ($১০^{৩৬}$ গুণ বা ট্রিলিওন ট্রিলিওন ট্রিলিওন গুণ শক্তিশালী!) কথাটা যে সত্যি সেটা নিশ্চয়ই তোমরা সহজেই অনুমান করতে পারবে। কারণ যখন তুমি একটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে একটা কাগজকে আকর্ষণ করে তুলে নাও, তখন কিন্তু সেই কাগজটাকে

২০২৩

পুরো পৃথিবী তার সমস্ত ভর দিয়ে তৈরি মাধ্যাকর্ষণ বল দিয়ে টেনে রাখার চেষ্টা করে, তবুও তোমার চিরুনির অল্প একটু বিদ্যুৎ সেই বিশাল পৃথিবীর পুরো মাধ্যাকর্ষণকে হারিয়ে দেয়।

দুর্বল নিউক্লীয় বল (Weak Force)

এটাকে দুর্বল বলা হয় কারণ এটা তড়িৎ চৌম্বক বল থেকে দুর্বল (প্রায় ট্রিলিওন গুণ) কিন্তু মোটেও মহাকর্ষ বলের মতো এত দুর্বল নয়। মহাকর্ষ এবং তড়িৎ চৌম্বক বল যেকোনো দূরত্ব থেকে কাজ করতে পারে কিন্তু এই বলটা খুবই অল্প দূরত্বে ($১০^{-১৮}$ "m") কাজ করে। তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াস থেকে যে বেটা (β) রশ্মি বা ইলেকট্রন বের হয় সেটার কারণ এই দুর্বল নিউক্লীয় বল।

সবল নিউক্লীয় বল (Strong Nuclear Force)

এটি হচ্ছে সৃষ্টি জগতের সবচেয়ে শক্তিশালী বল, তড়িৎ চৌম্বক বল থেকেও একশগুণ বেশি শক্তিশালী কিন্তু এটাও খুবই অল্প দূরত্বে ($১০^{-১৫}$ "m") কাজ করে। পরমাণুর কেন্দ্রে যে নিউক্লিয়াস রয়েছে তার ভেতরকার প্রোটন এবং নিউট্রনের নিজেদের মাঝে এই প্রচণ্ড শক্তিশালী বল কাজ করে নিজেদের আটকে রাখে। প্রচণ্ড বলে আটকে থাকার কারণে এর মাঝে অনেক শক্তি জমা থাকে তাই বড় নিউক্লিয়াসকে ভেঙে কিংবা ছোট নিউক্লিয়াসকে জোড়া দিয়ে এই বলের কারণে অনেক শক্তি তৈরি করা সম্ভব। নিউক্লিয়ার বোমা সে জন্য এত শক্তিশালী। সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলো ও তাপ এই বল দিয়ে তৈরি হয়।

বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন, এই চার ধরনের বলের মূল এক জায়গায় এবং তাঁরা সবগুলোকে এক সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছেন। তড়িৎ চৌম্বক (বিদ্যুৎ চৌম্বকীয়) এবং দুর্বল নিউক্লিয়ার বলকে এর মাঝে একই সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়েছে এবং সেটি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের একটি আকাশছোঁয়া সাফল্য। (কাজেই তুমি ইচ্ছে করলে বলতে পার বল তিন ধরনের: মহাকর্ষ, ইলেকট্রো উইক (Electro-weak) এবং নিউক্লিয়ার বল। (কেউ এটাকে ভুল বলতে পারবে না) অন্যগুলোকেও একসূত্রে গাঁথার জন্য বিজ্ঞানীরা কাজ করে যাচ্ছেন।

১০.৪.২ স্পর্শ বল এবং অস্পর্শ বল

তোমরা যখন তোমাদের দৈনন্দিন জীবনে নানা কাজে বল ব্যবহার কর তখন তোমাদের মনে হতে পারে কোনো কোনো বল প্রয়োগ করতে হলে স্পর্শ করতে হয় (ক্রেন দিয়ে ভারী জিনিস তোলা, কোনো কিছুকে ধাক্কা দেওয়া, কিংবা চলতে চলতে ঘর্ষণের জন্য চলন্ত বস্তুর থেমে যাওয়া) আবার তোমরা লক্ষ করেছ, কোনো কোনো বল প্রয়োগের জন্য স্পর্শ করতে হয় না (কোনো কিছু ছেড়ে দিলে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য নিচে পড়া, চুম্বকের আকর্ষণ) কাজেই আমরা বলকে স্পর্শ এবং অস্পর্শ দুই ধরনের বলে ভাগ করতে পারি। স্পর্শ বলের উদাহরণ হিসেবে আমরা ঘর্ষণ বল নিয়ে আলোচনা করব।

যদিও আমরা ঘর্ষণ বলকে স্পর্শ বলের উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করছি, কিন্তু তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমরা যেখানে স্পর্শ করছি বলে ধারণা করছি, সেখানে কিন্তু পরস্পরের অণু-পরমাণু, তাদের ঘিরে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন সরাসরি স্পর্শ দিয়ে নয়, তাদের তড়িৎ চৌম্বক বল দিয়ে একে অন্যের সাথে কাজ করছে। অন্য কথায় বলা যায়, আমরা যদি আণবিক-পারমাণবিক পর্যায়ে চলে যাই, তাহলে সব বলই অস্পর্শক। এক পরমাণু অন্য পরমাণুকে আকর্ষণ-বিকর্ষণ করে দূর থেকে, তাদেরকে আক্ষরিক অর্থে স্পর্শ করতে হয় না।

১০.৫ ঘর্ষণ বল (Frictional Force)

ধরা যাক, একটা টেবিলে কোনো একটা কাঠের টুকরো রয়েছে এবং সেই কাঠের টুকরোর ওপর বল প্রয়োগ করে সেখানে ত্বরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছি। ধরা যাক, ১০.০৬ চিত্রে যেভাবে দেখানো হয়েছে, সেভাবে ভরটির ওপর বাম থেকে ডানে F বল প্রয়োগ করছি, দেখা যাবে কাঠের টুকরোয় টেবিলের সাথে কাঠের টুকরোর ঘর্ষণের কারণে একটা ঘর্ষণ বল f তৈরি হয়েছে এবং সেটি ডান থেকে বাম দিকে কাজ করে প্রয়োগ করা বলটিকে কমিয়ে দিচ্ছে।

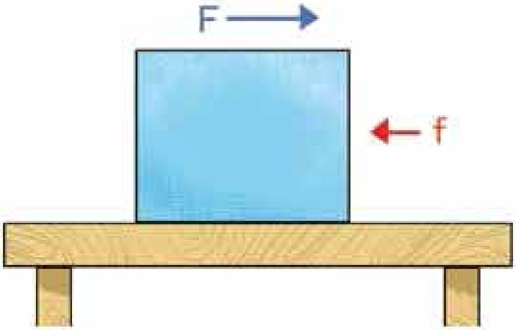

চিত্র ১০.০৬: একটি ভরের উপর বল প্রয়োগ করলে ঘর্ষণের জন্য বিপরীত দিকে একটি বল তৈরি হতে পারে।

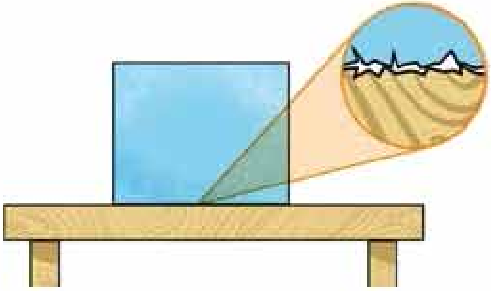

চিত্র ১০.০৭: ঘর্ষণ প্রকৃতপক্ষে দুটি এবড়োখেবড়ো পৃষ্ঠের কারণে তৈরি হয়।

কাঠের টুকরোর ওপরে যদি খানিকটা ওজন বসিয়ে দিই, দেখা যাবে ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে গেছে। ঘর্ষণ বল কীভাবে তৈরি হয় ব্যাপারটা বুঝতে পারলেই আমরা দেখব এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। যদিও আপাতদৃষ্টিতে কাঠ, টেবিলকে (কিংবা যে দুটো তলদেশের মাঝে ঘর্ষণ হচ্ছে) অনেক মসৃণ মনে হয় কিন্তু অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে (চিত্র ১০.০৭) সব তলদেশেই এবড়োখেবড়ো এবং এই এবড়োখেবড়ো অংশগুলো যখন একে অন্যকে স্পর্শ করে বা খাঁজগুলো একে অন্যের সাথে আটকে যায়, সেটার কারণেই গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং আমরা বলি বিপরীত দিক থেকে ঘর্ষণ বলের জন্ম হয়েছে।

যদি দুটো তলদেশকে আরো চাপ দেওয়া হয় তাহলে এবড়োথেবড়ো অংশ আরো বেশি একে অন্যকে স্পর্শ করবে, একটির খাঁজ অন্যটির আরো গভীর খাঁজে ঢুকে যাবে এবং ঘর্ষণ বল আরো বেড়ে যাবে।

ঘর্ষণের জন্য তাপ সৃষ্টি হয়। সেটা অনেক সময়েই সমস্যা। যেমন গাড়ির সিলিন্ডারে পিস্টনকে ওঠা-নামা করার সময়ে সেখানে ঘর্ষণের জন্য তাপের সৃষ্টি হয় আর সেই তাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য গাড়ির ইঞ্জিনকে শীতল রাখতে হয়। তাই সেখানে ঘর্ষণ কমানোর জন্য নানা ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

১০.৫.১ ঘর্ষণের প্রকারভেদ

ঘর্ষণকে চারভাগে ভাগ করা যায়। স্থিতি ঘর্ষণ, গতি ঘর্ষণ, আবর্ত ঘর্ষণ এবং প্রবাহী ঘর্ষণ:

স্থিতি ঘর্ষণ (Static Friction): দুটি বস্তু একে অন্যের সাপেক্ষে স্থির থাকা অবস্থায় যে ঘর্ষণ বল থাকে, সেটা হচ্ছে স্থিতি ঘর্ষণ। স্থিতি ঘর্ষণের জন্য আমরা হাঁটতে পারি, আমাদের পা কিংবা জুতোর তলা মাটিতে স্থিতি ঘর্ষণে আটকে থাকে এবং পিছলে পড়ে যাই না।

গতি ঘর্ষণ (Sliding Friction): একটি বস্তুর সাপেক্ষে অন্য বস্তু যখন চলমান হয়, তখন যে ঘর্ষণ বল তৈরি হয়, সেটি হচ্ছে গতি ঘর্ষণ। সাইকেলের ব্রেক চেপে ধরলে সেটি সাইকেলের চাকাকে চেপে ধরে এবং ঘুরন্ত চাকাকে গতি ঘর্ষণের কারণে থামিয়ে দেয়। গতি ঘর্ষণ ওজনের উপর নির্ভর করে, ওজন যত বেশি হবে, গতি ঘর্ষণ তত বেশি হবে।

আবর্ত ঘর্ষণ (Rolling Friction): একটি তলের উপর যখন অন্য একটি বস্তু গড়িয়ে বা ঘুরতে ঘুরতে চলে, তখন সেটাকে বলে আবর্ত ঘর্ষণ। সবগুলো ঘর্ষণ বলের মধ্যে এটা সবচেয়ে ছোট তাই আমরা সবসময়েই সকল রকম যানবাহনের মাঝে চাকা লাগিয়ে নেই। চাকা লাগানো স্যুটকেস খুব সহজে টেনে নেওয়া যায়- যদি এর চাকা না থাকত তাহলে মেঝের উপর টেনে নিতে আমাদের অনেক বেগ পেতে হতো।

প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid Friction): যখন কোনো বস্তু তরল বা বায়বীয় পদার্থের (Fluid) ভেতর দিয়ে যায়, তখন সেটি যে ঘর্ষণ বল অনুভব করে, সেটি হচ্ছে প্রবাহী ঘর্ষণ। প্যারাস্যুট নিয়ে যখন কেউ প্লেন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন বাতাসের প্রবাহী ঘর্ষণের কারণে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসতে পারে। (চিত্র ১০.০৮)

চিত্র ১০.০৮: মহাকাশযান এপোলো ১৫-এর ক্যাপসুল প্যারাস্যুট নিয়ে সমুদ্রে নামানো হচ্ছে।

একক কাজ

প্রবাহী ঘর্ষণ

কাজ: একটা কাগজ উপর থেকে ছেড়ে দাও, নিচে পড়তে কতোটুকু সময় লেগেছে অনুমান করো। এবারে কাগজটি দলামোচা করে ছোট একটা বলের মত করে ছেড়ে দাও। এবারে নিচে পড়তে কতো সময় লেগেছে? কেন?

একক কাজ

স্থিতি ঘর্ষণ এবং গতি ঘর্ষণ

কাজ: কয়েকটা ম্যাচের খালি বাক্স নাও। সেগুলোর ভেতরে মাটি ভরে বাক্সগুলো খানিকটা ভারী করে নাও। এবারে একটা বইয়ের উপর ম্যাচ বাক্সটা রেখে বইটা ঢালু করতে থাকো। স্থিতি ঘর্ষণের কারণে ম্যাচটি গড়িয়ে যাবে না, তবে একটা নির্দিষ্ট কোণে গেলে ম্যাচ বাক্সটা গড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। এই অবস্থায় ম্যাচ বাক্সের গতি ঘর্ষণ কার্যকর হতে শুরু করেছে। একটা ম্যাচ বাক্সের উপর আরো একটি বা কয়েকটি ম্যাচ বাক্স রেখে পরীক্ষাটি আবার করো, দেখবে প্রতিবার তুমি একই ফলাফল পাবে। একাধিক ম্যাচবাক্স রেখে তুমি ওজন বাড়িয়ে স্থিতি ঘর্ষণ বাড়িয়ে দিচ্ছ কিন্তু ঢালু করার সময় একই মাত্রায় ঢালের দিকে বলটি বেড়ে যাচ্ছে বলে ফলাফলের পরিবর্তন হচ্ছে না।

আমরা আগেই বলেছি ঘর্ষণ বল সবসময়েই প্রয়োগ করা বলের বিপরীত দিকে কাজ করে। সেজন্য স্বাভাবিকভাবেই ঘর্ষণ বল গতিকে কমিয়ে দেয় এবং আমাদের ধারণা হতে পারে আমরা সর্বক্ষেত্রে বুঝি ঘর্ষণ কমানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সেটি সত্যি নয়। তোমরা নিশ্চয়ই কখনো না কখনো কাদার মাঝে কোনো গাড়ি বা ট্রাককে আটকে যেতে দেখেছ। তখন গাড়ির চাকা ঘুরলেও ঘর্ষণ কম বলে কাদা থেকে গাড়ি বা ট্রাক উঠে আসতে পারে না। চাকা পিছলিয়ে যায়। তখন গাড়ি বা ট্রাকটিকে তুলে আনার জন্য অন্যভাবে চাকা এবং কাদার মধ্যে ঘর্ষণ বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়।

১০.৫.২ ঘর্ষণ বাড়ানো-কমানো

আমরা এর মাঝে জেনে গেছি যে আমাদের প্রয়োজনে ঘর্ষণকে কখনো বাড়াতে হয় এবং কখনো কমাতে হয়।

ঘর্ষণ কমানো: ঘর্ষণ কমানোর জন্য আমরা যেসব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে:

১. যে পৃষ্ঠটিতে ঘর্ষণ হয়, সেই পৃষ্ঠটিকে যত সম্ভব মসৃণ করা। মসৃণ পৃষ্ঠে গতি ঘর্ষণ কম।

২. তেল মবিল বা গ্রিজ-জাতীয় পদার্থ হচ্ছে পিচ্ছিলকারী পদার্থ বা লুব্রিকেন্ট। দুটি তলের মাঝখানে এই লুব্রিকেন্ট থাকলে ঘর্ষণ অনেকখানি কমে যায়।

৩. চাকা ব্যবহার করে ঘর্ষণ কমানো যায়। চাকা ব্যবহার করা হলে বড় গতি ঘর্ষণের পরিবর্তে অনেক ছোট আবর্ত ঘর্ষণ দিয়ে কাজ করা যায়। ঘুরন্ত চাকাতে বল বিয়ারিং ব্যবহার করে সরাসরি ঘর্ষণের বদলে ছোট স্টিলের বলগুলোর আবর্তন ঘর্ষণের সাহায্যে ঘর্ষণ অনেক কমানো সম্ভব।

৪. গাড়ি, বিমান এ ধরনের দ্রুতগামী যানবাহনের ডিজাইন এমনভাবে করা হয়, যেন বাতাস ঘর্ষণ তৈরি না করে স্ট্রিম লাইন করা পৃষ্ঠদেশের উপর দিয়ে যেতে পারে।

৫. যে দুটি পৃষ্ঠদেশে ঘর্ষণ হয়, তারা যদি খুব অল্প জায়গায় একে অন্যকে স্পর্শ করে তাহলে ঘর্ষণ কমানো যায়।

৬. আমরা দেখেছি ঘর্ষণরত দুটি পৃষ্ঠে বল প্রয়োগ করা হলে ঘর্ষণ বেড়ে যায়, কাজেই লম্বভাবে আরোপিত বল কমানো হলে ঘর্ষণ কমানো যায়।

ঘর্ষণ বাড়ানো: ঘর্ষণ কমানোর জন্য যে প্রক্রিয়াগুলো করা হয়, সেগুলো করা না হলে কিংবা তার বিপরীত কাজগুলো করা হলেই ঘর্ষণ বেড়ে যায়। তাই ঘর্ষণ বাড়ানোর জন্য আমরা যে সব কাজ করি সেগুলো হচ্ছে:

১. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হচ্ছে, সেগুলো অমসৃণ বা খসখসে করে তোলা।

২. যে দুটি তলে ঘর্ষণ হয়, সেগুলো আরো জোরে চেপে ধরার ব্যবস্থা করা।

৩. ঘর্ষণরত তল দুটির মাঝে গতিকে থামিয়ে স্থির করে ফেলা, কারণ স্থির ঘর্ষণ গতি ঘর্ষণ থেকে বেশি।

৪. ঘর্ষণরত তলের মাঝে খাঁজ কাটা বা ঢেউ খেলানো করা। তাহলে এটি তলদেশকে জোরে আঁকড়ে ধরতে পারে। পানি বা তরল থাকলে সেটি খাঁজে ঢুকে গিয়ে পৃষ্ঠদেশের ঘর্ষণ বাড়াতে পারে।

৫. বাতাস বা তরলের ঘনত্ব বাড়ানো।

৬. বাতাস বা তরলে ঘর্ষণরত পৃষ্ঠদেশ বাড়িয়ে দেওয়া।

৭. চাকা বা বল বিয়ারিং সরিয়ে দেওয়া।

১০.৫.৩ ঘর্ষণ: একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব

আমরা সবাই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছি যে ঘর্ষণের কারণে তাপশক্তি তৈরি হয়। শীতের দিনে আমরা হাত ঘষে হাত উত্তপ্ত করি। গাড়ির ইঞ্জিন যে গরম হয়ে ওঠে, সেটিও ঘটে ঘর্ষণের কারণে। কাজেই ঘর্ষণের কারণে অপ্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে শক্তির অপচয় হয়। গাড়ি, প্লেন, জাহাজ, সাবমেরিনকে ঘর্ষণ বলকে পরাস্ত করে এগিয়ে যেতে হয়, সেখানেও অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করতে হয়। এভাবে দেখা হলে মনে হতে পারে ঘর্ষণ বুঝি আমাদের জীবনের একটি উপদ্রব ছাড়া আর কিছু নয়।

আবার আমরা এর মাঝে দেখেছি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা হাঁটতে পারি, রাস্তায় গাড়ি চলতে পারে, কাগজে পেন্সিল কলম দিয়ে লিখতে পারি, দালান গড়ে তুলতে পারি, প্যারাস্যুট দিয়ে নিরাপদে নিচে নামতে পারি। আমরা এ ধরনের অসংখ্য উদাহরণ দিতে পারি যেখানে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় কাজগুলো করতে পারতাম না।

কাজেই ঘর্ষণকে উপদ্রব মনে করা হলেও আমাদের মেনে নিতে হবে এটি আমাদের জীবনের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটি উপদ্রব।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. গাছ থেকে একটি ফল মাটিতে পড়ল—এটি কোন বলের উদাহরণ?

(ক) মহাকর্ষ বল

(খ) চৌম্বক বল

(গ) তড়িত চৌম্বক বল

(ঘ) দুর্বল নিউক্লীয় বল

২. বল :

(i) বস্তুর দিক অপরিবর্তিত রাখে

(ii) বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করে

(iii) স্থির বস্তুকে গতিশীল করে

২০২৩

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

২N বল প্রয়োগ করায় একটি বস্তুর ত্বরণ হল ৪ মি/সে^{2}। বল প্রয়োগ বন্ধ করে বস্তুটিকে মেঝেতে ছেড়ে দেওয়া হলো। বস্তুটি কিছুদূর যাওয়ার পর থেমে গেল।

৩. বস্তুর ভর কত?

(ক) ২০০ gm

(খ) ৪০০ gm

(গ) ৫০০ gm

(ঘ) ৭৫০ gm

৪. কোন বলের কারণে বস্তুটি থেমে গেল?

(ক) ঘর্ষণ বল

(খ) মহাকর্ষ বল

(গ) চৌম্বক বল

(ঘ) তড়িত চৌম্বক বল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্বপ্না বাসে কুমিল্লা থেকে ঢাকা যাচ্ছিল। বাসটির ভর ছিল ১৪০০ kg এবং এটি ৪ মি/সে^{2} ত্বরণে চলছিল। চলন্ত বাসটিতে হঠাৎ ড্রাইভার ব্রেক চাপলে স্বপ্নাসহ যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। আবার বাসটি যখন চলতে শুরু করল, তখন তারা পিছনের দিকে হেলে পড়ল।

(ক) স্পর্শ বল কাকে বলে?

(খ) বল বলতে কী বুঝায়?

(গ) বাসটির ওপর ক্রিয়াশীল বলের মান নির্ণয় করো।

(ঘ) যাত্রীরা প্রথমে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেও পরবর্তীতে পিছনে হেলে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২. তূর্য দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে থাকে। একদিন সে বাসায় একটি ভারী টেবিলের সামনের চেয়ারে বসে টেবিলকে টানতে শুরু করল। কিন্তু চেয়ারসহ সে নিজেই টেবিলের দিকে সরে গেল। পরদিন সে একটি মার্বেলকে রুমের মসৃণ মেঝেতে নির্দিষ্ট বলে গড়িয়ে দিল। এরপর বাসার বাইরে পিচের রাস্তায় একই মার্বেলকে একই বলে গড়িয়ে দিল। তখন এটি তার চেয়ে কম দূরত্ব অতিক্রম করল।

(ক) নিউটনের গতিবিষয়ক দ্বিতীয় সূত্রটি কী?

(খ) জড়তা বলতে কী বুঝায়?

(গ) চেয়ারসহ তূর্য টেবিলের দিকে সরে আসলো কেন? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) মার্বেলটির দুইটি স্থানে অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করো।

একাদশ অধ্যায়

জীবপ্রযুক্তি

পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্লোন ডলি নামের একটি ভেড়া

আধুনিক বংশগতি বিদ্যার (Genetics) ভিত্তি গড়ে উঠেছে আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছর পূর্বে গ্রেগর মেন্ডেল নামে একজন অস্ট্রীয় ধর্মযাজকের গবেষণার মাধ্যমে। মেন্ডেলের আবিষ্কারের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে জীবের প্রতিটি বৈশিষ্ট্য এক জোড়া ফ্যাক্টর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নাম দিলেন জিন। বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই বংশগতি বিদ্যা নানাভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে। নানা তথ্যে সমৃদ্ধ হতে থাকে এর ভান্ডার। বংশগতির একক বা জিনের উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক এবং অণুর গঠন ও জৈবনিক প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো আবিষ্কৃত হওয়ার পর জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন, নিষেক ছাড়াই কীভাবে একটা জীবকোষ থেকে জিন আরেকটা জীবকোষে প্রতিস্থাপন করা যায়, সেটি নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক হার্বার্ট বয়ার এবং স্ট্যানলি কোহেন ১৯৭৩ সালে প্রথম নিষেক ছাড়াই কৃত্রিমভাবে জিন সংযোজনে সাফল্য লাভ করেন। জীববিজ্ঞানের ইতিহাসে যেটি ছিল এক অচিন্তনীয় ঘটনা। স্থাপিত হলো জীবপ্রযুক্তি (Biotechnology) নামে জীববিজ্ঞানের নতুন এক শাখা।

আমরা এ অধ্যায়ে জীবপ্রযুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার পূর্বে ক্রোমোজোম, জিন, ডিএনএ ও আরএনএ সম্বন্ধে আলোচনা করব। এগুলো সম্পর্কে আমরা অষ্টম শ্রেণিতে খানিকটা ধারণা পেয়েছি। এ অধ্যায়ে বিস্তারিত জানব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় স্থানান্তরের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিএনএ টেস্টের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- জেনেটিক বিশৃঙ্খলার (Genetic Disorder) কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারব।
- জীবপ্রযুক্তি এবং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাণী ও উদ্ভিদে ক্লোনিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারব।
- জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজির ব্যবহার এবং এদের সুফল বিশ্লেষণ করতে পারব।

১১.১ ক্রোমোজোম

কোষ হচ্ছে জীবদেহের একক। যেটি অন্য কোনো সজীব মাধ্যমের সাহায্য ছাড়াই নিজের প্রতিরূপ তৈরি করতে পারে। কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, এক ধরনের কোষে কোনো সুগঠিত নিউক্লিয়াস থাকে না, অন্য ভাগে সুগঠিত নিউক্লিয়াস (চিত্র ১১.০১) থাকে, এই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতর জীবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক উপাদান থাকে, যার একটি হচ্ছে ক্রোমোজম।

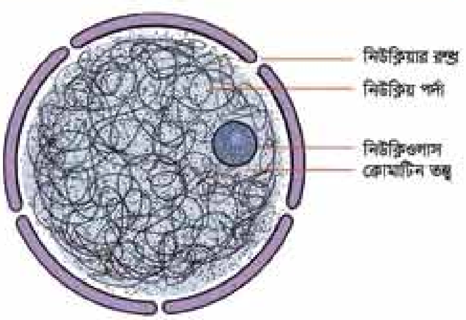

চিত্র ১১.০১: নিউক্লিয়াস

প্রতিটি প্রকৃত কোষবিশিষ্ট জীবের নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমে অনেক ক্রোমাটিন ফাইবার বা তন্তু থাকে। কোষের স্বাভাবিক অবস্থায় এগুলো নিউক্লিয়াসের ভিতরে বিশৃংখল অবস্থায় থাকে। কোষ বিভাজনের সময় পানি বিয়োজনের ফলে এগুলো স্পষ্ট আকার ধারণ করে এবং আকারে এগুলো সুতার মতো হয়। এগুলোকে ক্রোমোজোম (চিত্র ১১.০২) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রোফেজ ও মেটাফেজ দশায় ক্রোমোজোমগুলো স্পষ্ট হয়। প্রতিটি প্রজাতির কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট। অর্থাৎ একটি প্রজাতির প্রাণী অথবা উদ্ভিদ কোষে যদি ১২টি ক্রোমোজোম থাকে, তাহলে সেই প্রজাতির সকল সদস্যের কোষে সবসময় ক্রোমোজোমের সংখ্যা ১২ থাকবে।

১১.১.১ ক্রোমোজোমের আকৃতি

ক্রোমোজোমের আকার সাধারণত লম্বা। প্রতিটি ক্রোমোজোমের দেহ দুই গুচ্ছ সুতার মতো অংশ নিয়ে গঠিত (চিত্র ১১.০৩)। প্রতিগুচ্ছ সুতার মতো অংশকে ক্রোমোনেমা (বহুবচনে ক্রোমোনেমাটা) বলে। কোষ বিভাজনের সময় প্রতিটি ক্রোমোজোম সমান দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এদের প্রতিটিকে ক্রোমাটিড বলে। প্রতিটি ক্রোমাটিড একটি ক্রোমোনেমা নিয়ে গঠিত।

চিত্র ১১.০২: ক্রোমোজোম

বর্তমানে কোষতত্ত্ববিদরা বলেন ক্রোমাটিড ও ক্রোমোনেমা ক্রোমোজোমের একই অংশের দুটি নাম। মাইটোসিস কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশায় প্রত্যেকটি ক্রোমোজোমে যে

গোলাকৃতি ও সংকুচিত স্থান দেখা যায়, তার নাম সেন্ট্রোমিয়ার। অনেকে আবার একে কাইনেটোকোরও বলে। ক্রোমোজোমের সেন্ট্রোমিয়ারের উভয় পার্শ্বের অংশকে বাহু বলা হয়। পূর্বে ধারণা করা হতো ক্রোমোজোম একটা মাতৃকা বা খাত্র দ্বারা আবৃত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি কিছু প্রোটিন ও অজৈব পদার্থের সমাবেশ, যা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ছাড়া দেখা যায় না।

ক্রোমোজোমের প্রকারভেদ

উচ্চ শ্রেণির প্রাণী বা উদ্ভিদের কোষের ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রকারভেদ দেখা যায়। এদের দেহকোষে যতগুলো ক্রোমোজোম থাকে, তাদের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোজোম অন্যান্য ক্রোমোজোম থেকে ভিন্নধর্মী। এই ভিন্নধর্মী ক্রোমোজোমকে সেক্স ক্রোমোজোম বলা হয়। বাকি ক্রোমোজোমগুলোকে অটোজোম (Autosome) বলা হয়। সেক্স ক্রোমোজোমগুলোকে সাধারণত X ও Y নামে নামকরণ করা হয়ে থাকে। তোমরা এর মাঝে আগের অধ্যায়ে দেখে এসেছ যে মানুষের প্রতিটি দেহকোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম আছে এর মাঝে ২২ জোড়া অটোজোম এবং এক জোড়া সেক্স ক্রোমোজোম।

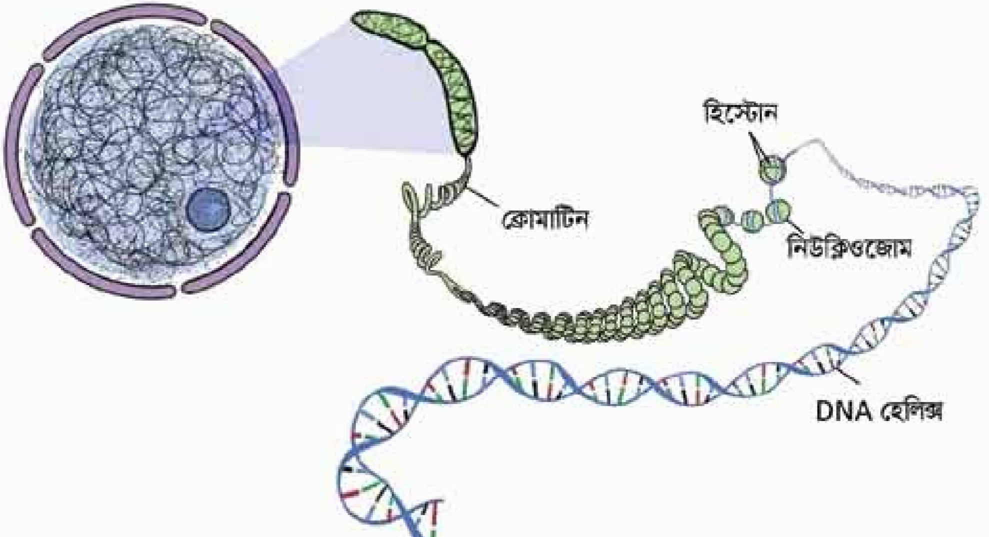

চিত্র ১১.০৩: নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোম ও DNA-এর অবস্থান।

১১.১.২ ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠন

ক্রোমোজোমের রাসায়নিক গঠনে দেখা যায় এর মধ্যে রয়েছে নিউক্লিক এসিড, প্রোটিন এবং অন্যান্য উপাদান।

নিউক্লিক এসিড: নিউক্লিক এসিড দুই ধরনের হয়, (ক) ডিএনএ বা ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (DNA) এবং (খ) আরএনএ বা রাইবোনিউক্লিক এসিড (RNA)।

ডিএনএ (DNA)

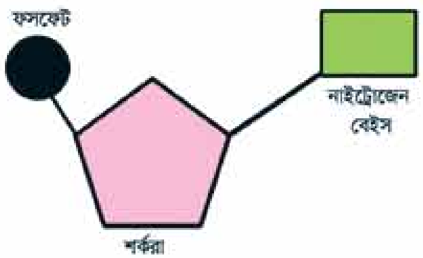

চিত্র ১১.০৪: নিউক্লিওটাইড

ডিএনএ-এর পূর্ণ নাম ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড। ডিএনএ সকল জীবের আদি বস্তু এবং জীবকোষের নিউক্লিয়াসের সকল ক্রোমোজোমে এর অবস্থান রয়েছে। এ তথ্যটি উদঘাটিত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা ডিএনএর গাঠনিক উপাদান জানার কাজে সচেষ্ট হলেন। ১৯৫৩ সালে জেমস ওয়াটসন ও ফ্রানসিস ক্রিক ডিএনএ অণুর গঠন বের করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য ১৯৬২ সালে তারা নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। তারা দেখিয়েছিলেন যে ডিএনএ অণু আসলে দুটি সুতার মতো লম্বা নিওক্লিওটাইডের (চিত্র ১১.০৪) শেকল বা পলিনিউক্লিওটাইড। প্রতিটি নিউক্লিওটাইডে রয়েছে একটি করে পাঁচ কার্বনের রাইবোজ শর্করা। একটি ফসফেট এবং নাইট্রোজেন ক্ষারক। ডিএনএ অণুর আকৃতি প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো (চিত্র ১১.০৫)। প্যাঁচানো সিঁড়ির দুপার্শ্বের মূল কাঠামো গঠিত হয় নিওক্লিওটাইডের পাঁচ কার্বন যুক্ত শর্করা এবং ফসফেট দিয়ে। শর্করা ফসফেটের কাঠামোটি বাইরের কাঠামো। ভেতরে নিউক্লিওটাইডগুলো যুক্ত থাকে নাইট্রোজেনের ক্ষারক দিয়ে। চার

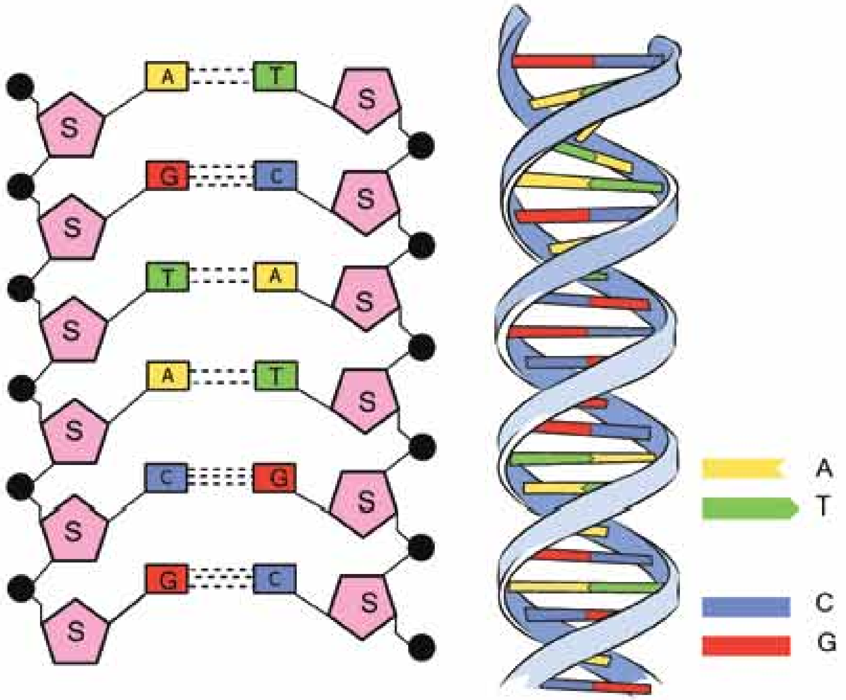

চিত্র ১১.০৫: DNA অণুর গঠন

ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারকের মধ্যে দুটি করে ক্ষার জোড় বেঁধে তৈরি করে সিঁড়ির ধাপগুলো। ডিএনএ অণুর চার ধরনের ক্ষারক হচ্ছে এডিনিন (A), গুয়ানিন (G), সাইটোসিন (C) ও থাইমিন (T)-এর মাঝে এডিনিন সবসময় থাইমিনের সাথে (A-T) এবং সাইটোসিন সবসময় গুয়ানিনের সাথে (C-G) জোড়া বাঁধে। ডিএনএ প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো কাঠামোকে ডাবল হেলিক্স বলা হয়ে থাকে।

আরএনএ (RNA)

আরএনএ হলো রাইবোনিউক্লিক এসিড (চিত্র ১১.০৬)। DNA-এর মতো দুটি শেকলের বদলে এটি একটিমাত্র পলিনিউক্লিওটাইড শেকলে ভাঁজ হয়ে থাকে। আরএনএ পাঁচ কার্বন যুক্ত রাইবোজ শর্করা ও ফসফেট নির্মিত একটি মাত্র পার্শ্ব কাঠামো দ্বারা গঠিত, যার ডিএনএর মতোই চার ধরনের নাইট্রোজেন ক্ষারক রয়েছে । শুধু পার্থক্য হচ্ছে ডিএনএতে থাইমিন আছে, কিন্তু আরএনএ-তে থাইমিনের পরিবর্তে থাকে ইউরাসিল (U)। জীবকোষে আরএনএ তিন রকমের। সেগুলো হচ্ছে: (ক) বার্তা বাহক আরএনএ (Messenger RNA বা m RNA), (খ) রাইবোজোমাল আরএনএ (Ribosomal RNA বা r RNA) এবং (গ) ট্রান্সফার আরএনএ (Transfer RNA বা t RNA)।

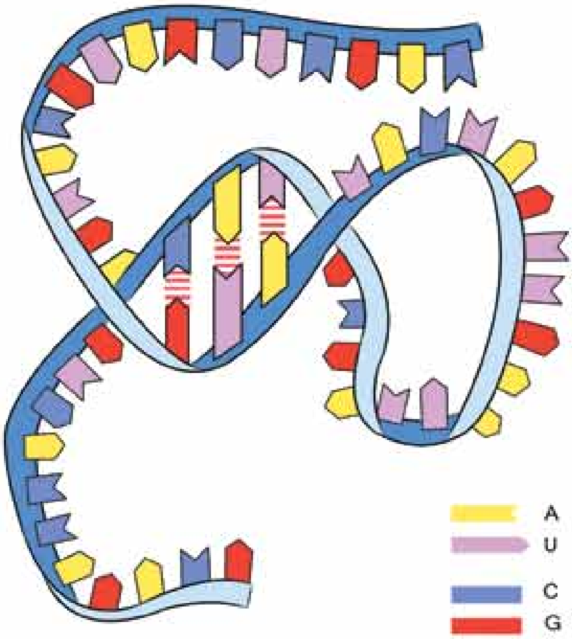

চিত্র ১১.০৬: RNA অণু

প্রোটিন

ক্রোমোজোমে দুই ধরনের প্রোটিন থাকে। সেগুলো হচ্ছে-হিস্টোন ও নন-হিস্টোন প্রোটিন।

ওপরের বর্ণিত রাসায়নিক পদার্থগুলো ছাড়া ক্রোমোজোমে লিপিড, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়।

১১.১.৩ জিন

অষ্টম শ্রেণিতে দ্বিতীয় অধ্যায় এ আমরা বংশগতি বলতে কী বুঝায় সেটা জেনেছি। বংশগতিতে ক্রোমোজোমের কী ভূমিকা আমরা সেটাও জেনে এসেছি। মেন্ডেল বংশগতির ধারক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের নির্ধারকের একককে ফ্যাক্টর নামে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং বলেছিলেন ফ্যাক্টরগুলোর

২০২৬

মাধ্যমে পিতামাতার বৈশিষ্ট্যগুলো বংশপরম্পরায় সন্তানদের মাঝে বাহিত হয়। বর্তমানে বংশগতি বিদ্যার অগ্রগতির ফলে বংশগতির কৌশল সম্বন্ধে আরও অনেক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে। মটরশুঁটি ছাড়াও অন্যান্য জীবের বংশানুগতির পদ্ধতি নিয়ে এর পর ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। বেটসন ১৯০৮ সালে মেন্ডেলের ফ্যাক্টরের নামের পরিবর্তে জিনেটিক শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। ১৯০৯ সালে জোহানসেন বংশপরম্পরায় কোনো বৈশিষ্ট্যের নির্ধারক একককে আরো সংক্ষেপে জিন নামকরণ করেন। ক্রোমোজোমের ভেতর ডিএনএ র যে দীর্ঘ "শেকল" রয়েছে, তার একটি অংশে বংশগতির কোনো একটি একক লিপিবদ্ধ থাকে সেটিকে বলা হয় জিন। ক্রোমোজোমের গায়েই সন্নিবেশিত থাকে অসংখ্য জিন বা বংশগতির একক। জীবজন্তুর বৈচিত্র্যের নিয়ন্ত্রক হচ্ছে জিন। এককোষী ব্যাকটেরিয়া, আমাশয় রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু অ্যামিবা থেকে শুরু করে বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষ, বিশাল আকৃতির হাতি, তিমি ইত্যাদি বুদ্ধিমান জীব মানুষ পর্যন্ত সবারই আকৃতি প্রকৃতি নির্ধারিত হয় তার জিনের সংকেত দ্বারা।

বংশবৃদ্ধির প্রয়োজনে প্রতিটা জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দেয়। এসবই জিনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এভেরি, ম্যাকলিওড এবং ম্যাককারটি (১৯৪৪) মানুষের নিউমোনিয়া রোগ সৃষ্টিকারী নিউমোকক্কাস ব্যাকটেরিয়ার রাসায়নিক গঠন যেমন- প্রোটিন, শর্করা, ফ্যাট এবং নিউক্লিক এসিডগুলো পৃথক করেছিলেন। প্রত্যেকটি উপাদান নিয়ে পৃথকভাবে পরীক্ষার মাধ্যমে তাঁরা নিশ্চিত হলেন যে শুধু ডিএনএ বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ডিএনএ কীভাবে বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে পরবর্তী বংশে সঞ্চালিত করে? ছবিতে একটি ডিএনএ কীভাবে দুটি ডিএনএতে বিভাজিত হয় দেখানো হয়েছে। প্রথমে ডিএনএ শেকল লম্বালম্বিভাবে স্ববিভাজনের (Self duplication) দ্বারা ভাগ হয়ে পরিপূরক দুটি পার্শ্ব কাঠামো গঠিত হয়। তখন কোষের মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা A, T, C এবং G ক্ষারকগুলো ডিএনএ র উন্মুক্ত A, T, C এবং G সাথে যুক্ত হয়। সব সময়ই A-এর সাথে T এবং C-এর সঙ্গে G যুক্ত হয় বলে একটি ডিএনএ অণু ভেঙে তৈরি হয় দুটি নতুন অণু। নতুনভাবে সৃষ্ট প্রতিটা অণুতে থাকে একটা পুরাতন ও একটা নতুন ডিএনএ পার্শ্ব কাঠামো, যার ফলে প্রতিটি নতুন ডিএনএ অণু হয় মূলটির হুবহু অণুলিপি। এভাবে ডিএনএ অণুতে রক্ষিত জীবের বংশগত বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক নীলনকশা পরিবর্তন ছাড়াই সংরক্ষিত হয় এবং পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়।

অতএব তোমরা বুঝতে পারছ বংশগত ধারা পরিবহনে ক্রোমোজোম, ডিএনএ কিংবা আরএনএ র গুরুত্ব অপরিসীম। ক্রোমোজোমের প্রধান উপাদান হচ্ছে ডিএনএ। ডিএনএ র অংশ বিশেষ জীবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত ধারক, যাকে জিন বলা হয়। আরএনএ জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করতে ডিএনএ-কে সাহায্য করে। ক্রোমোজোম ডিএনএ এবং আরএনকে ধারণ করে বাহক হিসাবে। ক্রোমোজোম ডিএনএ, আরএনএ-কে সরাসরি বহন করে পিতা-মাতা থেকে তাদের পরবর্তী বংশধরের মাঝে নিয়ে যায়। কোষ বিভাজনের মায়োসিস প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বংশগতির এ ধারা অব্যাহত থাকে। এ কারণে ক্রোমোজোমকে বংশগতির ভৌত ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়।

ডিএনএ টেস্ট

যখন কোনো সন্তানের পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয় অথবা কেউ যদি কোনো সন্তানকে তার সন্তান হিসেবে দাবি করে, তখন ডিএনএ টেস্ট দ্বারা এ ধরনের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যায়। ডিএনএ টেস্ট করার সময় পিতা, মাতা ও সন্তানের শরীর থেকে কোনো ধরনের জীবকোষ (রক্ত, লালা ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়। সেখান থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার দ্বারা পিতা, মাতা ও সন্তানের ডিএনএ র একটি চিত্র (প্রোফাইল) প্রস্তুত করা হয়। এরপর সন্তানের ডিএনএ র চিত্রের সাথে পিতামাতার ডিএনএ চিত্র মিলানো হয় এবং যদি প্রত্যেকের সাথে প্রায় ৫০% মিল পাওয়া যায়, তাহলে সে সেই সন্তানের জৈব পিতামাতা (Biological Parents) অর্থাৎ প্রকৃত পিতামাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১১.১.৪ মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলা

চিকিৎসাবিজ্ঞানে মানুষের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে সৃষ্ট রোগগুলো একটি অনেক বড় উদ্বেগের বিষয়। এ রোগগুলো কীভাবে মাতাপিতা থেকে সন্তানদের মধ্যে সঞ্চালিত হয় এবং কী ধরনের জেনেটিক বিশৃংখলার কারণে রোগগুলো ঘটে— এগুলো বিজ্ঞানীরা বুঝতে শুরু করেছেন। নিম্নলিখিত কারণে এ রোগগুলো ঘটতে পারে-

১. পয়েন্ট মিউটেশন বা জিনের ভিতর পরিবর্তনের জন্য

২. ক্রোমোজোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য

৩. ক্রোমোজোমের কোনো অংশের হ্রাস বা বৃদ্ধির জন্য

৪. মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় হোমোলোগাস (মা থেকে পাওয়া একটি এবং বাবার কাছ থেকে পাওয়া আরেকটি ক্রোমোজোমের জোড়া) ক্রোমোজোমের বিচ্ছিন্নকরণ (Non-disjuntion) না ঘটার জন্য।

এই কারণগুলোর জন্য মানুষের যে বংশগত রোগগুলো সৃষ্টি হয় তার কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো:

১. সিকিল সেল (Sickle cell): মানুষের রক্ত কণিকার এ রোগটি হয় পয়েন্ট মিউটেশনের ফলে। স্বাভাবিক লোহিত রক্ত কণিকাগুলোর আকৃতি চ্যাপ্টা। কিন্তু সিকিল সেলের ক্ষেত্রে লোহিত কণিকাগুলোর আকৃতি কিছুটা কাস্তের মতো হয়। সিকিল সেলগুলো সূক্ষ্ম রক্তনালিগুলোতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং শরীরের সেই স্থানগুলোতে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়। এই রক্তকণিকাগুলো যত দ্রুত ভেঙে যায়, তত দ্রুত লোহিত রক্তকণিকা তৈরি হয় না বলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয়।

২. হানটিংটনস রোগ (Huntington’s Disease): এ রোগটিও হয় পয়েন্ট মিউটেশনের কারণে। এই রোগে মস্তিষ্ক ঠিকমতো কাজ করে না। শরীরের পেশিগুলোর মধ্যে সমন্বয় করার ক্ষমতা লোপ পায় এবং পরবর্তীতে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটে। এ রোগটির লক্ষণ আক্রান্ত ব্যক্তির বয়স চল্লিশ

হওয়ার আগে প্রকাশ পায় না।

মায়োসিস কোষ বিভাজনের সময় অ্যানাফেজ ধাপে হোমোলোগাস ক্রোমোজোমগুলোর যেকোনো একটি জোড়ায় ক্রোমোজোম দুটির একটি অপরটি থেকে পৃথক না হয়ে দুটিই যেকোনো মেরুতে চলে যায়। এ অবস্থাকে নন-ডিসজাংশন বলে। যেকোনো একটি বিশেষ ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশন ঘটলে একসাথে বেশ কতগুলো লক্ষণ দেখা দেয়, তাকে সিনড্রোম বলে।

৩. ডাউন'স সিনড্রোম (Down's Syndrome): মানুষের ২১তম ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের ফলে এ রোগ হয়। সে কারণে ডাইন'স সিনড্রোমের মানুষে দুটির বদলে তিনটি ২১ নম্বর ক্রোমোজম থাকে। এদের চোখের পাতা ফুলা, নাক চ্যাপ্টা, জিহ্বা লম্বা এবং হাতগুলো তুলনামূলকভাবে ছোট হয়। এরা হাসিখুশি প্রকৃতির খর্বাকৃতির এবং এদের মানসিক পরিপক্বতা কম হয়।

৪. ক্লিনিফেলটার'স সিনড্রোম (Klinefelter's Sysndrome): এ রোগটি পুরুষ মানুষে সেক্স ক্রোমোজোমের ডিসজাংশনের কারণে সৃষ্টি হয়। ফলে পুরুষটির কোষে XY ক্রোমোজোম ছাড়াও অতিরিক্ত আর একটি X ক্রোমোজোম সংযুক্ত হয় এবং পুরুষটি হয় XXY ক্রোমোজোম বিশিষ্ট। ক্লিনিফেলটারস সিনড্রম বিশিষ্ট বালকদের মধ্যে একজন স্বাভাবিক পুরুষের যে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা দরকার তা থাকে না। এদের কণ্ঠস্বর খুব কর্কশ হয় এবং স্তনগুলো আকারে বড় হয়। এদের বৃদ্ধি কম থাকে এবং এরা বন্ধ্যা হয়।

৫. টার্নার'স সিনড্রোম (Turner's Syndrome): এ রোগটি নারীদের সেক্স ক্রোমোজোমের নন-ডিসজাংশনের কারণে হয় এবং স্ত্রীলোকটি হয় XX -এর পরিবর্তে শুধু একটি X ক্রোমোজোম-বিশিষ্ট। এ ধরনের স্ত্রীলোক খর্বাকৃতি হয় এবং এদের ঘাড় প্রশস্ত হয়। পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় এদের স্তন ও জনন অঙ্গের বিকাশ ঘটে না। যার কারণে এরা বন্ধ্যা হয়।

পুরুষ মানুষের সেক্স ক্রোমোজোম (X এবং Y) ছাড়া মানুষের অন্য সবগুলো ক্রোমোজোম দুটি করে আছে (হোমোলোগাস), যার অর্থ প্রত্যেকটা জিনও দুটি করে আছে। কাজেই কোনো একটি ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে সমস্যা থাকলে, অন্য ক্রোমোজোমের সেই জিনটি সাধারণত দায়িত্ব নেয় বলে সমস্যাটি প্রকাশ পায় না। সমস্যাটি যদি X ক্রোমোজোমের কোনো একটি জিনে ঘটে থাকে তাহলে নারীদের দ্বিতীয় X ক্রোমোজোমের জিনটি সেই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পুরুষ মানুষের যেহেতু একটি মাত্র X ক্রোমোজম তাই সমস্যাটি X ক্রোমোজোমে হলে তার দ্বিতীয় কোনো পথ খোলা থাকে না। তাই X ক্রোমোজোম-সংক্রান্ত রোগগুলো পুরুষ মানুষের বেলায় অনেক বেশি হয়। একইভাবে বলা যায় Y ক্রোমোজোমের কোনো জিনে সমস্যা থাকলে সেটি শুধু পুরুষ মানুষের সমস্যা এবং দ্বিতীয় কোনো জিন না থাকায় সেটিও তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না।

প্রত্যেকটি জিনের দুটি করে কপি থাকে, তার মাঝে যেটি, তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে সেটিকে প্রকট (Dominant) জিন বলে। যেটি তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে না, সেটিকে প্রচ্ছন্ন (Recessive) জিন বলে।

আবার যদি দুটি জিনই একই সাথে প্রচ্ছন্ন কিংবা একই সাথে প্রকট হয়, তখন তাকে হোমোজাইগাস বলে। যদি একটি প্রচ্ছন্ন অন্যটি প্রকট হয়, তখন তাকে হেটারোজাইগাস বলে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টা সহজে বোঝা যাবে। X ক্রোমোজোমের জিন-সংক্রান্ত একটি রোগের নাম হেমোফিলিয়া এবং এটি প্রচ্ছন্ন জিন। কাজেই কন্যাসন্তানের বেলায় একটি X ক্রোমোজোমের হেমোফিলিয়া জিন থাকলেও অন্য X ক্রোমোজোমের সুস্থ জিনটি প্রকট হবে বলে হেমোফিলিয়া রোগটি প্রকাশিত হবে না। নিজের ভেতর রোগটি প্রকাশিত না হলেও এই কন্যা সন্তান রোগের বাহক হবে। কন্যাসন্তানের হেমোফিলিয়া রোগ হতে হলে তার দুটি এক্স ক্রোমোজোমেই হেমোফিলিয়ার জিন আসতে হবে।

কিন্তু পুত্রসন্তানের বেলায় একটি হেমোফিলিয়ার জিন এলেই তার রোগটি প্রকাশিত হবে, কাজেই ছেলেদের বেলায় অনেক বেশি হেমোফিলিয়ার রোগ দেখা যায়।

একক কাজ

কাজ: ধরা যাক হেমোফিলিয়া জিন X^h
সুস্থ জিন X^H
এবারে নিজেরা চারটি ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে :

(১) বাবা সুস্থ (X^HY) মা অসুস্থ ($X^h X^h$)

(২) বাবা সুস্থ ($X^H Y$) মা বাহক ($X^h X^H$)

(৩) বাবা অসুস্থ (X^hY) মা সুস্থ ($X^H X^H$)

(৪) বাবা (X^hY) অসুস্থ মা বাহক ($X^H X^h$)

কোন পুত্রসন্তান সুস্থ কোন পুত্রসন্তানের হেমোফিলিয়া এবং কোন কন্যাসন্তান সুস্থ কোন কন্যাসন্তানের হেমোফিলিয়া এবং কোন কন্যাসন্তান বাহক নির্ধারণ কর।

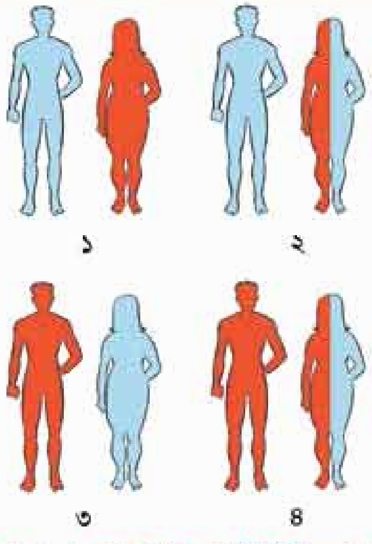

চিত্র ১১.০৭: চারটি ভিন্ন পরিস্থিতিতে পুত্র ও কন্যাসন্তানের মাঝে কে সুস্থ, কে অসুস্থ এবং কে বাহক হবে?

জিন তত্ত্বের কয়েকটি ধারণা এরকম:

(Recessive) প্রচ্ছন্ন জিন: যে জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে না।

(Dominant) প্রকট জিন: যে জিনের বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।

সেক্স লিংকড জিনের কারণে মানুষে যেসব সমস্যা দেখা দেয়, নিচের ছকে সেগুলো দেখানো হলো:

বৈশিষ্ট্যের নাম বা সমস্যা	লক্ষণ
বর্ণান্ধতা	বিভিন্ন বর্ণের পার্থক্য বুঝতে না পারা
হেমোফিলিয়া	রক্ততঞ্চনে অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে ক্ষতস্থান থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ ঘটে। এতে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে
অ্যাক্টোডার্মাল ডিসপ্লেসিয়া	ঘামগ্রন্থি ও দাঁতের অনুপস্থিতি
রাতকানা	রাতে কোনো জিনিস স্পষ্ট দেখতে না পাওয়া
অপটিক অ্যাট্রফি	অপটিক স্নায়ুর ক্ষয়িষ্ণুতা
জুভেনাইল গ্লুকোমা	অক্ষিগোলকের কাঠিন্য
হোয়াটাই ফোরলক	মাথায় সম্মুখভাগে এক গোছা সাদা চুল
মায়োপিয়া	দৃষ্টিক্ষীণতা
মাসকুল্যার ডিসট্রফি	পেশি জটিলতা, দশ বছর বয়সেই শিশুর চলনশক্তি লোপ পাওয়া।

ওপরের বর্ণিত জেনেটিক বিঘ্নতা ছাড়াও তেজস্ক্রিয় রশ্মির কারণে মানুষের ভ্রূণে জেনেটিক বিঘ্নতা ঘটতে পারে। এতে সন্তান বিকলাঙ্গ ছাড়াও ক্যান্সারসহ নানা ধরনের রোগ হতে পারে।

১১.২ জীবপ্রযুক্তি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

প্রচারের কারণে জীবপ্রযুক্তি বিষয়টা বর্তমানে আমাদের কাছে খুব পরিচিত। কিন্তু বাস্তবে এর প্রয়োগ শুরু হয় অনেক আগে থেকে। সভ্যতার বিকাশের ধারাবাহিকতায় মানুষ যখন যাযাবর জীবন ছেড়ে স্থায়ী জীবনযাপন শুরু করে, তখন থেকেই জীবপ্রযুক্তির উৎপত্তি। কারণ, মানুষের কাছে তখনই অধিক ফলনশীল গাছপালা এবং শক্ত-সমর্থ প্রাণিকুল গুরুত্ব পেয়েছে। পছন্দসই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে মানুষ তখনই গাছপালা আর প্রাণী বেছে নিতে শুরু করে এবং শুরু হয় জীবপ্রযুক্তির যাত্রা। অনেক আগে থেকে মানুষ অণুজীব বা ব্যাকটেরিয়াকে কাজে লাগিয়ে দই, মদ, বিয়ার, সিরকা, পাউরুটি— এসব উৎপাদন করে এসেছে। এরপর থেকে বিভিন্ন অণুজীবের জৈবিক কর্মকাণ্ডকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ক্ষেত্রে এবং মানবকল্যাণে নতুন নতুন উৎপাদন পৃথিবীর জীবপ্রযুক্তির ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। জীবপ্রযুক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত গবেষণা জীববিজ্ঞানে নতুন নতুন দিক উন্মোচিত করছে। জীবপ্রযুক্তিকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন মানবকল্যাণে প্রয়োগের জন্য জীবকে ব্যবহার করে

বিভিন্ন উপাদান তৈরির প্রযুক্তিকে জীবপ্রযুক্তি বলা হয়। আমেরিকার National Science Foundation-এর দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী জীবপ্রযুক্তি বলতে বুঝায় মানকল্যাণের উদ্দেশ্যে জীব প্রতিনিধিদের (যেমন: অণুজীব বা জীবকোষের) কোষীয় উৎপাদনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার। যদিও দই, সিরকা, পাউরুটি, মদ, পনির ইত্যাদি উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির ফসল কিন্তু এসব জীবপ্রযুক্তিকে পুরোনো জীবপ্রযুক্তি বলে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি আণবিক জীববিজ্ঞানের গবেষণার মাধ্যমে জীবপ্রযুক্তির যে প্রসার ঘটেছে, তাকে বলা হয় নতুন বা আধুনিক জীব প্রযুক্তি। বাস্তবিক অর্থে আধুনিক জীবপ্রযুক্তি তিনটি বিষয়ের সমন্বয়। যথা:

১. অণুজীব বিজ্ঞান

২. টিস্যু কালচার

৩. জিন প্রকৌশল

তাই জীবপ্রযুক্তি হচ্ছে একটি সমন্বিত বিজ্ঞান। বর্ণিত তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা জীববিজ্ঞানের অত্যাধুনিক এই শাখাটি মানবসভ্যতার নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

১১.২.১ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং

বংশানুগতির উপাদানের প্রকৃতি, রাসায়নিক গঠন এবং জৈবনিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিসমূহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা আর একটা বিষয় নিয়ে ভাবা শুরু করলেন। তাঁরা দেখলেন, একটা জীবের সকল জিনই তার জন্য মঙ্গলজনক নয়। এ ভাবনার ফলে জন্ম নিলো জিন প্রকৌশল নামে জীববিজ্ঞানের এক নতুন শাখা। একটি জীব থেকে একটি নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ডিএনএ খণ্ড পৃথক করে ভিন্ন একটি জীবে স্থানান্তরের কৌশলকে জিন প্রকৌশল (Genetic Engineering) বলে। আরও সহজভাবে বলতে পারি কাঙ্ক্ষিত নতুন একটি বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য কোনো জীবের ডিএনএ-র পরিবর্তন ঘটানোকে জিন প্রকৌশল বলে। এই জিন যে কৌশলগুলোর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হয়, তাদের একত্রে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল অবলম্বন করে একটি ডিএনএ অণুর কাঙ্ক্ষিত অংশ কেটে আলাদা করে অন্য একটি ডিএনএ অণুতে প্রতিস্থাপনের ফলে যে নতুন ডিএনএ অণুর সৃষ্টি হয়, তাকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ তৈরির প্রক্রিয়াকে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি বা জিন ক্লোনিং বলা হয়।

মানুষের অন্ত্রে বসবাস করে একধরনের ব্যাকটেরিয়া যার নাম Escherichia coli। এই ব্যাকটেরিয়ার ওপর গবেষণা করে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধিকাংশ কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বা রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তি নিচে উল্লেখ করা ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৮) অবলম্বন করে সম্পন্ন করা হয়:

১. প্রথমে দাতা জীব থেকে কাঙ্ক্ষিত জিনসহ ডিএনএ অণুকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জিনের বাহক বা ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য ব্যাকটেরিয়ার প্লাজমিড ডিএনএ পৃথক করা হয়।

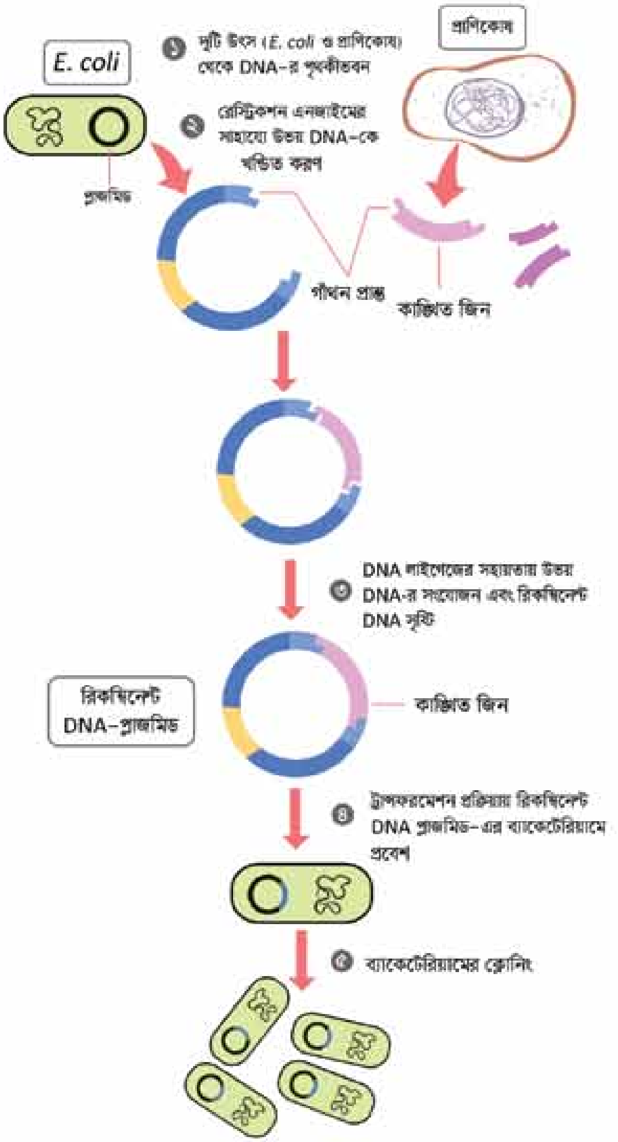

চিত্র ১১.০৮: কাঙ্ক্ষিত জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়া ক্লোন

প্লাজমিড হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্রোমোজোমের বাইরে আরেকটি স্বতন্ত্র ডিএনএ অণু যেটি বিভাজিত হতে পারে বা স্वবিভাজনে সক্ষম।

২. এ ধাপে প্লাজমিড ডিএনএ এবং দাতা ডিএনএ এক বিশেষ ধরনের এনজাইম বা উৎসেচক দিয়ে খণ্ডিত করা হয়। দাতা ডিএনএর এসব খণ্ডের কোনো একটিতে কাঙ্ক্ষিত জিনটি থাকে।

৩. এ ধাপে লাইগেজ নামক একধরনের এনজাইম দিয়ে দাতা ডিএনএ কে প্লাজমিড ডিএনএ এর কাটা প্রান্ত দুটোর মাঝখানে স্থাপন করা হয়। লাইগেজ এখানে আঠার মতো কাজ করে। এর ফলে নির্দিষ্ট জিনসহ রিকম্বিনেন্ট ডিএএন প্লাজমিড তৈরি হয়। এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড এখন দাতা ডিএনএ র খণ্ডিত অংশ বহন করে।

৪. এখন এই রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিডকে ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে প্রবেশ করানো হয়। খণ্ডিত ডিএনএ গ্রাহক কোষে প্রবেশ করনোর পদ্ধতিকে ট্রান্সফরমেশন বলে। ট্রান্সফরমেশনের ফলে নতুন জিন নিয়ে যে ব্যাকটেরিয়া বা জীবের উদ্ভব ঘটে, তাকে ট্রান্সজেনিক জীব বলে।

৫. এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী রিকম্বিনেন্ট প্লাজমিড ধারণ করা ব্যাকটেরিয়াকে শনাক্ত করে আলাদা করা হয়। এরপর নির্দিষ্ট জিন বহনকারী ব্যাকটেরিয়াগুলোর ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ঘটানো হয়। এই ব্যাকটেরিয়াগুলোর প্রত্যেকটিতে এখন একটি করে কাঙ্ক্ষিত জিন রয়েছে। এই পদ্ধতিতে জিন তৈরি করাকে বলা হয় জিন ক্লোনিং। জিনকে ব্যবহার করার জন্য প্লাজমিডকে আবার আলাদা করে নেওয়া হয়।

১১.২.২ ক্লোনিং

প্রাকৃতিক ক্লোন বলতে একটি জীব অথবা এক দল জীবকে বোঝানো হয়, যাদের উদ্ভব ঘটে অযৌন অঙ্গজ প্রজননের দ্বারা। এগুলোর প্রকৃতি হয় পুরোপুরি তার মাতৃজীবের মতো। জীব ছাড়াও একটি কোষ বা একগুচ্ছ কোষ যখন একটিমাত্র কোষ থেকে উৎপত্তি হয় এবং সেগুলোর প্রকৃতি মাতৃকোষের মতো হয়, তখন তাকেও ক্লোন বলে। প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়া, অনেক শৈবাল, বেশির ভাগ প্রোটোজোয়া এবং ইস্ট ছত্রাক ক্লোনিং পদ্ধতি দিয়ে বংশবৃদ্ধি করে।

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহার করে তিন ধরনের ক্লোনিং করা হয়।

১. **জিন ক্লোনিং:** একই জিনের অসংখ্য নকল তৈরি করাকে জিন ক্লোনিং বলে। জিন ক্লোনিং রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ টেকনোলজির সাহায্যে ঘটানো হয়।

২. **সেল ক্লোনিং:** একই কোষের অসংখ্য হুবহু একই রকমের কোষ সৃষ্টি করাকে সেল ক্লোনিং বলে।

৩. **জীব ক্লোনিং:** দুটির পরিবর্তে একটিমাত্র জীব থেকে জিনগত হুবহু এক বা একাধিক জীব তৈরির পদ্ধতিকে জীব ক্লোনিং বলে।

ডলি নামক ভেড়া হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী, যা একটি পূর্ণবয়স্ক দেহকোষ থেকে ক্লোন করা হয়েছে। ক্লোন করার সময় নিচের ধাপগুলো (চিত্র ১১.০৯) অনুসরণ করা হয়। এক্ষেত্রে ডিম্বাণু থেকে যে প্রাণী সৃষ্টি হয়, তা হুবুহ তার মাতার মতো হয়।

২০২১

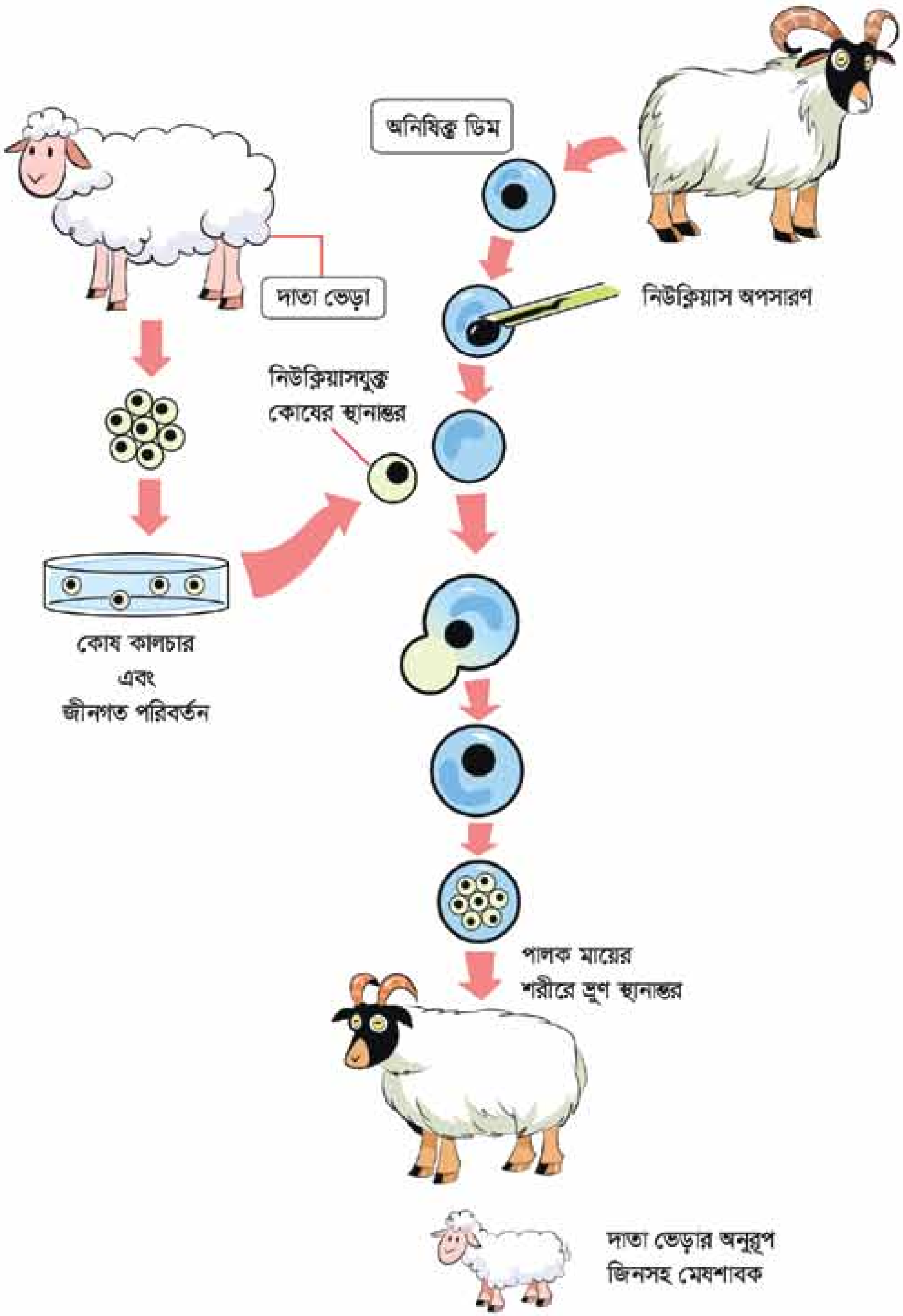

চিত্র ১১.০৯: ডলির সৃষ্টি

১. ডলি নামক ভেড়াকে ক্লোন করার জন্য বিজ্ঞানীরা একটা ছয় বছর বয়সের সাদা ভেড়ার দুধগ্রন্থি থেকে কোষ সংগ্রহ করেছেন।

২. এই কোষের ভেতরের নিউক্লিয়াসটিকে তার কোষে "অভুক্ত" রাখা হয়েছে, যেন এটি যে দুগ্ধগ্রন্থির একটি কোষের নিউক্লিয়াস এই তথ্যটি ভুলে যায়।

৩. কালো মুখের আরেকটি ভেড়া থেকে একটি ডিম্বাণু সংগ্রহ করে তার ভেতরকার নিউক্লিয়াসটিকে অপসারণ করা হয়েছে।

৪. সাদা ভেড়া থেকে সংগ্রহ করা কোষের নিউক্লিয়াসটি এবার ডিম্বাণুতে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। এবং ইলেকট্রিক শক দিয়ে নিউক্লিয়াসটিকে কার্যকর করা হয়েছে।

৫. ডিম্বাণুটি ভ্রূণে পরিণত হওয়ার পর সেটি একটা পালক মাতা ভেড়ার দেহে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। মাতা ভ্রূনটিকে যথাসময়ে মেষশাবক হিসেবে জন্ম দিয়েছে। এই মেষশাবকটি হুবহু তার মায়ের মত।

এই ক্লোনিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ক্লোন ইঁদুর, খরগোস, গরু ও শুকর এমনকি বানর পর্যন্ত ক্লোন করা হয়েছে। ইঁদুর, ভেড়া, বানর প্রভৃতি ক্লোনিংয়ের পর স্বাভাবিকভাবেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি এখন মানুষের ওপর। এ প্রক্রিয়াটি এখন আর দুরূহ নয়, কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন দেশ মানুষের ক্লোন করার প্রক্রিয়া আইন করে নিষিদ্ধ করে রেখেছে।

ক্লোনিংয়ের সামাজিক প্রভাব: সম্পূর্ণ প্রাণীর ক্লোনিংকে বলে রিপ্রোডাকটিভ ক্লোনিং। 'ডলি' নামক ভেড়া তার উদাহরণ। পশুদের ক্লোনিং নিয়ে তেমন কোনো বিতর্ক সৃষ্টি হয়নি, তবে এর মধ্যে মানুষের ক্লোনিংয়ের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। এখন এর নৈতিকতা নিয়ে বিতর্ক উঠেছে। নৈতিকতা প্রশ্নগুলো এরকম:

প্রথমত হচ্ছে ক্লোনিং হয়ে ভূমিষ্ঠ হওয়া শিশুটি যখন বড় হবে তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্ব ওই ক্লোন হতে পাওয়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মতো হবে, নাকি অন্যরকম হবে। দ্বিতীয় এইভাবে ক্লোন হয়ে সৃষ্টি হওয়ায় শিশুটির উপর কী কোনো ধরনের সামাজিক চাপ থাকবে? ক্লোনিং জাত শিশুটি সম্পূর্ণ সুস্থ হবে, নাকি প্রতিবন্ধী বা বিকলাঙ্গ হবে, সেটি সম্পর্কেও বিজ্ঞানীরা এখনো পুরোপুরি নিশ্চিত নন। এখন পর্যন্ত মানুষ বা মানবগোষ্ঠীর সফল ক্লোনিংয়ের খবর পাওয়া যায়নি।

আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের কাহিনী আমরা জানি, যাকে বোতল থেকে বের করার পর পুনরায় বোতলে ঢোকানো যায়নি। পরমাণু শক্তির মতো জীবপ্রযুক্তি ঠিক তেমন এক অবাধ্য শক্তি। তাই আমাদের কাজ হচ্ছে, দায়িত্বশীল মানুষের মতো বিবেচনা করে মানবজাতির কল্যাণে এই জীবপ্রযুক্তিকে কাজে লাগানো।

১১.৩ উন্নত প্রাণী ও উদ্ভিদ উদ্ভাবনে জিনপ্রযুক্তির ব্যবহার

জিন প্রকৌশল ব্যবহার করে উন্নত প্রাণী উদ্ভাবনের জন্য বিজ্ঞানীরা অনেক দিন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং কোথাও কোথাও সফলও হয়েছেন। তারই একটি ফসল হচ্ছে ট্রান্সজেনিক জীব (প্রাণী অথবা উদ্ভিদ)। ট্রান্সজেনিক জীব উৎপাদনের পদ্ধতিকে ট্রান্সজেনেসিস বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ ও মাইক্রোইনজেকশন কৌশল প্রয়োগ করে ট্রান্সজেনিক জীব উদ্ভাবন করা হয়।

ব্যাকটেরিয়া থেকে শুরু করে উদ্ভিদ ও অনেক প্রাণীর ক্ষেত্রে ট্রান্সজেনিক জীব উৎপন্ন করা সম্ভব হয়েছে। ফলে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে উদ্ভাবিত ট্রান্সজেনিক জীব পৃথিবীতে একটি নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে এবং গৃহপালিত পশুদের উন্নতিসাধনে ট্রান্সজেনেসিস সহজভাবে আমাদের সাফল্য বয়ে এনেছে।

ট্রান্সজেনিক প্রাণী: মানুষের জিন বিশেষ পদ্ধতিতে ইঁদুরে প্রবেশ করিয়ে এমন ট্রান্সজেনিক ইঁদুর উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, যা মানুষের অ্যান্টিবডিগুলো তৈরি করতে সক্ষম। একই পদ্ধতিতে ট্রান্সজেনিক গবাদিপশু, ভেড়া, ছাগল, শুকর, পাখি ও মাছ উৎপাদন করা হয়েছে।

ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ: জিন প্রকৌশলের মাধ্যমে জিনের স্থানান্তর ঘটিয়ে যেসব উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়, সেগুলোকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বলে। রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল প্রয়োগ করে একটি কাঙ্ক্ষিত জিন উদ্ভিদদেহের কোষের প্রোটোপ্লাজমে প্রবেশ করানো হয়।

গুরুত্বপূর্ণ ও অর্থকরী ফসলকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদে পরিণত করে পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী করে উৎপাদন করা হচ্ছে। শৈত্য, লবণাক্ততা, খরা, নাইট্রোজেন ও ফাইটোহরমোন স্বল্পতা ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ উদ্ভাবন করে মোকাবিলা করা সক্ষম হয়েছে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টির মতো উদ্ভিদ প্রজাতিতে এ প্রক্রিয়ার সফল প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: টমেটো, তামাক, আলু, লেটুস, বাঁধাকপি, সয়াবিন, সূর্যমুখী, শসা, তুলা, মটর, গাজর, আপেল, মুলা, পেঁপে, ধান, গম, ভুট্টা ইত্যাদি। টান্সজেনিক টমেটো উদ্ভাবন করে পাকা টমেটোর ত্বক নরম হওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এগুলোকে বিলম্বে পাকানো এবং এর ভেতর সুক্রোজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১১.৩.১ কৃষি উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার

মানুষের অন্যতম প্রধান মৌলিক চাহিদা খাদ্য। কিন্তু সীমিত ভূখণ্ডে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা নিয়ে কীভাবে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া যায় কিংবা কীভাবে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদন করে ব্যবসায়িক ফায়দা ওঠানো যায়, সেটি নিয়ে সারা পৃথিবীতে চলছে এক অঘোষিত যুদ্ধ। এ যুদ্ধ জয়ের হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে সফল জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ।

কৃষি উন্নয়নে যেসব জীবপ্রযুক্তিগত পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

১. টিস্যু কালচার: এ পদ্ধতিতে উদ্ভিদের বর্ধনশীল অঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ; যেমন মূল, কাণ্ড, পাতা, অঙ্কুতির চারার বিভিন্ন অংশ ইত্যাদি নির্ধারিত আবাদ মাধ্যমে জীবাণুমুক্ত ও নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে আবাদ করা হয়। এই কালচারের ফলে এসব বর্ধনশীল অঙ্গসমূহ থেকে অসংখ্য অণুচারা উৎপন্ন হয়। এসব অণুচারার প্রত্যেকটি পরে উপযুক্ত পরিবেশে পৃথক পৃথক পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদে পরিণত হয়। এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প জায়গায় নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাণিজ্যিকভাবে লাখ লাখ কাঙ্ক্ষিত চারা তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে।

২. অধিক ফলনশীল উদ্ভিদের জাত সৃষ্টি: কোনো বন্য উদ্ভিদের উৎকৃষ্ট জিন ফসলি উদ্ভিদে প্রতিস্থাপন করে কিংবা জিনের গঠন বা বিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত জাতের উদ্ভিদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে ধান, গম, তেলবীজসহ অনেক শস্যের অধিক ফলনশীল উন্নত জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।

৩. গুণগত মান উন্নয়নে: জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রাণী ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যাদির গঠন, বর্ণ, পুষ্টিগুণ, স্বাদ ইত্যাদির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়েছে। যেমন: অস্ট্রেলিয়ায় ভেড়ার লোমকে উন্নতমানের করতে তাদের খাদ্য ক্লোভার ঘাসে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ প্রযুক্তির মাধ্যমে সূর্যমুখীর সালফার অ্যামিনো অ্যাসিড সৃষ্টিকারী জিন স্থানান্তর করা হয়েছে। ফলে খাদ্য হিসেবে এই ঘাস খেলেই ভেড়ার লোম উন্নতমানের হচ্ছে, পৃথকভাবে সালফার সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া প্রয়োজন হচ্ছে না।

৪. সুপার রাইস সৃষ্টি: জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে সুইডেনের এক বিজ্ঞানী সুপার রাইস বা গোল্ডেন রাইস নামক এক ধরনের ধান উদ্ভাবন করেছেন। এটি ভিটামিন A সমৃদ্ধ।

৫. ভিটামিন সমৃদ্ধ ভুট্টার জাত সৃষ্টি: সম্প্রতি স্পেনের একদল গবেষক জেনেটিক্যালি মডিফাইড ভুট্টার বীজ উদ্ভাবন করেছেন যাতে ভিটামিন সি, বিটা ক্যারোটিন ও ফলিক অ্যাসিড পাওয়া যাবে। এই ভুট্টা ব্যালেন্স ডায়েটের পাশাপাশি গরিব দেশগুলোর মানুষের অপুষ্টি দূর করবে।

৬. স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিক: জীবপ্রযুক্তি দিয়ে শাক-সবজি, ফল ও শুঁটকির ক্ষতিকর পতঙ্গ, মশা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণে স্টেরাইল ইনসেক্ট টেকনিকট (SIT) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এটি ব্যবহার করে পতঙ্গের বংশবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। জাপান, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ড, গুয়াতেমালা, ব্রাজিল এসব দেশে এই প্রযুক্তি ব্যাপক প্রচলিত।

৭. ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ: এ সময় পর্যন্ত প্রায় ৬০টি উদ্ভিদ প্রজাতিতে রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ কৌশল সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তামাক, টমেটো, আলু, মিষ্টি আলু, লেটুস, সূর্যমুখী, বাঁধাকপি, তুলা, সয়াবিন, মটর, শসা, গাজর, মুলা, পেঁপে, আঙ্গুর, কৃষ্ণচূড়া, গোলাপ, নাশপাতি, নিম, ধান, গম, রাই, ভুট্টা প্রভৃতি। এগুলো পতঙ্গ, ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক প্রতিরোধী এবং একই সাথে যেকোনো পরিবেশকে মোকাবিলা করতে পারে।

২০২৩

১১.৩.২ ঔষধশিল্পে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার

প্রতিবছর জনসংখ্যা ও রোগের জটিলতা বেড়েই চলছে। এ অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসা পৌঁছে দিতে বিজ্ঞানীরা জীবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে ঔষধশিল্পের উন্নতি ঘটিয়েছেন। মারাত্মক রোগ-ব্যাধি শনাক্তকরণের পাশাপাশি জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে ঔষধ উৎপাদনের প্রক্রিয়া জোরালো হয়েছে। নিচে তার কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো।

১. ভ্যাকসিন উৎপাদন: বর্তমানে জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে বিভিন্ন ভ্যাকসিন বা টিকা উৎপাদন করা হয়েছে যেগুলো পোলিও, যক্ষ্মা, হাম, বসন্তসহ বিভিন্ন সংক্রামক রোগের রোগ প্রতিরোধক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২. ইন্টারফেরন উৎপাদন: ইন্টারফেরন আধুনিক ঔষধশিল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রোটিন অণুর সমন্বয়ে গঠিত এ উপাদানটি দেহের রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থায় অত্যন্ত সহায়ক। জিন প্রকৌশল প্রয়োগ করে বাণিজ্যিক ভিত্তিক ইন্টারফেরন উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এটি হেপাটাইটিসের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় এবং ক্যান্সার রোগীদেরকে প্রাথমিকভাবে ইন্টারফেরন প্রয়োগ করে ক্যান্সারকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

৩. হরমোন উৎপাদন: বিভিন্ন হরমোন (যেমন: ডায়াবেটিস রোগের ইনসুলিন কিংবা মানুষের দেহ বৃদ্ধির হরমোন ইত্যাদি) উৎপাদন জীবপ্রযুক্তির এটি উল্লেখযোগ্য দিক। জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত করা হরমোন সহজসাধ্য এবং দামও অনেক কম।

৪. অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদন : কম সময়ের মধ্যে বিপুল পরিমাণ অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদনের জন্য জীবপ্রযুক্তির প্রয়োগ করে বর্তমানে এক হাজারের বেশি অ্যান্টিবায়োটিক উৎপাদিত হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পেনিসিলিন ও সেফালোস্পোরিন অ্যান্টিবায়োটিক।

৫. এনজাইম উৎপাদন: পরিপাক-সংক্রান্ত রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের উপাদান হিসেবে কিছু এনজাইম, (যেমন: অ্যামাইলেজ, প্রোটিয়েজ ও লাইপেজ, পেঁপে থেকে প্যাপেইন) প্রস্তুত করা হয়। বটগাছ থেকে ফাইসন (যা কৃমিরোগে ব্যবহৃত হয়), গবাদিপশুর প্লাজমা থেকে থ্রম্বিন (রক্তপাত বন্ধে ব্যবহৃত হয়) এবং ট্রিপসিন (যা ক্ষত নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়) জৈবপ্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত এবং বাজারজাত হচ্ছে।

৬. ট্রান্সজেনিক প্রাণী থেকে ঔষধ আহরণ: ট্রান্সজেনিক প্রাণী উদ্ভাবনের মাধ্যমে প্রাণীগুলোর দুধ, রক্ত ও মূত্র থেকে প্রয়োজনীয় ঔষধ আহরণ করা হয়। একে মলিকুলার ফার্মিং বলে।

১১.৩.৩ গৃহপালিত পশু উন্নয়নে জীবপ্রযুক্তির ব্যবহার:

উন্নত জাতের পশু উৎপাদনের লক্ষ্য হচ্ছে: (ক) চর্বিমুক্ত মাংস উৎপাদন, (খ) দ্রুত বিক্রয়যোগ্য করা

২০২১

এবং (গ) রোগ প্রতিরোধী করা। ইতোমধ্যে ট্রান্সজেনিক ভেড়া উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই ভেড়ার প্রতি লিটার দুধে ৩৫ গ্রাম পর্যন্ত হিউম্যান আলফা এন্টিট্রিপসিন প্রোটিন পাওয়া যায়। এ প্রোটিনের অভাবে এমফাইসেমা নামক মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হয়। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে ভেড়াদেহের মাংস বৃদ্ধি এবং শরীরের পশম-বৃদ্ধির প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করা হয়েছে। চর্বিহীন মাংস ও মানুষের হরমোন উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রান্সজেনিক শূকর উদ্ভাবন সফল হয়েছে। উদ্ভাবিত হয়েছে ট্রান্সজেনিক ছাগল। এসব ছাগলের দুধে পাওয়া যায় এক বিশেষ ধরনের প্রোটিন যা জমাট রক্তকে গলিয়ে করোনারি থ্রম্বোসিস থেকে মানুষকে রক্ষা করে। ট্রান্সজেনিক গরু উদ্ভাবনের মাধ্যমে মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মাতৃদুধের অতি প্রয়োজনীয় প্রোটিন, ল্যাকটোফেরিনও পাওয়া যাচ্ছে।

দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদনে জিন প্রযুক্তির ব্যবহার: বিশ্বে দুধের প্রধান উৎস গাভী। এর পরেই রয়েছে মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। দুধের সরাসরি নানাবিধ ব্যবহার থাকলেও দুধ থেকে বিভিন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়। যেমন: দুধ থেকে মাখন, পনির, দই ইত্যাদি খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করা হয়। দুধ থেকে খাদ্যসামগ্রী তৈরির জন্য জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে নানা রকমের ব্যাকটেরিয়া ব্যবহার করা হচ্ছে। নিচে কয়েকটি দুগ্ধজাত দ্রব্য তৈরি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

১. মাখন: বিশেষ ব্যাকটেরিয়া থেকে উৎপন্ন এনজাইম দিয়ে মাখনে বিশেষ সুগন্ধ ও স্বাদ সৃষ্টি করা হয়।

২. পনির: আমাদের দেশে গরুর দুধ কিংবা মহিষের দুধ থেকে পনির তৈরি করা হয়। পনির তৈরিতে ব্যাকটেরিয়া কিংবা ছত্রাক প্রয়োগ করা হয়। এতে পনিরের স্বাদ, বর্ণ এবং গন্ধের তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর সুস্বাদু পনির উৎপাদনের জন্য ইতালি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্য বিখ্যাত। এই উৎকৃষ্ট মানের পনির উৎপাদন সম্ভব হয়েছে জীব প্রযুক্তির দ্বারা।

৩. দই: দুধে ল্যাকটোজ নামক শর্করা থাকায় বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া প্রয়োগ করে সেটা থেকে দই বা দইজাতীয় খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করা যায়। ল্যাকটিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া দুধের জমাট বাঁধা অবস্থা সৃষ্টি করে দইয়ে রূপান্তরিত করে। এটি করার জন্য ল্যাক্টিক অ্যাসিড ব্যাকটেরিয়া নামে এক প্রকার ব্যাকটেরিয়ার বীজ ব্যবহার করা হয়। মূলত এর গুণাগুণের ওপরেই দই এর গুণাগুণ নির্ভর করে।

১১.৩.৪ ফরেনসিক টেস্ট

চিত্র ১১.১০: ফরেনসিক টেস্টের পদ্ধতি

ফরেনসিক টেস্টের দ্বারা রক্ত, বীর্যরস, মূত্র, অশ্রু, লালা ইত্যাদির ডিএনএ অথবা অ্যান্টিবডি থেকে অপরাধীকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়।

জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ করে ফরেনসিক টেস্ট (চিত্র ১১.১০) করার পদ্ধতি এরকম:

সেরোলজি (Serology) টেস্ট দিয়ে মানুষের রক্ত, বীর্য এবং লালাকে চিহ্নিত করে তার ডিএনএ বিশ্লেষণ করে অপরাধীকে শনাক্ত করা হয়।

আমরা এ পর্যন্ত জিন প্রকৌশলের প্রয়োগ ও অবদান সম্পর্কে যেসব আলোচনা করেছি, এগুলো ছাড়াও আরও অনেক ধরনের কাজ হয়েছে। জিন প্রকৌশল প্রযুক্তি ব্যবহার করে "হিউম্যান জিনোম প্রজেক্ট"-এর মাধ্যমে বিভিন্ন ক্রোমোজোমে অবস্থিত জিনগুলোর অবস্থান ও কাজ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে মানুষের শরীরের ক্ষতিকর জিনকে অপসারণ করে সুস্থ জিন প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হতে যাচ্ছে। এই পদ্ধতিকে জিন থেরাপি বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সেক্স ক্রোমোজোমের সংখ্যা কতটি?

(ক) ১টি (খ) ২টি
(গ) ২২টি (ঘ) ৪৪টি

২. ক্রোমোজোমে যে মৌলিক পদার্থ থাকে তা হলো:

(i) ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম
(ii) লৌহ ও ম্যাগনেসিয়াম
(iii) ক্যালসিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii
(খ) ii ও iii
(গ) i ও iii
(ঘ) i, ii ও iii

পাশের চিত্রটি থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

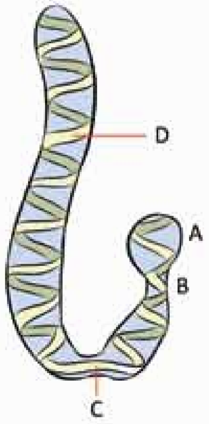

৩. চিত্রটি কিসের?
(ক) DNA
(খ) RNA
(গ) ক্রোমোজোম
(ঘ) নিউক্লিওলাস

৪. চিত্রের কোন অংশটি সেন্ট্রোমিয়ার?
(ক) A (খ) B
(গ) C (ঘ) D

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নিচের চিত্রটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

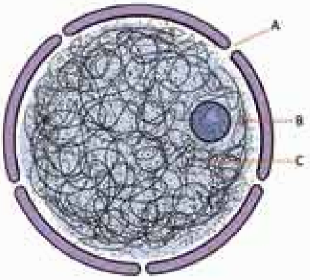

(ক) RNA-এর পুরো নাম লিখ।
(খ) DNA টেস্ট কী? বুঝিয়ে লিখ।
(গ) আদি কোষের ক্ষেত্রে ওপরের চিত্ররূপটি ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) A এবং C-এর মধ্যে কোনটি লিঙ্গ নির্ধারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ করো।

২. ফারিহা তার আব্বুর সাথে কৃষি খামারে বেড়াতে যায়। সেখানে সে টমেটো, তামাক, ভুট্টা, পেঁপেসহ অনেক প্রজাতির উদ্ভিদ দেখতে পায়, যা বেশ সতেজ ও রোগজীবাণুমুক্ত। কিন্তু বাড়িতে লাগানো উদ্ভিদগুলো রোগাক্রান্ত। সে তার আব্বুর নিকট এর কারণ জানতে চাইল। আব্বু বললেন, "খামারের উদ্ভিদে জিন বিনিময় প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে"।

(ক) নিউক্লিয়াস কাকে বলে?
(খ) সিকিলসেল রোগ বলতে কী বুঝায়?
(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তিটি ব্যাখ্যা করো।
(ঘ) উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রযুক্তি কৃষির উন্নতিসাধনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে? বিশ্লেষণ করো।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ

শক্তির নানা রূপের মাঝে তড়িৎ বা বিদ্যুৎ শক্তি। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় একটি শক্তি, কারণ এটি দিয়ে আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সবচেয়ে বেশি কাজ করতে পারি। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ আলো জ্বালায়, পাখা চালায়, রেডিও, ফ্রিজ, টিভি বা কম্পিউটার চালায়। বিদ্যুতের সাহায্যে রান্না করা যায়। এর ব্যবহারকে ভালো করে বুঝতে হলে আমাদেরকে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সম্পর্কে ধারণা নিতে হবে। বিদ্যুৎ বা তড়িৎ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকলেই আমরা তড়িতের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে এর অপচয় বন্ধ করার ক্ষেত্রে নিজেরা যত্নবান হতে পারব এবং অন্যদের সচেতন হতে সাহায্য করতে পারব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- তড়িৎ উপাংশ ও যন্ত্র প্রতীকের সাহায্যে প্রকাশ করতে পারব।
- ব্যাটারির কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা-বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর নকশা প্রণয়ন করতে পারব।
- তড়িৎ বিশ্লেষণ এবং তড়িৎ প্রলেপন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের এবং তড়িৎ প্রলেপনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারব।
- কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘন্টা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বৈদ্যুতিক ক্ষমতার হিসাব করতে পারব।
- এনার্জি সেভিং বাল্বের সুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- আইপিএস ও ইউপিএসের কার্যক্রম ও ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- সিস্টেম লস এবং লোড শেডিং ব্যাখ্যা করতে পারব।
- উন্নয়ন কার্যক্রমে বিদ্যুতের অবদান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- বাসা বাড়িতে ব্যবহার উপযোগী বর্তনীর ব্যবহার প্রদর্শন করতে পারব।
- পরীক্ষার সাহায্যে তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রদর্শন করতে পারব।
- তড়িৎ উপকরণ ও যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহারে সক্ষম হব।
- তড়িতের অপচয় রোধে যত্নবান হব এবং অন্যদের সচেতন করব।

১২.১ চল তড়িৎ

১২.১.১ তড়িৎ বর্তনীর প্রতীক

ইলেকট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বর্তনীর চিত্র বা নকশা আঁকার সুবিধার জন্য আমরা প্রত্যেকটি যন্ত্রের বা সংযোগের একটি প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে থাকি। নিচের ছকে এ রকম কিছু যন্ত্রের বা সংযোগের প্রতীক চিহ্ন দেওয়া হলো।

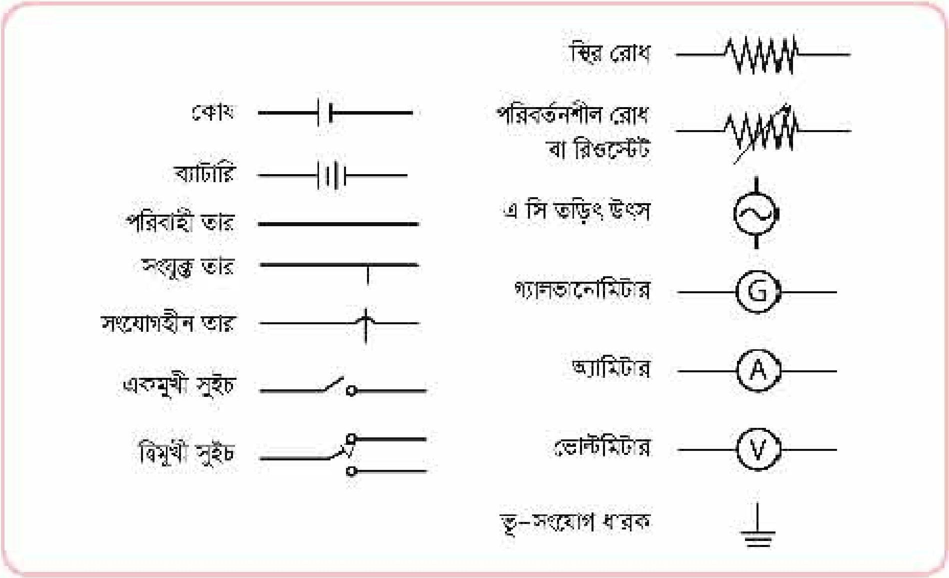

চিত্র ১২.০১: ইলেকট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বর্তনীতে ব্যবহার করা প্রতীক চিহ্ন

১২.১.২ ব্যাটারির কার্যক্রম

আমরা সবাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে টর্চ লাইটে বা মোবাইল ফোনে ব্যাটারি সেল ব্যবহার করেছি। সাধারণত কথাবার্তায় একটি সেলের জন্যে ব্যাটারি শব্দটি ব্যবহার করলেও বিজ্ঞানের ভাষায় ব্যাটারি বলতে একাধিক কোষের (Cell) সমন্বয়কে বোঝানো হয়। একটি তড়িৎ ব্যাটারি বলে উল্লেখ করলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাটারি হলো একাধিক তড়িৎ কোষের সমন্বয়। ব্যাটারি সেলে ব্যবহারের জন্য তড়িৎ শক্তি জমা থাকে। চিত্র ১২.০২-এ একটি ব্যাটারির গঠন দেখানো হলো। ব্যাটারিতে সাধারণত তিনটি অংশ

চিত্র ১২.০২: ব্যাটারি সেল

২০২৩

থাকে। একটি অ্যানোড, একটি ক্যাথোড এবং মাঝখানে ইলেকট্রোলাইট। ব্যাটারি সেলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যানোড থেকে ইলেকট্রন সরিয়ে ক্যাথোডে জমা করা হয়। এর ফলে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মধ্যে তড়িৎ বিভব পার্থক্য তৈরি হয়। এ অবস্থায় অ্যানোড এবং ক্যাথোডকে পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করলে ক্যাথোডের ইলেকট্রনগুলো অ্যানোডে প্রবাহিত হতে থাকে। ইলেকট্রন প্রবাহের বিপরীত দিকে বিদ্যুৎ প্রবাহ ধরে নেওয়া হয়। তাই আমরা বলি অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে।

সাধারণ ব্যাটারি সেলের রাসায়নিক পদার্থ বিক্রিয়া করে খরচ হয়ে যাওয়ার পর সেটি অ্যানোড এবং ক্যাথোডে আর বিভব পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না বলে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায়।

আমরা মোবাইল টেলিফোনে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি, সেগুলোর বিদ্যুৎ প্রবাহ তৈরির ক্ষমতা শেষ হয়ে যাবার পর নতুন করে চার্জ করিয়ে নেওয়া যায়, তখন ব্যাটারির রাসায়নিক পদার্থগুলো পুনরায় রাসায়নিক বিক্রিয়া করে বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য প্রস্তুত হয়।

১২.১.৩ ইলেকট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বর্তনী

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুৎ কীভাবে ব্যবহার করা হয়, সেটি বুঝতে হলে আমাদের ইলেকট্রিক সার্কিট বা তড়িৎ বর্তনী সম্পর্কে কিছু বিষয় জানতে হবে।

(ক) সিরিজে ব্যাটারি সেল: ব্যাটারি সেলকে সিরিজে (চিত্র ১২.০৩) লাগানো হলে ব্যাটারির বিভব যোগ হয়। অর্থাৎ একটি ব্যাটারি সেলে ১.৫ ভোল্ট হলে দুটি ব্যাটারি সেল দিয়ে ৩ ভোল্ট এবং তিনটি সেল দিয়ে ৪.৫ ভোল্ট পাওয়া সম্ভব।

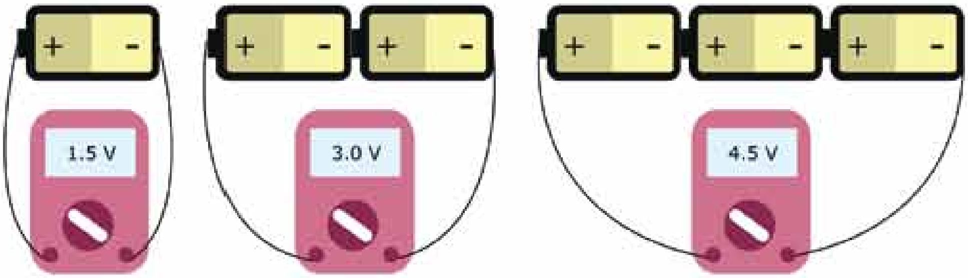

চিত্র ১২.০৩: সিরিজে ব্যাটারি সেল

(খ) সমান্তরালে ব্যাটারি সেল: কয়েকটি সেল সমান্তরাল ভাবে (চিত্র ১২.০৪) লাগানো হলে তার বিভবের পরিবর্তন হয় না কিন্তু বেশি বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে কিংবা সার্কিটে বেশি সময় ধরে বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারবে।

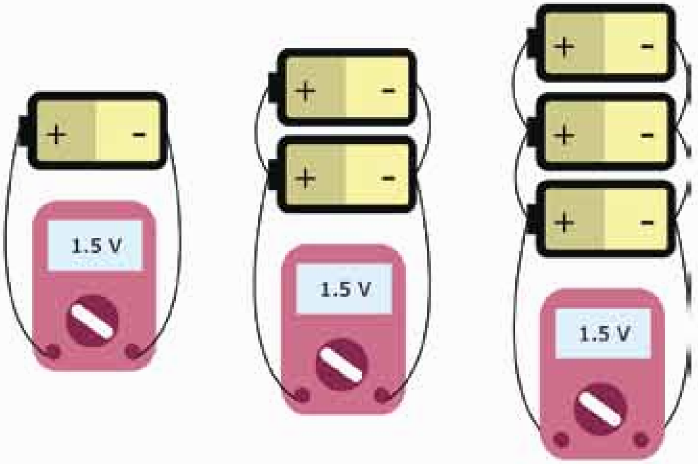

চিত্র ১২.০৪: সমান্তরালে ব্যাটারি সেল

(গ) ধরা যাক আমরা ব্যাটারি দিয়ে কয়েকটি বাল্ব জ্বালাতে চাই। সেটি দুইভাবে করা সম্ভব, সিরিজ সার্কিট বা সিরিজ বর্তনী এবং সমান্তরাল সার্কিট বা সমান্তরাল বর্তনী।

সিরিজ সার্কিট

সিরিজ সার্কিটে (চিত্র ১২.০৫) একটি বাল্ব অনেক উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে কিন্তু দুটি বা তিনটি বাল্ব লাগানো

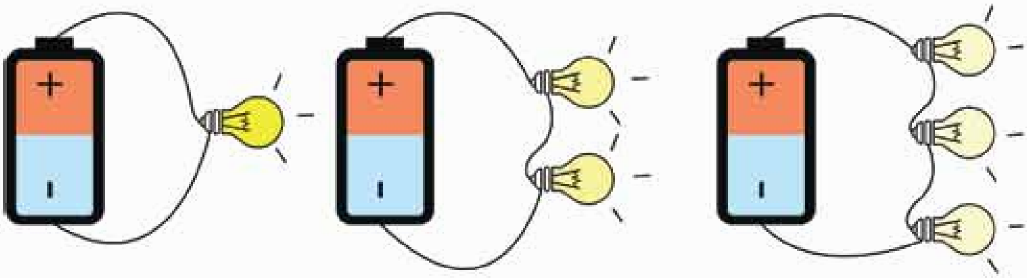

চিত্র ১২.০৫: সিরিজ সার্কিট

হলে বিদ্যুৎ প্রবাহ আনুপাতিকভাবে কমে যাবে বলে বাল্বগুলো অনুজ্জ্বলভাবে জ্বলবে। সিরিজ সার্কিট একটি সুইচ লাগানো হলে সুইচ অফ করার সাথে সাথে সবগুলো বাল্ব একসাথে নিভে যাবে।

সমান্তরাল সার্কিট

সমান্তরাল সার্কিটে (চিত্র ১২.০৬) আমরা যতগুলো বাল্বই লাগাই না কেন, সবগুলোর দুই প্রান্তেই

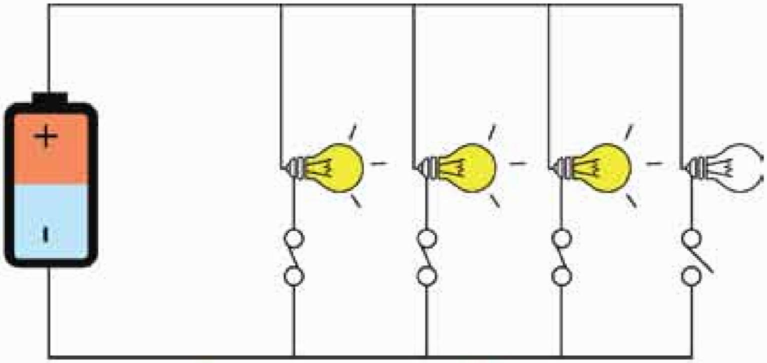

চিত্র ১২.০৬: সমান্তরাল সার্কিট

ব্যাটারি সেল থেকে সমান বিভব পার্থক্য প্রয়োগ করা হয় বলে সবগুলো বাল্বই সমান উজ্জ্বলতায় জ্বলবে। এই সার্কিটে ইচ্ছে করলে প্রত্যেকটা বাল্বের জন্য আলাদা সুইচ লাগিয়ে প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে জ্বালানো এবং নেভানো সম্ভব।

ব্যাটারি সেলের বিভব পার্থক্য সবসময় সমান থাকে বলে এগুলোকে ডিসি সাপ্লাই বলা হয়। আমাদের বাসায় যে বৈদ্যুতিক সাপ্লাই দেওয়া হয়, সেগুলো প্রতি সেকেন্ডে পঞ্চাশবার ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক বিভবে পরিবর্তিত হয় বলে সেগুলোকে এসি (Alternating Current) বলা হয়। একটি সাধারণ ব্যাটারি সেলে বিভব পার্থক্য মাত্র ১.৫V। সেই তুলনায় আমাদের বাসার বিদ্যুৎ সাপ্লাই ২২০V, এখানে উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ প্রবাহ ৫০V থেকে বেশি হলে আমরা সেটি অনুভব করতে পারি এবং ২২০V সাপ্লাই থেকে অনেক বড় ইলেকট্রিক শক খাওয়া সম্ভব এবং এই ইলেকট্রিক শকের কারণে শরীরের ভেতর দিয়ে যথেষ্ট বিদ্যুৎপ্রবাহ হলে মানুষের মৃত্যুও হতে পারে।

উদাহরণ: দুইটি দ্বিমুখী সুইচ ব্যবহার করে একটি সার্কিট ডিজাইন করো, যেটি ব্যবহার করে যেকোনো সুইচ দিয়েই একটি লাইট বাল্ব জ্বালানো কিংবা নেভানো সম্ভব।

১২.১.৪ বাড়িতে তড়িৎ বর্তনীর নকশা বা হাউজ ওয়ারিং

আমাদের প্রায় সবার বাড়িতেই বিদ্যুৎ-সংযোগ আছে। তোমরা কী জান, এই সংযোগ দেওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বিতরণ করার জন্য একটা নকশা আঁকতে হয়? বাসায় বিদ্যুৎ বিতরণের একটি নকশা কেমন হতে পারে সেটি দেখানো হলো। বাড়িতে তড়িৎ-সংযোগের জন্য সিরিজ বর্তনী উপযোগী নয়। কারণ সুইচ অন করলে একই সাথে সংযুক্ত সব বাল্ব জ্বলে উঠবে, ফ্যান চলতে থাকবে। আবার অফ করলে সবগুলো একই সাথে অফ হয়ে যাবে। তার চাইতে বড় কথা, সবগুলো সিরিজে থাকলে কোনো বাল্ব বা ফ্যানই প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ পাবে না, ভাগাভাগি হওয়ার কারণে ভোল্টেজ কমে যায়। মূলত বাসায় তড়িৎ-সংযোগ সমান্তরাল সংযোগব্যবস্থা মেনে করা হয়।

এবার নিচে একটি হাউজ ওয়্যারিংয়ের বিশদ চিত্র দেওয়া হলো (চিত্র ১২.০৭) এতে মেইন লাইনকে কীভাবে সংযোগ করে অন্যান্য উপাদান যেমন ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার, মেইন সুইচ, প্লাগ-সকেট, ডিস্ট্রিবিউশন বক্স এবং প্রয়োজনীয় বাতি বা পাখার সংযোগ দেওয়া হয় তা দেখানো হলো।

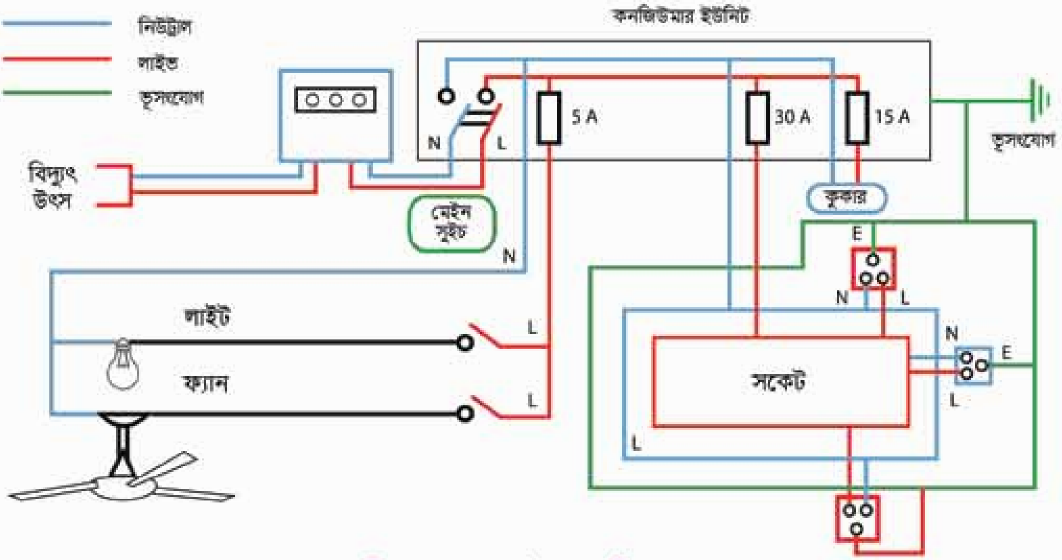

চিত্র ১২.০৭: হাউজ ওয়্যারিং

বাসায় বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রধান তার দুটির একটি হলো জীবন্ত (সাধারণত লাল রঙের) তার এবং অন্যটি নিরপেক্ষ তার (সাধারণত কালো রঙের) জীবন্ত তারে বিদ্যুৎ ভোল্টেজ (২২০ Volt) থাকে। নিরপেক্ষ তারে কোনো তড়িৎ ভোল্টেজ থাকে না যেহেতু এটিকে মাটির সাথে সংযোগ করে দেওয়া হয়। এটি সার্কিট পূর্ণ করে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করে থাকে।

মেইন তারটি ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার হয়ে মিটারে যায়। এর মাধ্যমে বাড়িতে কী পরিমাণ বিদ্যুৎ শক্তি খরচ হচ্ছে তা মিটারে লিপিবদ্ধ হয়। মিটার হতে তার দুটি মেইন সুইচে যায়। এই সুইচের সাহায্যে বাড়ির ভিতরের বিদ্যুৎ প্রবাহ প্রয়োজন হলে পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া।

মেইন সুইচ থেকে তার দুটি ডিস্ট্রিবিউশন বক্সে যায়। সেখানে তার দুটি বিভিন্ন শাখা লাইনে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রত্যেক শাখা লাইনের জন্য পৃথক পৃথক ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকে। ছবিতে লাইটের জন্য ৫A, ফ্যানের জন্য ১০A, হিটারের জন্য ১৫A এবং প্লাগ সকেটের জন্য ৩০A সার্কিট ব্রেকার দেখানো হয়েছে। এদের প্রত্যেকটিতেই জীবন্ত তারের সংযোগ আছে এবং প্রত্যেকটি বাতি পাখার জন্য আলাদা আলাদা সুইচ সংযোগ দেওয়া আছে।

বাড়িতে বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং দেওয়ার সময় বাতি বা পাওয়ার সুইচের যাবতীয় ফিউজ যেন জীবন্ত তারের সাথে সংযোগ হয়, সেদিকে বিশেষ করে নজর দিতে হবে। তাছাড়া সমস্ত তার পিভিসি বা যেকোনো

২০২৩

অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা মোড়ানো হতে হবে।

বর্তমানে ওয়ারিং কেবলকে সাধারণত দেয়ালের প্লাস্টারের ভিতর দিয়ে টানা হয়। তাছাড়া সব ধরনের যন্ত্রপাতির জন্য ফিউজ সংযোগ নিশ্চিত করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতির (যেমন ফ্রিজ, টিভি ইত্যাদি) জন্য উপযোগী ফিউজ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় লোড নিতে পারে, সে ধরনের কেবল (Cable) ব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে বিদ্যুৎ প্রবাহের সময় তার উত্তপ্ত হয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১২.২ তড়িৎ বিশ্লেষণ (Electrolysis)

কোনো দ্রবণের মধ্যে বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহিত করে এর অণুগুলোকে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক অংশে বিভক্ত করার পদ্ধতিকে তড়িৎ বিশ্লেষণ বলে।

তড়িৎ প্রবাহ করে দ্রবণের যে দ্রবটিকে দুই ভাগে বিভক্ত বা বিশ্লেষণ করা হয়, তাকে তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ বলে। আমরা আগে দেখেছি যে পরিবাহকের দুই পাশে ব্যাটারি সেল দিয়ে বিভব পার্থক্য তৈরি করলে পরিবাহকের মুক্ত ইলেকট্রনগুলো প্রবাহিত হয়, যেটাকে আমরা বিদ্যুৎ বা তড়িৎ প্রবাহ বলি। তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় দ্রবণের ভেতর দিয়ে কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হবে? তড়িৎ বিশ্লেষণের বা ইলেকট্রোলাইসিসের সময় তড়িৎ দ্রবটি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নে বিভক্ত এবং ঋণাত্মক আয়নের প্রবাহ দিয়ে দ্রবণে বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয়। সকল এসিড, ক্ষার, কয়েকটি নিরপেক্ষ লবণ, এসিড মেশানো পানি ইত্যাদি তড়িৎ দ্রব বা তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ। যেমন: H_2SO_4, HNO_3, $CuSO_4$, $AgNO_3$, $NaOH$ ইত্যাদি।

আমরা জানি, স্বাভাবিক অবস্থায় পরমাণু বা অণুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটনের সংখ্যার সমান হয়ে থাকে। কোনো অণু, পরমাণু বা যৌগমূলকে যদি স্বাভাবিক সংখ্যার ইলেকট্রনের চেয়ে কম বা বেশি ইলেকট্রন থাকে তাহলে তাকে আয়ন বলে। ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে কম হলে তাকে বলে ধনাত্মক আয়ন। আর যদি ইলেকট্রনের সংখ্যা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয় তাহলে তাকে বলে ঋণাত্মক আয়ন।

তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় তড়িৎ দ্রব ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আয়নে ভাগ হয়ে যায়। একটু আগে উল্লেখ করা তড়িৎ দ্রবগুলো নিচে দেখানো উপায়ে আয়নে বিভক্ত হয়ে যাবে:

$$H_2SO_4 \longrightarrow 2H^+ + SO_4^{--}$$
$$HNO_3 \longrightarrow H^+ + NO_3^-$$
$$CuSO_4 \longrightarrow Cu^{++} + SO_4^{--}$$
$$AgNO_3 \longrightarrow Ag^+ + NO_3^-$$
$$NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$$

বিখ্যাত বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস (Arrhenius) ১৮৮১ সালে তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা দেন। তিনি দেখিয়েছিলেন এসিড, ক্ষার বা লবণজাতীয় যৌগিক পদার্থকে তরলে দ্রবীভূত করলে সেগুলো আয়নায়িত হয়ে সম-পরিমাণ ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধান বা চার্জযুক্ত আয়নে ভাগ হয়ে যায়। আধানযুক্ত অবস্থায় আয়নগুলোর রাসায়নিক ধর্ম প্রকাশ পায় না। তবে চার্জহীন বা নিষ্ক্রিয় হলে এরা আবার রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারে। আয়নগুলো তরলের মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরে বেড়ায়। পরিবাহকে যেরকম ইলেকট্রন বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে, দ্রবণে এই আয়নগুলো সেরকম বিদ্যুৎ প্রবাহ করতে পারে। এখন এই তরলের মাঝে দুটি পরিবাহী দণ্ড বা তড়িৎদ্বার রেখে তরলের ভেতর যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ করা হয় তাহলে ঋণাত্মক আয়নগুলো অ্যানোড ও ধনাত্মক আয়নগুলো ক্যাথোডের দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। দুটি পরিবাহী দণ্ড বা ইলেকট্রোডের মধ্যে আয়নগুলোর এই বিপরীতমুখী প্রবাহের জন্য তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়।

১২.২.১ তুঁতের দ্রবণের তড়িৎ বিশ্লেষণের ব্যাখ্যা

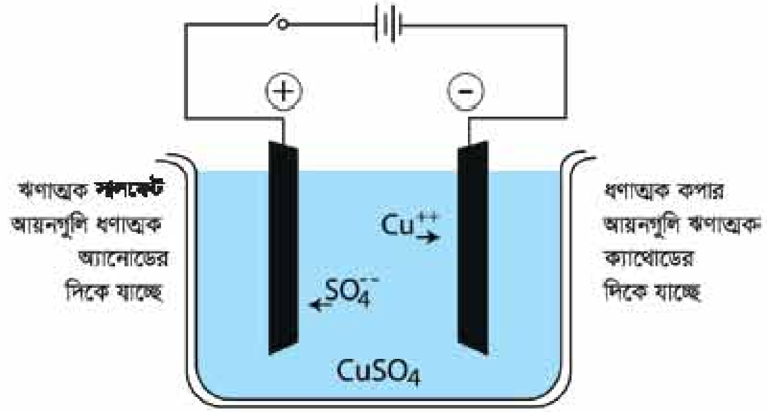

চিত্র ১২.০৮: তড়িৎ বিশ্লেষণ

ধরা যাক একটি কাচপাত্রে কিছু তুঁত বা $CuSO_4$ ও পানি নেওয়া হলো। $CuSO_4$ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে Cu^{++} ও SO_4^{--} আয়নে বিশ্লিষ্ট হয় (চিত্র ১২.০৮)। এখন দ্রবণের মধ্যে দুটি তামার পাত ডুবিয়ে যদি পাত দুটির সাথে একটি তড়িৎ কোষ সংযুক্ত করা হয় তাহলে আয়নের প্রবাহ শুরু হবে। Cu^{++} আয়নগুলো ক্যাথোডে গিয়ে ক্যাথোড থেকে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং নিস্তড়িত তামায় পরিণত হয়ে ক্যাথোডে জমা হতে থাকবে। অন্যদিকে SO_4^{--} আয়নগুলো অ্যানোড দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে সেখানে যাবে এবং সেখানে দণ্ডের কপার দুটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে Cu^{++} আয়ন হিসেবে দ্রবণে চলে আসে। দ্রবণে বিদ্যমান SO_4^{2-} আয়ন Cu^{++} আয়নের সাথে মিলে $CuSO_4$ এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে। এই Cu^{++} আয়ন ক্যাথোড থেকে ইলেকট্রন গ্রহণ করে Cu ধাতুতে পরিণত হয়।

সুতরাং দেখা যাবে, দ্রবণ থেকে যে পরিমাণ Cu ক্যাথোডে জমা হচ্ছে, ঠিক সেই পরিমাণ Cu অ্যানোড থেকে দ্রবণে চলে আসছে । অর্থাৎ মোট ফল হচ্ছে অ্যানোডের ভর যতটুকু হ্রাস পায় ক্যাথোডের ভর

ঠিক ততটুকুই বৃদ্ধি পায়, আমাদের মনে হবে অ্যানোড থেকে Cu বুঝি ক্যাথোডে জমা হচ্ছে। কিন্তু ইলেকট্রোড দুটি তামার বদলে অন্য কোনো নিষ্ক্রিয় ধাতুর তৈরি হলে ক্যাথোডে ঠিকই আগের মতো তামার অণু জমা হবে কিন্তু $CuSO_4$ অ্যানোড থেকে Cu নিয়ে $CuSO_4$ হতে পারবে না বলে শুধুমাত্র বাড়তি ইলেকট্রন ত্যাগ করে পানির সাথে বিক্রিয়া করে H_2SO_4 উৎপন্ন করবে এবং O_2 গ্যাস বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসতে থাকবে। ফলে আমরা দেখব দ্রবণের ঘনত্ব ধীরে ধীরে কমে আসছে।

১২.২.২ প্রাত্যহিক জীবনে তড়িৎ বিশ্লেষণের গুরুত্ব

১. তড়িৎ প্রলেপন (Electroplating)

তড়িৎ বিশ্লেষণ করে একটি ধাতুর ওপর অন্য কোনো ধাতুর প্রলেপ দেওয়াকে তড়িৎ প্রলেপন বলে। সাধারণত কোনো কম দামি ধাতু (যেমন তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদি) দিয়ে তৈরি জিনিসকে জলবায়ু থেকে রক্ষা করার জন্য কিংবা সুন্দর দেখানোর জন্য সেগুলোর ওপর সোনা, রুপা, নিকেল এরকম মূল্যবান ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয়। যে ধাতব বস্তুটিকে প্রলেপ দিতে হবে, সেটি খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে ধুয়ে একটি পাত্রে রাখতে হবে। এটি হবে ক্যাথোড ইলেকট্রোড। যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে তাকে অ্যানোড করা হয়। তড়িৎ দ্রব হিসেবে যে ধাতুর প্রলেপ দিতে হবে, তার কোনো একটি লবণের দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। এখন ব্যাটারি বা পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করে অ্যানোড থেকে ক্যাথোডে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে ধাতুর তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে ক্যাথোডে রাখা ধাতব বস্তুর ওপর ধাতুর প্রলেপ পড়ে (চিত্র ১২.০৯)।

উদাহরণ হিসেবে ছবিতে কীভাবে রুপার প্রলেপন দিতে হবে সেটি দেখানো হয়েছে।

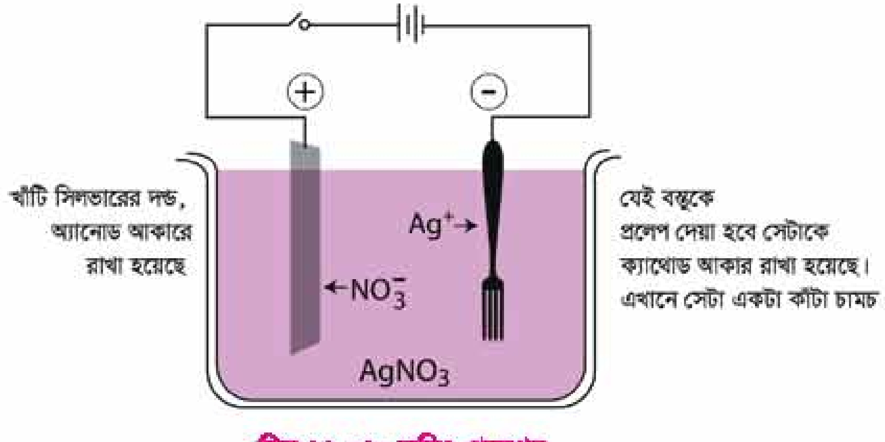

চিত্র ১২.০৯: তড়িৎ প্রলেপন

২০২৫

২. তড়িৎ মুদ্রণ (Electrotyping)

তড়িৎ প্রলেপের একটি বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করে হরফ, ব্লক মডেল ইত্যাদি তৈরি করাকে তড়িৎ মুদ্রণ বলে। তড়িৎ মুদ্রণের জন্য প্রথমে লেখাটি সাধারণ টাইপে মোমের ওপর ছাপ নেওয়া হয়। এর উপরে কিছু গ্রাফাইট গুঁড়ো ছড়িয়ে একে তড়িৎ পরিবাহী করা হয়। তারপর কপার সালফেট দ্রবণে এটি ক্যাথোড পাত হিসেবে ডুবানো হয় এবং একটি তামার পাতকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্যে তড়িৎ প্রবাহ চালালে মোমের ছাঁচের ওপর তামার প্রলেপ পড়বে। প্রলেপ খানিকটা পুরু হলে ছাঁচ থেকে ছাড়িয়ে ছাপার কাজে ব্যবহার করা হয়।

৩. ধাতু নিষ্কাশন ও শোধন (Extraction and purification of metals)

খনি থেকে কোনো ধাতু সাধারণত বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় না। এদের মধ্যে নানা ধাতুর মিশ্রণ থাকে যাকে আকরিক বলা হয়। তড়িৎ বিশ্লেষণের সাহায্যে আকরিক থেকে সহজে ধাতু নিষ্কাশন এবং শোধন করা যায়। যে আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে, সেটিকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। যে ধাতু নিষ্কাশন করতে হবে, তার কোনো লবণের দ্রবণকে তড়িৎ দ্রব এবং তার ছোট একটি বিশুদ্ধ পাতকে ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এখন দ্রবণের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহ চালনা করলে আকরিক থেকে বিশুদ্ধ ধাতু নিষ্কাশিত হয়ে ক্যাথোডে সঞ্চিত হতে থাকবে।

১২.৩ তড়িৎ ক্ষমতা

পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় "কাজ" কথাটির একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ আছে। কাজ এবং শক্তির একক হচ্ছে জুল। শক্তি প্রয়োগ করে কাজ করা যায় এবং কাজ করার হার অর্থাৎ একক সময়ে সম্পন্নকৃত কাজকে ক্ষমতা বলে। কোনো তড়িৎ যন্ত্র প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি ব্যয় করে কিংবা অন্য শক্তিতে (তাপ, আলো, যান্ত্রিক ইত্যাদি) রূপান্তরিত করে তাকে তড়িৎ ক্ষমতা বলে।

কিলোওয়াট

কোনো রোধ বা তড়িৎ যন্ত্রের দুই পাশের বিভব পার্থক্য এক ভোল্ট হলে যদি এর মধ্য দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার তড়িৎ প্রবাহিত হয়, তবে ঐ যন্ত্রের ক্ষমতা এক ওয়াট।

এক ওয়াট = ১ ভোল্ট × ১ অ্যাম্পিয়ার

যখন অনেক বেশি তড়িৎ ক্ষমতা ব্যবহৃত হয় তখন সেটাকে কিলোওয়াট বা মেগাওয়াটে প্রকাশ করা সুবিধাজনক।

১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট বা $১০^{৩}$ ওয়াট এবং

১ মেগা ওয়াট = $১০^{৬}$ ওয়াট।

২০২৩

কিলোওয়াট-ঘণ্টা

এক ওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো তড়িৎ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে এক ঘণ্টা ধরে তড়িৎ প্রবাহিত হলে যে পরিমাণ তড়িৎ শক্তি অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় (যেমন বাতি জ্বললে আলোক শক্তি বা পাখা ঘুরালে যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যায়) সেটি হচ্ছে এক ওয়াট-ঘণ্টা।

> ১ ওয়াট-ঘণ্টা = ১ ওয়াট× ১ ঘণ্টা

অনেক সময় ওয়াট ঘণ্টার পরিবর্তে কিলোওয়াট ঘণ্টাও ব্যবহার করা হয়।
আমরা ইচ্ছা করলে এক কিলোওয়াট ঘণ্টা কতটুকু শক্তি সেটাও বের করতে পারি।

বা, ১ কিলোওয়াট–ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট × ৩৬০০ সেকেন্ড
= ৩,৬০,০০০০ ওয়াট-সেকেন্ড
= ৩,৬০,০০০০ জুল

অর্থাৎ শক্তির এককে এটি ৩.৬ মেগা জুল।

আন্তর্জাতিকভাবে, তড়িৎ সরবরাহকে কিলোওয়াট-ঘণ্টা এককে পরিমাপ করা হয়। এই একককে বোর্ড অব ট্রেড (BOT) ইউনিট বা সংক্ষেপে ইউনিট বলে। আমরা যে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করি তা এই এককেই হিসাব করা হয়।

তড়িৎ ক্ষমতার হিসাব

আমরা জানি, তড়িৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান প্রতি মাসেই আমাদের বাড়ি বা প্রতিষ্ঠানের তড়িৎ খরচের একটি বিল পাঠায়। এই প্রতিষ্ঠান প্রতি ইউনিটের মূল্য ঠিক করে দেয়। সেই অনুযায়ী আমরা তড়িৎ বা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করে থাকি। অর্থাৎ **ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির খরচ = ব্যয়িত তড়িৎ শক্তির একক × প্রতি এককে খরচ।** সব বৈদ্যুতিক যন্ত্রে (লাইট, ফ্যান, কম্পিউটার) কী পরিমাণ বিদ্যুৎ বা তড়িৎ ক্ষমতার প্রয়োজন হয়, সেটি উল্লেখ থাকে। কাজেই সেখান থেকে সহজেই আমরা ব্যয়িত শক্তি বের করতে পারব।

আমরা ব্যয়িত শক্তি ইউনিট বা কিলোওয়াট বের করতে চাই। যদি একটি যন্ত্রের ক্ষমতা P ওয়াট হয় এবং সেটি আমরা t ঘণ্টা ব্যবহার করি তাহলে ব্যয়িত শক্তি E হচ্ছে:

$E = P \times t$ ওয়াট ঘন্টা
$E = (P \times t)$ /১০০০ কিলোওয়াট ঘণ্টা (অথবা ইউনিট)

সুতরাং কোনো যন্ত্রের ক্ষমতা জানলে সহজেই তড়িৎ শক্তি ব্যয়ের খরচ বের করতে পারি। যেমন ৬০ ওয়াটের একটি বাল্ব (P=৬০ W) প্রতিদিন ৫ ঘণ্টা করে ৩০ দিন (t=৩০×৫ hour) জ্বললে কত তড়িৎ শক্তি ব্যয় হবে?

আমরা জানি,
ব্যয়িত শক্তি = (P × t) /১০০০ ইউনিট
= ৬০ × (৩০ × ৫)/১০০০ ইউনিট
= ৯ ইউনিট
এখন যদি প্রতি ইউনিটের মূল্য ৮ টাকা হয়, তবে উক্ত পরিমাণ বিদ্যুতের জন্য মোট ব্যয় হবে
মোট তড়িৎ ব্যয় = ৯ × ৮ টাকা
= ৭২ টাকা

220V–60W—এর অর্থ : তড়িৎ আলো পাওয়ার জন্য আমরা যে বাল্ব ব্যবহার করি তার গায়ে দুটি সংখ্যার পাশে V এবং W লেখা থাকে। কোনো বাল্বের গায়ে ২২০V এবং ৬০W লেখা থাকলে বোঝা যায় ২২০ বিভব পার্থক্য বাল্বটিতে সংযুক্ত করলে বাল্বটি সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বলভাবে জ্বলবে এবং তখন প্রতি সেকেন্ড ৬০ জুল বৈদ্যুতিক শক্তি আলো ও তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হবে।

এনার্জি সেভিং বাল্বের সুবিধা : এক সময় আমরা সাধারণ বাল্ব ব্যবহার করতাম। এই বাল্বে একটি ধাতব ফিলামেন্টকে উত্তপ্ত করে আলো তৈরি হতো বলে প্রচুর তাপ শক্তির প্রয়োজন হতো। প্রযুক্তির কারণে এখন গৃহস্থালি কাজে ব্যবহার করার জন্য এনার্জি সেভিং বাল্ব সহজ লভ্য হয়ে গেছে। দুই ধরনের এনার্জি সেভিং বাল্ব রয়েছে সি.এফ.এল (Compact Fluroscent Lamp) এবং এল.ই.ডি (Light Emitting Diode) বাল্ব। এই এনার্জি সেভিং বাল্বে বিদ্যুৎ ২০-৮০% সাশ্রয় হতে পারে এবং সাধারণ বাল্বের তুলনায় এটি ৩ থেকে ২৫ গুণ বেশি সময় টিকে থাকতে পারে।
একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে প্রতি পরিবারে যদি একটি করে সাধারণ বাল্বের পরিবর্তে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করে, তবে যে পরিমাণ শক্তি বাঁচে তা দিয়ে প্রতিবছরে ৩০ লক্ষ পরিবারে তড়িৎ সংযোজন দেওয়া সম্ভব।

আমরা যদি এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করে, শক্তির অপচয় কমাতে পারি, তবে জ্বালানির ওপরও আমাদের নির্ভরতা কমাতে পারি। কারণ, জীবাশ্ম জ্বালানি দিয়ে তড়িৎ উৎপাদনের ফলে পরিবেশের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে।

এনার্জি সেভিং বাল্ব সাধারণ বাল্বের চেয়ে বেশি দিন টিকে। ফলে কমসংখ্যক বাল্ব পরিত্যক্ত হয়। যার কারণে ময়লা আবর্জনা ব্যবস্থানায়ও সুবিধা হয় পরিবেশের উপর চাপও কম পড়ে।

একক কাজ

কাজ: কেন সবার এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করা উচিত তার উপর একটি পোস্টার তৈরি করো।

১২.৪ তড়িৎ শক্তি ব্যবহার

১২.৪.১ আইপিএস এবং ইউপিএস

আমরা আমাদের দৈনন্দিন এবং কর্মজীবনে বিদ্যুতের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এবং অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সাপ্লাই বন্ধ হলে আমাদের সব কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময়েই তখন আমরা সাময়িকভাবে ভিন্ন বিদ্যুৎ সাপ্লাই ব্যবহার করি। ঘরের লাইট ফ্যানের জন্য এই ভিন্ন বিদ্যুৎ সাপ্লাই চালু করার জন্য দুই এক সেকেন্ড দেরি হলে আমাদের তেমন সমস্যা হয় না কিন্তু কম্পিউটার এবং এ ধরনের যন্ত্রপাতির বেলায় বিদ্যুৎ সাপ্লাই হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বড় ধরনের সমস্যায় পড়ে যাই। কম্পিউটারের তথ্য নষ্ট হতে পারে, এমন কী তার যন্ত্রপাতির ক্ষতি হতে পারে।

মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হওয়ার পর ভিন্ন সাপ্লাই দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ নিরবচ্ছিন্ন রাখার প্রক্রিয়াটি কত দ্রুত করা যায় তার উপর নির্ভর করে আইপিএস এবং ইউপিএস (চিত্র ১২.১০) তৈরি করা হয়েছে।

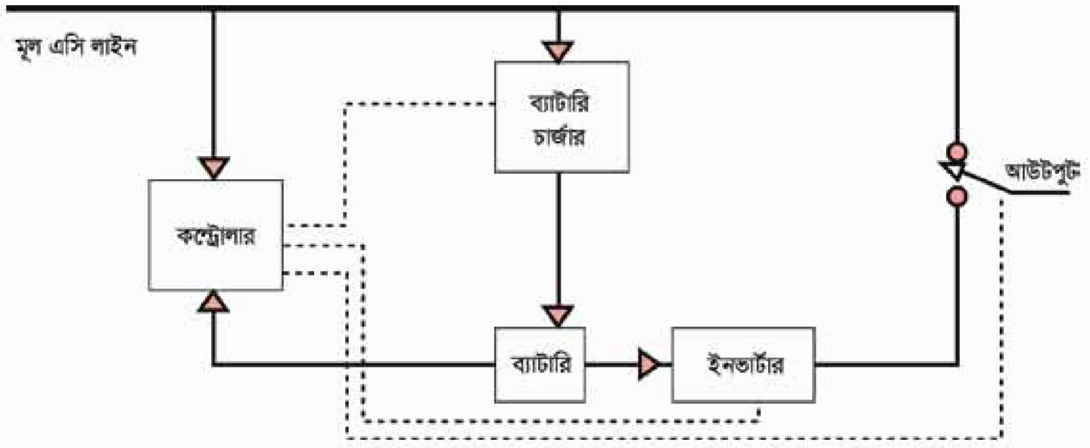

চিত্র ১২.১০: আইপিএস/ইউপিএস

বাসায় লাইট ফ্যান একটু খানি দেরি করে চালু হলেও ক্ষতি নেই বলে সেখানে আইপিএস ব্যবহার করা হয়। এটি চালু হতে এক দুই সেকেন্ড সময় নেয় এবং সাধারণত বাসার গৃহস্থালি কাজে অর্থাৎ লাইট ফ্যান চালু করার কাজে ব্যবহার করা হয়। কাজেই আইপিএস মোটামুটি বেশ অনেকক্ষণ যথেষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে।

ডেস্কটপ কম্পিউটার কিংবা এরকম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির বেলায় ইউপিএস ব্যবহার করা হয়। কারণ বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হবার দশ মিলিসেকেন্ডের ভেতর ইউপিএস বিদ্যুৎ প্রবাহ নিশ্চিত করতে পারে। কাজেই কম্পিউটারের বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয় না। ইউপিএস এর বিদ্যুৎ প্রবাহ করার ক্ষমতা কম, সাধারণত

কম্পিউটারের কাজকর্মগুলো গুছিয়ে নিয়ে, প্রয়োজনীয় ফাইলগুলো সেভ করে, কম্পিউটারটি বন্ধ করে দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

১২.১০ ছবিতে আইপিএস কিংবা ইউপিএসের কার্যপদ্ধতি দেখানো হলো। মূল বিদ্যুৎ প্রবাহ যখন চালু থাকে, তখন আইপিএস কিংবা ইউপিএসের ব্যাটারিগুলো চার্জ করা হতে থাকে। হঠাৎ করে মূল বিদ্যুৎ এবং সুইচটি মূল সাপ্লাই থেকে সরিয়ে ব্যাটারির সার্কিটের সাথে সংযুক্ত করে দেয়। ব্যাটারি থেকে ডিসি সাপ্লাই পাওয়া যায় বলে ইনভার্টার দিয়ে আগে এসি করে নিতে হয়। যখন মূল সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে কন্ট্রোল সার্কিট ইনভার্টারের সার্কিটও চালু করে দেয়।

১২.৪.২ তড়িতের সিস্টেম লস

আমরা জানি, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত পাওয়ার প্লান্টগুলোতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করে। এই বিদ্যুৎকে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন এলাকায় পাঠাতে হয়। বিদ্যুৎ বিতরণ করার জন্য প্রথমে বিভিন্ন এলাকার সাব-স্টেশনে পাঠানো হয়। সাব-স্টেশন থেকে বিদ্যুৎ বিতরণ-ব্যবস্থা ব্যবহার করে বিদ্যুৎ শক্তিকে একেবারে গ্রাহক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

বিদ্যুৎ শক্তিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিতরণ করার জন্য যে পরিবাহী তার ব্যবহার করা হয়, কম হলেও তাদের এক ধরনের রোধ থাকে। একটা রোধের (R) ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ (I) হলে সবসময়েই (I^2R) তাপ উৎপন্ন হয় এবং সেটি বিদ্যুৎ শক্তির লস বা ক্ষয়। এই লসকে বলা হয় সিস্টেম লস। তোমরা এর মাঝে জেনে গেছ যে একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ শক্তির জন্য যদি উচ্চ ভোল্টেজ বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তাহলে রোধজনিত তাপশক্তি হিসেবে লস কমে যায়। সে জন্যে বিদ্যুৎকেন্দ্রে যে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন করা হয় সেটিকে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার দিয়ে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা হয়। গ্রাহকদের ব্যবহারের জন্য বিদ্যুৎ শক্তিকে বিতরণ করার আগে স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করে সেটিকে আবার ব্যবহারযোগ্য ভোল্টেজে নামিয়ে আনা হয়।

১২.৪.৩ লোড শেডিং

প্রত্যেকটি বিদ্যুৎকেন্দ্রে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করে এবং সবগুলো বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যোগ হয়। আগেই বলা হয়েছে— এই বিদ্যুৎ স্থানীয় সাব-স্টেশন (বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র)— এর মাধ্যমে গ্রাহকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। বিভিন্ন এলাকার চাহিদা অনুযায়ী জাতীয় গ্রিড বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। কোনো এলাকায় বিদ্যুতের চাহিদা যদি উৎপাদন থেকে বেশি হয়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে না। তখন বাধ্য হয়ে সাব-স্টেশনগুলো এক এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য অন্য একটি এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়। এই প্রক্রিয়াটার নাম লোড শেডিং। সাব-স্টেশন যখন আবার প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ পায় তখন সেই এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করে।

যদি একনাগাড়ে কয়েক ঘণ্টা লোডশেডিং করতে হয়, তখন গ্রাহক পর্যায়ে লোডশেডিংকে সহনীয় করার জন্য কর্তৃপক্ষ চক্রাকারে বিভিন্ন জায়গা আলাদা আলাদা সময়ে লোডশেডিং করে থাকে।

১২.৫ উন্নয়ন কার্যক্রমে শক্তির ব্যবহার

একটি দেশের উন্নয়নের সাথে শক্তির ব্যবহারের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কী, একটি দেশ কতটুকু উন্নত, সেটি বোঝার প্রথম মাপকাঠি হিসেবে শক্তির ব্যবহারকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের সবার প্রথম শিক্ষার দিকে নজর দেয়া উচিত। এই দেশে বিপুলসংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুল-কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ভালোভাবে চালানোর জন্য সেখানে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হয়। তাদের পড়াশোনা করার জন্য রাতে আলোর দরকার হয় এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা না হলে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়। উচ্চশিক্ষার বেলায় ল্যাবরেটরি ব্যবহার করতে হয়, কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ককে সচল রাখতে হয় যার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের কোনো বিকল্প নেই।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে কৃষি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশটি ছোট বলে কৃষি উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম এবং সেটি আরো কমে আসছে। এই কৃষিভূমিতে দুই বা ততোধিক ফসল ফলিয়ে আমাদের দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। এ কারণে শুধু প্রাকৃতিক কৃষির উপর অপেক্ষা না করে কৃষিজমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করতে হয় এবং শক্তির সরবরাহ ছাড়া সেটি কোনোভাবে সম্ভব নয়। পানি সেচের জন্যে পাম্প চালাতে বিদ্যুৎ কিংবা জ্বালানির প্রয়োজন হয়। চাষাবাদের জন্য সারের প্রয়োজন হয় এবং সার কারখানায় বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সরবরাহ ছাড়া প্রয়োজনীয় উৎপাদন সম্ভব নয়। জমি চাষ করার জন্য এবং ফসলকে প্রক্রিয়া করার জন্য ট্রাক্টর ব্যবহার করা হয় এবং ট্রাক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় জ্বালানির সরবরাহ থাকতে হবে।

কৃষির পর স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য শক্তির সরবরাহ প্রয়োজন। সুস্থ দেহে থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দরকার হয়। বাংলাদেশের মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ তৈরি এবং বর্জ্য প্রক্রিয়া করার জন্য শক্তির দরকার হয়। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার জন্যে শক্তির দরকার হয়। চিকিৎসা সেবার জন্যে হাসপাতালে এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকতে পারে না।

শিক্ষা, কৃষি এবং স্বাস্থ্য ছাড়াও দেশের যোগাযোগব্যবস্থা, শিল্প, কলকারখানা এবং অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য শক্তির দরকার হয়। সে কারণে সঠিক পরিকল্পনা করে দেশে বিদ্যুৎকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে যেন ভবিষ্যতে শক্তির ঘাটতি না হয়। শক্তির অপচয় বন্ধ করতে হবে এবং নতুন কূপ খনন করে গ্যাস অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে হবে। দেশে বিদ্যুৎ প্রয়োজন অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে নিউক্লিয়ার শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোনটি অ্যামিটারের প্রতীক?

(ক) (খ) 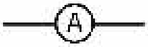

(গ) 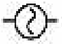 (ঘ)

২. তড়িৎ বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় প্রলেপ দেওয়া হয়—
(i) লোহার ওপর নিকেলের
(ii) দস্তার ওপর লোহার
(iii) তামার ওপর সোনার

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
রিশন বকশীগঞ্জে বাস করে। এখানে প্রায়ই বিদ্যুতের লোডশেডিং হয়। এ কারণে বিভিন্ন কাজে অসুবিধা হওয়ায় রিশন বাড়িতে আইপিএস লাগিয়েছে।

৩. বিদ্যুতের বিকল্প হিসেবে লাগালো যন্ত্রটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:
(i) এটি অপর্যাপ্ত প্রবাহে চলে
(ii) নিম্ন ভোল্টেজে চার্জিত হয়
(iii) তড়িতের আউটপুটের সাথে সংযুক্ত থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪. বকশীগঞ্জের সমস্যার কারণ:
(i) বিদ্যুতের সিস্টেম লস
(ii) সরবরাহ পদ্ধতির ত্রুটি
(iii) চাহিদার তুলনায় তড়িতের স্বল্প উৎপাদন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii

(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মিসেস মনসুরা খানম একজন সচেতন গৃহিণী। বাড়ির বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি হিসাব করে চলেন। প্রতিদিন গড়ে ৬ ঘণ্টা করে ১০০ ওয়াটের ৫টি বাল্ব জ্বালান। ইদানীং তিনি লক্ষ করছেন বিদ্যুৎ বিল বেশি আসছে। এজন্য তিনি বাল্বগুলো পরিবর্তন করে ৫টি ২০ ওয়াটের এনার্জি সেভিং বাল্ব লাগান।

(ক) তড়িৎ ক্ষমতা কী?

(খ) একটি বাল্বের গায়ে ২২০ ভোল্ট-৬০ ওয়াট লেখা আছে এর অর্থ কী?

(গ) প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের মূল্য ৫ টাকা হলে পূর্বে মনসুরা খানমের কত বিল আসতো?

(ঘ) পরবর্তীতে বাল্বগুলোর পরিবর্তনে মনসুরা খানমের কী লাভ হলো? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও।

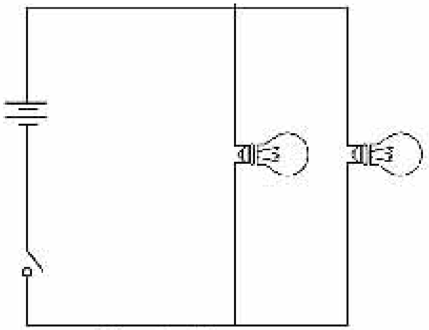

চিত্র: ১২.১১

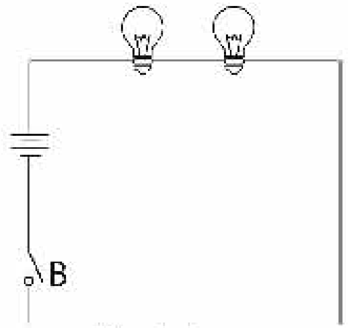

চিত্র: ১২.১২

২. নিচের চিত্র দুটি দেখ এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

(ক) তড়িৎ বিশ্লেষণ কাকে বলে?

(খ) অ্যানোড বলতে কী বুঝায়?

(গ) 'B' চিহ্নিত অংশে কী অবস্থায় ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়? ব্যাখ্যা করো।

(ঘ) চিত্র ১২.১১ ও চিত্র ১২.১২-এর মধ্যে বাড়িতে সংযোগের ক্ষেত্রে কোনটি বেশি সুবিধাজনক? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সবাই কাছাকাছি

যোগাযোগ মানুষের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। যোগাযোগ মানুষ, দেশ এবং সমাজকে অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ নানাভাবে একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করে আসছে। এখন আমরা রেডিও, টেলিভিশন, স্যাটেলাইট, টেলিফোন, মোবাইল ফোন বা সেল ফোন ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ও ই-মেইল ব্যবহার করে মুহূর্তের মাঝে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগাযোগ করতে পারি। যোগাযোগ মানুষের জীবনযাত্রার মান পাল্টে দিয়েছে, তাকে নিয়ে যাচ্ছে উন্নতির চরম শিখরে। সমাজ, দেশ আর বিশ্বে অর্থপূর্ণ এবং উন্নত জীবন যাপন করতে হলে বিভিন্ন মানুষ, দেশ ও সমাজের সাথে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতেই হবে। এই অধ্যায়ে আমরা যোগাযোগ, এর নীতিমালা এবং যোগাযোগের বিভিন্ন কৌশল ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- তথ্য ও যোগাযোগের মূলনীতি ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ব্লকচিত্র ব্যবহার করে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ বর্ণনা করতে পারব।
- মাইক্রোফোন ও স্পিকারের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারব।
- এনালগ ও ডিজিটাল সংকেতের ব্যাখ্যা করতে পারব।
- ডিজিটাল সংকেতের সুবিধা বর্ণনা করতে পারব।
- ব্লকচিত্রের সাহায্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-সংক্রান্ত প্রধান প্রধান যন্ত্রপাতির (মেশিন) কার্যক্রম তাদের সুবিধা এবং জীবনে এগুলোর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।

১৩.১ যোগাযোগ (Communication)

১৩.১.১ যোগাযোগ কী?

'যোগাযোগ' শব্দটির সাথে আমরা সবাই পরিচিত। প্রতিদিন আমরা হাজার রকম যোগাযোগ করছি। যেমন সড়কপথের যোগাযোগ, নৌপথে যোগাযোগ কিংবা আকাশ পথে যোগাযোগ। এসব বলতে বোঝায় গাড়ি, রেল, নৌকা, স্টিমার ও বিমানকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য যায়গায় যাওয়া বা কোনো মালপত্র পৌঁছে দেয়া। আজকে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের যোগাযোগের কথা বলব। এর নাম তথ্য যোগাযোগ। ভোর বেলা যখন তোমার ঘড়ির অ্যালার্ম বাজে এবং তুমি ঘুম থেকে উঠ, সেটি হচ্ছে ঘড়ির সাথে তোমার যোগাযোগ। টেলিভিশনে বা রেডিওতে খবর শুনছ বা কোনো অনুষ্ঠান দেখছ বা শুনছ—এটাও এক ধরণের যোগাযোগ। টেলিফোনে কোনো ট্যাক্সি ক্যাবকে তোমার বাসায় ডাকলে সেটিও যোগাযোগ। এই যে লেখাটা তুমি পড়ছ বা ক্লাসে তোমার শিক্ষকের কথা শুনছ, তাঁকে প্রশ্ন করছ, তাঁর প্রশ্নের জবাব দিচ্ছ— এগুলো সবই কোনো না কোনো ধরনের যোগাযোগ। সুতরাং যোগাযোগ হলো, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বা এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে বা এক যন্ত্র থেকে অন্য যন্ত্রে কথা-বার্তা, চিন্তাভাবনা বা তথ্যের আদান-প্রদান বা বিনিময় করা।

১৩.১.২ যোগাযোগের মৌলিক নীতিমালা

১. যোগাযোগের জন্য অবশ্যই প্রেরক এবং গ্রাহক থাকতে হবে। প্রেরক আর গ্রাহক ছাড়া যোগাযোগ হয় না। যোগাযোগের জন্য প্রেরক ও গ্রাহকের পরস্পরের প্রতি আস্থা থাকবে, থাকবে আগ্রহ এবং গ্রহণযোগ্যতা।

২. যোগাযোগের ভাষা হতে হবে সহজ, সরল, সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ। যোগাযোগ আসলে একটি আর্ট বা কলা। এর তথ্য বা সংকেত বা ভাষা হবে প্রেরক ও গ্রাহকের নিকট বোধগম্য এবং সুস্পষ্ট।

৩. সঠিক তথ্য পাঠাতে হবে সঠিক ব্যক্তির কাছে।

৪. যোগাযোগের ভাষা, কথা বা বার্তার মধ্যে অবশ্যই সৌজন্যবোধ থাকবে।

১৩.১.৩ যোগাযোগের প্রক্রিয়া ও এর ধাপ

যোগাযোগের জন্য প্রেরক বার্তাকে কোনো এক ধরনের সংকেতে রূপ দিয়ে সেটি কোনো মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করে। গ্রাহক সংকেতরূপী বার্তা গ্রহণ করে এর অর্থ উদ্ধার করে এবং প্রয়োজন হলে সাড়া প্রদান করে বা উত্তর দেয় (চিত্র ১৩.০১)। এ সাড়া বা উত্তরকে পাঠানো হয় প্রেরকের কাছে, এ কাজটিকে বলা হয় ফিডব্যাক। এভাবে যোগাযোগ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।

২০২৫

চিত্র ১৩.০১: যোগাযোগ প্রক্রিয়া

যেকোনো ইলেকট্রনিক যোগাযোগব্যবস্থায় থাকে একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি যোগাযোগমাধ্যম এবং একটি গ্রাহকযন্ত্র। অধিকাংশ যোগাযোগব্যবস্থার মেসেজ বা বার্তাটি তৈরি করে কোনো ব্যক্তি। পরে তা প্রেরকযন্ত্রের সাহায্যে যোগাযোগ মাধ্যম দিয়ে প্রেরণ করা হয়। গ্রাহকযন্ত্র এ বার্তা গ্রহণ করে অপর কোনো ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। এগুলোই হলো যোগাযোগের ধাপ (চিত্র ১৩.০২)।

চিত্র ১৩.০২: ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ব্যবহারের মূল উপাদান বা ধাপ

১৩.১.৪ যোগাযোগের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

যোগাযোগ হলো তথ্য আদান-প্রদানের মূল প্রক্রিয়া। এর মাধ্যমে মানুষ তার চিন্তা, ধারণা, অনুভব একে অন্যের কাছে প্রকাশ করে বা পৌঁছে দেয়। মানব সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানুষ একে অন্যের সাথে নানাভাবে যোগাযোগ করছে। এখন আমরা মুহূর্তের মধ্যে টেলিফোন, মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, ফ্যাক্স ও ই-মেইলের মাধ্যমে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যোগযোগ করতে পারি।

কোনো সমস্যা সমাধান বা সম্পর্কের উন্নতি নির্ভর করে সার্থক এবং কার্যকর যোগাযোগের উপর। পড়ালেখা, গবেষণা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা, রাজনীতি, অর্থনীতি, কূটনীতি, পরিবহন ব্যবস্থাপনা, অপরাধী ধরা, অপরাধ দমন ইত্যাদি সব কাজ সার্থকভাবে ও দ্রুত সম্পাদন করা যায় উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে। তথ্য বিনিময়, কোনো পরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়ন, কোনো যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ, মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি পণ্যের বিজ্ঞাপন প্রদান করে মানুষকে প্রভাবিত করা ইত্যাদি সব কাজই যোগাযোগের দ্বারা করা সম্ভব। ইলেকট্রনিক যোগাযোগ প্রযুক্তি আমাদের দিন দিন পৌঁছে দিচ্ছে উন্নতির শিখরে। প্রতিদিনই এগিয়ে যাচ্ছি আমরা। তাই এ যুগকে বলা হয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগ।

১৩.২ মাইক্রোফোন ও স্পিকার

১৩.২.১ মাইক্রোফোন

কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে বক্তারা যে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন তাকে মাইক্রোফোন বলে। মাইক্রোফোন বক্তার কণ্ঠস্বরকে বিদ্যুৎ সংকেত বা তড়িৎ সংকেতে রূপান্তর করে। সেই বিদ্যুৎ সংকেতকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয় এবং স্পিকারে পাঠানো হয়। স্পিকার সেটাকে শব্দে রূপান্তর করে এবং শ্রোতারা লাউড স্পিকারে জোরে শুনতে পান। তোমরা যখন মোবাইল ফোন ব্যবহার করো তখন বাইরে থেকে দেখা না গেলেও তোমরা আসলে মোবাইল ফোনের মাইক্রোফোনে কথা বল এবং স্পিকারে শুনতে পাও।

মাইক্রোফোনের কার্যক্রম

দৈনন্দিন কিংবা বিশেষ কাজে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের মাইক্রোফোন রয়েছে, ১৩.০৩ চিত্রে সেরকম সাধারণ একটি মাইক্রোফোনের গঠন দেখানো হলো। এই মাইক্রোফোনের সামনে ধাতুর একটি পাতলা পাত বা ডায়াফ্রাম থাকে। ডায়াফ্রামের সাথে একটা চলকুণ্ডলী (Coil) লাগানো থাকে যেটি ছবিতে দেখানো উপায়ে একটা চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ভেতর নাড়া চড়া করতে পারে। যখন কেউ এই মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলে তখন ডায়াফ্রামটি শব্দ তরঙ্গের কম্পনের সাথে কাঁপতে থাকে।

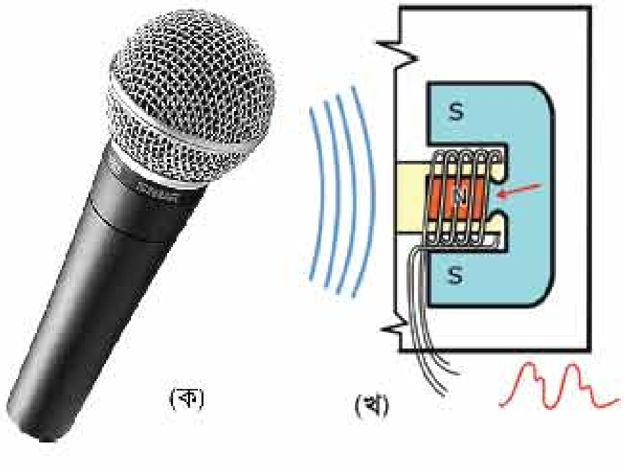

চিত্র ১৩.০৩: (ক) মাইক্রোফোন এবং তার (খ) গঠন

ডায়াফ্রামের সাথে লাগানো চলকুণ্ডলীটিও চৌম্বক ক্ষেত্রে সামনে পিছনে নড়তে থাকে। চৌম্বক ক্ষেত্রে একটি চলকুণ্ডলী নাড়াচড়া করলে সেখানে একটি বিদ্যুৎ শক্তির আবেশ হয়, কাজেই মাইক্রোফোনটি শব্দ-শক্তিটিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করে একটি বৈদ্যুতিক সিগন্যাল পাঠায়।

শব্দের এই বৈদ্যুতিক সিগন্যাল বা সিগন্যাল শব্দের নিখুঁত উপস্থাপন হলেও এর মান খুবই কম থাকে তাই তাকে ব্যবহার করার জন্য এমপ্লিফায়ারে বাড়িয়ে নিতে হয়। তারপর সেটি শুধু স্পিকারে নয়, টেলিফোন লাইনে, রেডিও সম্প্রচারে বা রেকর্ডিংয়ে ব্যবহার করা যায়।

১৩.২.২ স্পিকার

স্পিকার মাইক্রোফোনের ঠিক বিপরীত কাজটি করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ শক্তিটিকে শব্দের রূপান্তর করে। ১৩.০৪ চিত্রে একটি স্পিকারের গঠন দেখানো হলো, মাইক্রোফোনের ডায়াফ্রামের বদলে স্পিকারে

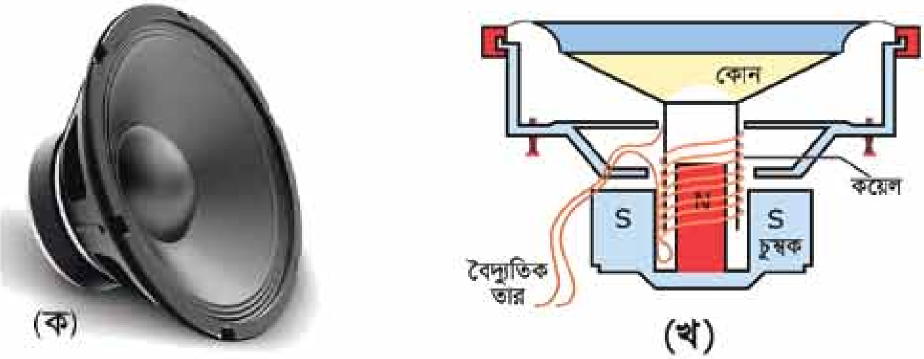

চিত্র ১৩.০৪: (ক) স্পিকার এবং তার (খ) গঠন

চলকুণ্ডলী বা Coil টি কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি একটি কোন (Cone) বা শঙ্কুর সাথে লাগানো থাকে। যখন শব্দ থেকে তৈরি বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধিত করে স্পিকারে পাঠানো হয়, তখন কাগজ বা হালকা ধাতুর তৈরি কোনটি সামনে পিছনে কম্পিত হয়ে যথাযথ শব্দ তৈরি করে।

১৩.৩ এনালগ ও ডিজিটাল সংকেত

সংকেত হলো কোনো চিহ্ন বা কার্য বা শব্দ যেটি নির্দিষ্ট তথ্য বহন করে। তথ্য বহন করার জন্য নানা ধরনের মাধ্যমে নানা ধরনের সংকেত ব্যবহার করা সম্ভব। এই অধ্যায়ে আমরা শুধু বৈদ্যুতিক বা তড়িৎ সংকেতের মাঝে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সংকেত প্রেরণের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ইলেক্ট্রিক্যাল সংকেতকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: এনালগ ও ডিজিটাল।

এনালগ সংকেত

আমাদের চারপাশে প্রতিমুহূর্তে যা ঘটেছে, যেমন শব্দ, আলো চাপ তাপমাত্রা বা অন্য কিছু সেগুলোকে আমরা কোনো এক ধরনের তথ্য বা উপাত্ত হিসেবে প্রকাশ করি। তাদের মান নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। আমাদের নানা কাজে সেই মানের প্রয়োজন হতে পারে, তাই সেই মান আমরা সংরক্ষণ করি, বিশ্লেষণ করি কিংবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রেরণ করি। উপাত্ত প্রক্রিয়া করার জন্য আমরা ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করতে পারি। নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা এই তথ্য বা উপাত্তকে

বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করা সম্ভব এবং এই ধরনের সংকেত বা সিগন্যালকে আমরা বলি এনালগ সংকেত বা এনালগ সিগন্যাল। এই এনালগ সিগন্যালকে যদি সরাসরি কোনো এক ধরনের ইলেকট্রনিক্স দিয়ে আমরা প্রক্রিয়া করি, তাহলে সেটাকে বলা হয় এনালগ ইলেকট্রনিক্স।

ডিজিটাল সংকেত

নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে থাকা তথ্য বা উপাত্তের এই সিগন্যালকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে প্রক্রিয়া করা সম্ভব। সেটি করার জন্য একটু পর পর তার মানটি কত বের করে কোনো এক ধরনের সংখ্যার প্রকাশ করে নিতে হয়। তারপর ধারাবাহিকভাবে এই সংখ্যাটির মানকে সংরক্ষণ করতে হয়। যখন সংকেতের মানকে সংখ্যায় বা ডিজিটে পরিবর্তন করে নেয়া হয়, তখন তাকে আমরা বলি ডিজিটাল সংকেত। আমরা তখন ডিজিটাল সংকেতের এই সংখ্যাগুলো আমাদের প্রয়োজনমতো ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে প্রক্রিয়া করতে পারব। যখন আবার সেটিকে তার মূল এনালগ সিগন্যালে পরিবর্তন করতে হয়, তখন ধারাবাহিকভাবে সংরক্ষিত মানের সমান বৈদ্যুতিক সিগন্যাল তৈরি করে নিতে হয়। আমরা দৈনন্দিন

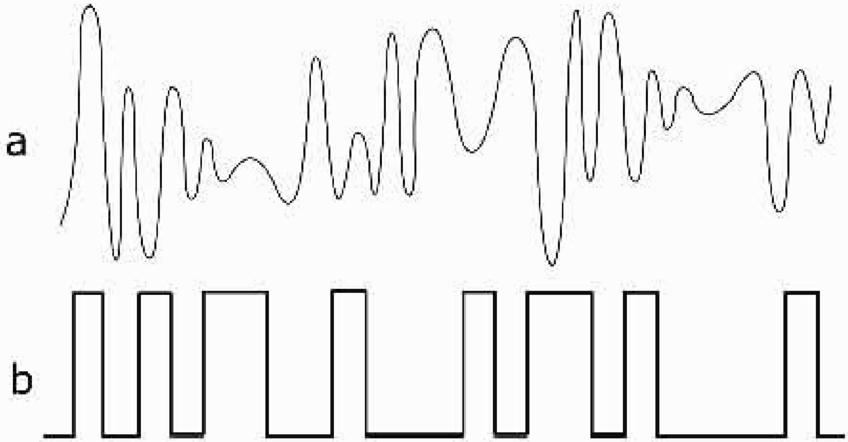

চিত্র ১৩.০৫: (a) এনালগ এবং (b) ডিজিটাল সিগন্যাল

জীবনে দশ ভিত্তিক দশমিক (Decimal) সংখ্যা ব্যবহার করি। কিন্তু ইলেকট্রনিক্সে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় বাইনারি সংখ্যা দিয়ে, কারণ তাহলে খুব সহজেই কোনো একটি নির্দিষ্ট ভোল্টেজকে ১ এবং শূন্য ভোল্টেজকে ০ ধরে প্রক্রিয়া করা যায়। এই ধরনের ইলেকট্রনিক্সকে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স (চিত্র ১৩.০৫) বলা হয়।

ইলেকট্রনিক্সের সবচেয়ে বড় অবদান কম্পিউটার এবং কম্পিউটারে সকল তথ্যের আদান-প্রদান বা তথ্য প্রক্রিয়া হয় ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স দিয়ে। ইন্টারনেট বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কেও ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে তথ্য আদান প্রদান করা হয়। শব্দ ছবি বা ভিডিও ইত্যাদি সিগন্যালগুলো শুরু হয় এনালগ সিগন্যাল হিসেবে এবং ব্যবহারও হয় এনালগ সিগন্যাল হিসেবে কিন্তু সেগুলো ডিজিটাল সিগন্যাল

হিসেবে সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকরণ বা প্রেরণ করা হয়। এনালগ সিগন্যালে খুব সহজেই নয়েজ (Noise) প্রবেশ করে সিগন্যালের গুণগত মান নষ্ট করতে পারে। একবার সেটি ডিজিটাল সিগন্যালে পরিবর্তিত করে নিলে সেখানে Noise এতো সহজে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। কাজেই সিগন্যালের গুণগত মান অবিকৃত থাকে।

ডিজিটাল সিগন্যাল প্রক্রিয়া করার জন্য বিশেষ ধরণের আইসি তৈরি করা হয়। এই আইসিগুলো ধীরে ধীরে অনেক ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ অনেক কম সময়ে নির্ভুলভাবে অনেক বেশি পরিমাণ ডিজিটাল সিগন্যালে প্রক্রিয়া করতে পারে। কাজেই যতই দিন যাচ্ছে, ডিজিটাল প্রক্রিয়া করার বিষয়টি ততই সহজ হয়ে যাচ্ছে এবং এটি বলা বাহুল্য নয় যে আমাদের চারপাশের জগৎটি একটি ডিজিটাল জগতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

১৩.৪ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এখন খুবই পরিচিত একটি বিষয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কাজ থেকে শুরু করে পেশাগত জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন আমরা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সহজেই করে ফেলতে পারি। ঊনবিংশ শতকে টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের বিকাশ উন্নয়নে মানুষের যোগাযোগে আর ক্ষমতা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতে যোগাযোগের বিপ্লব এনেছে রেডিও, টেলিভিশন, সেলফোন বা ফ্যাক্স। সাম্প্রতিক কালে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট।

১৩.৪.১ রেডিও

রেডিও (চিত্র ১৩.০৬) বিনোদন ও যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। রেডিওতে আমরা খবরের পাশাপাশি বিনোদনের জন্য গান বাজনা এমনকি পণ্যের বিজ্ঞাপনও শুনতে পারি। সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনী তথ্য আদানপ্রদানের জন্য নিজস্ব রেডিও ব্যবহার করে। মোবাইল বা সেলুলার টেলিফোন যোগাযোগেও রেডিও প্রযুক্তি ব্যবহার হয়।

চিত্র ১৩.০৬: রেডিও সেট

কোনো রেডিও সম্প্রচার স্টেশনের স্টুডিওতে যখন কেউ মাইক্রোফোনে কথা বলে, তখন সেই শব্দ বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। আমরা ২০ Hz থেকে ২০,০০০ Hz কম্পাঙ্ক পর্যন্ত শুনতে পারি কাজেই শব্দ থেকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তরিত সিগন্যালটিও এই কম্পাঙ্কের হয়। এটিকে পাঠানোর জন্য উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গের সাথে যুক্ত

করা হয়। এই উচ্চ কম্পাঙ্কের তরঙ্গকে বাহক তরঙ্গ বলে।

বাহক তরঙ্গের সাথে যুক্ত করার এই প্রক্রিয়াটিকে মডুলেশন বলা হয়। এই মডুলেটেড তরঙ্গ এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করা হয় এবং এন্টেনার সাহায্যে চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ বা রেডিও তরঙ্গ ভূমি তরঙ্গ হিসেবে কিংবা বায়ুমণ্ডলের আয়োনোস্ফিয়ারে প্রতিফলিত হয়ে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়তে পারে (চিত্র ১৩.০৭)। গ্রাহক যন্ত্রের ভেতর যে এন্টেনা থাকে সেটি এই রেডিও তরঙ্গকে বিদ্যুৎ তরঙ্গে রূপান্তর করে নেয়। এরপর প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে বাহক তরঙ্গ থেকে আলাদা করে নেওয়া হয়— এই প্রক্রিয়াটিকে ডিমডুলেশন বলা হয়। ডিমডুলেটেড বৈদ্যুতিক সিগন্যালটিকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে বিবর্ধন করে শোনার জন্য স্পিকারে পাঠানো হয়।

রেডিও তরঙ্গ হিসেবে পাঠানোর জন্য রেডিও সম্প্রচার স্টেশনগুলো আলাদা আলাদা কম্পাঙ্ক ব্যবহার করে। গ্রাহক যন্ত্রও নির্দিষ্ট কোনো স্টেশন শুনতে হলে সেই কম্পাঙ্কের সিগন্যালে টিউন করে নেয়— তাই আলাদা আলাদা রেডিও স্টেশন সবাই নিজের অনুষ্ঠান প্রচার করতে পারে এবং শ্রোতারা নিজের পছন্দের রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠান শুনতে পারে।

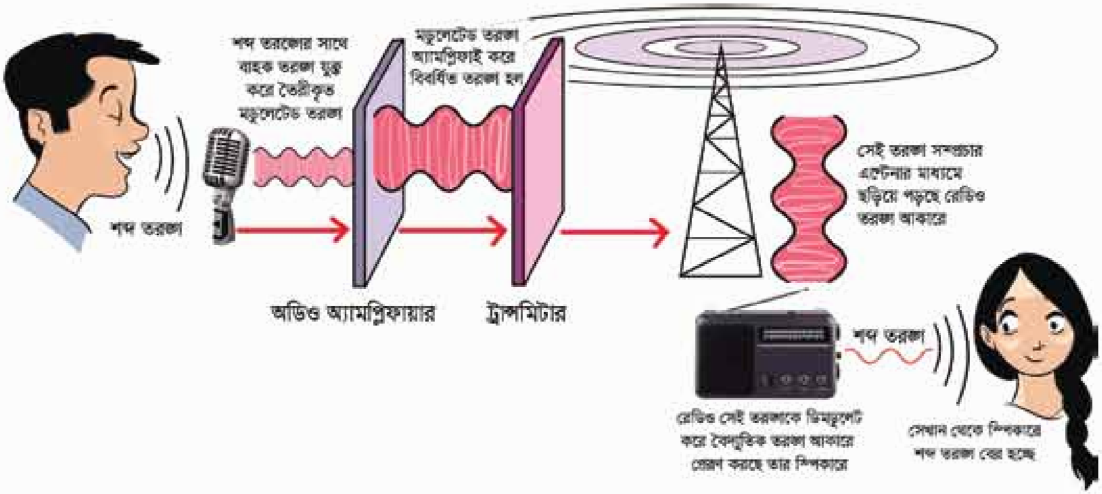

চিত্র ১৩.০৭: রেডিও সম্প্রচার ও গ্রহণ প্রক্রিয়া

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রাহক তরঙ্গের উচ্চতা বা বিস্তার বাড়িয়ে বা কমিয়ে (Amplitude Modulation) সিগন্যালটি সংযুক্ত করা হয় বলে এই পদ্ধতিটির নাম AM রেডিও। যদি বিস্তার সমান রেখে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন করে মডুলেট করা হতো (Frequency Modulation) তাহলে এই পদ্ধতিকে বলা হতো FM রেডিও।

২০২৩

চিত্র ১৩.০৮: আগের এবং বর্তমান টেলিভিশন সেট

১৩.৪.২ টেলিভিশন

তোমরা সবাই টেলিভিশন দেখেছ এবং জান যে টেলিভিশন এমন একটি যন্ত্র, যেখানে দূরবর্তী কোনো টেলিভিশন সম্প্রচার স্টেশন থেকে শব্দের সাথে সাথে ভিডিও বা চলমান ছবিও (চিত্র ১৩.০৮) দেখতে পাই। ১৯২৬ সালে জন লজি বেয়ার্ড প্রথম টেলিভিশনের মাধ্যমে ভিডিও বা চলমান ছবি পাঠিয়েছিলেন। তাঁর পদ্ধতিটি ছিল একটি যান্ত্রিক পদ্ধতি, পরে ইলেকট্রনিক্স ব্যবহার করে ছবি পাঠানোর পদ্ধতিটি আরো আধুনিক পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হতে শুরু করে।

রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রিসিভার কীভাবে কাজ করে সেটি যদি তোমরা বুঝে থাকো তাহলে টেলিভিশন কীভাবে কাজ করে সেটিও সহজেই বুঝতে পারবে। টেলিভিশনে শব্দ এবং ছবি আলাদা সিগন্যাল হিসেবে পাঠানো হয়। শব্দ পাঠানোর এবং গ্রাহক যন্ত্রে সেটি গ্রহণ করে শোনার বিষয়টি ইতোমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে আমরা ছবি পাঠানোর বিষয়টি ব্যাখ্যা করি।

চলমান ছবি বা ভিডিও পাঠাতে হলে প্রতি সেকেন্ডে ২৫টি স্থিরচিত্র পাঠাতে হয় এবং আমাদের চোখে

চিত্র ১৩.০৯: টেলিভিশন সম্প্রচার প্রক্রিয়া

তখন সেগুলোকে আলাদা আলাদা স্থিরচিত্র মনে না হয়ে একটি চলমান ছবি বলে মনে হয়।

টেলিভিশনে রঙিন ছবি পাঠানোর জন্য টেলিভিশন ক্যামেরা প্রতিটি ছবিকে লাল-সবুজ ও নীল (RGB) এই তিনটি মৌলিক রংয়ে ভাগ করে তিনটি আলাদা ছবি তুলে নেয়। টেলিভিশন ক্যামেরার ভেতরে আলো CCD (Charge Coupled Device) ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তরিত করা হয়। এই বৈদ্যুতিক সিগন্যালকে উচ্চ কম্পাঙ্কের বাহক তরঙ্গ ব্যবহার করে এন্টেনার ভেতর দিয়ে পাঠানো হয় (চিত্র ১৩.০৯)।

গ্রাহক যন্ত্র বা টেলিভিশন সেট তার এন্টেনা দিয়ে উচ্চ কম্পনের বাহক তরঙ্গকে গ্রহণ করে এবং রেকটিফায়ার দিয়ে বাহক তরঙ্গকে সরিয়ে মূল ছবির সিগন্যালকে বের করে নেয়। আগে এই সিগন্যাল থেকে তিন রংয়ের তিনটি ছবিকে ক্যাথোড রে টিউব নামের পিকচার টিউবে তার স্ক্রিনে ইলেকট্রন গান দিয়ে প্রক্ষেপণ করা হতো। এখন পিকচার টিউব প্রায় উঠে গিয়েছে এবং এলইডি (Light Emitting Diode) টেলিভিশন তার জায়গা দখল করেছে। এখানে ইলেকট্রন গান দিয়ে স্ক্রিনে ছবি তৈরি না করে লাল সবুজ ও নীল রংয়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলইডি'তে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে ছবি তৈরি করা হয়। এলইডি টেলিভিশনে ছবির ঔজ্জ্বল্য অনেক বেশি এবং গুণগত মানও অনেক ভালো।

এখানে উল্লেখ্য যে এন্টেনার সাহায্যে টেলিভিশনের সিগন্যাল পাঠানো ছাড়াও কো-এক্সিয়াল ক্যাবল দিয়েও সিগন্যাল পাঠানো হয়। এই ধরনের টিভির সম্প্রচার ক্যাবল টিভি নামে পরিচিত। এছাড়াও স্যাটালাইট টিভি নামে এক ধরণের টিভি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার করা হয়, এটি মহাকাশে পাঠানো উপগ্রহ বা স্যাটালাইট থেকে সরাসরি পৃথিবীতে পাঠানো হয়।

১৩.৪.৩ টেলিফোন ও ফ্যাক্স:

টেলিফোন (চিত্র ১৩.১০) হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত একটি যোগাযোগ মাধ্যম। আমরা এখন এই টেলিফোন ব্যবহার করে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে একজন মানুষের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।

ল্যান্ডফোন

১৮৭৫ সালে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন, নানা ধরনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সেটি বর্তমান আধুনিক টেলিফোনে রূপ নিয়েছে, কিন্তু তার মূল কাজ করার প্রক্রিয়াটি ঠিক এখনো আগের মতোই আছে।

চিত্র ১৩.১০: ল্যান্ডফোন এবং মোবাইল বা সেলুলার ফোন।

তোমরা সবাই টেলিফোন দেখেছ এবং ব্যবহার করেছ। টেলিফোন পাঁচটি উপাংশ থাকে। (ক) সুইচ: যেটি মূল টেলিফোন নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত অথবা বিচ্ছিন্ন করে (খ) রিংগার: যেটি শব্দ করে জানিয়ে দেয় যে কেউ একজন যোগযোগ করেছে (গ) কি-প্যাড: যেটি ব্যবহার করে একজন অন্য একজনকে ডায়াল করতে পারে (ঘ) মাইক্রোফোন: যেটি আমাদের কণ্ঠস্বরকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে পরিবর্তন করে (ঙ) স্পিকার: যেটি বিদ্যুতিক সিগন্যালকে শব্দে রূপান্তর করে শোনার ব্যবস্থা করে দেয়।

প্রত্যেকটি টেলিফোনই তামার তার দিয়ে আঞ্চলিক অফিসের সাথে যুক্ত থাকে। আমরা যখন কথা বলার জন্য কোনো নম্বরে ডায়াল করি, তখন আঞ্চলিক অফিসে সেই তথ্যটি পৌঁছে যায়। সেখানে একটি সুইচ বোর্ড থাকে যেটি নির্দিষ্ট গ্রাহকের টেলিফোনের সাথে যুক্ত করে দেয়। যদি আমরা অনেক দূরে কিংবা ভিন্ন কোনো দেশে একজনের সাথে কথা বলতে চাই, তাহলে সুইচবোর্ড সেভাবে আমাদেরকে নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত করে দেয়।

প্রযুক্তির উন্নতি হওয়ার আগে যখন পৃথিবীর দুই প্রান্তের দুইজন মানুষ টেলিফোনে কথা বলত, তখন কথাবার্তা পাঠানোর জন্য তাদের টেলিফোনকে তামার তার দিয়ে সংযুক্ত করে দিতে হতো, সে কারণে পুরো প্রক্রিয়াটা ছিল অনেক খরচ সাপেক্ষ। আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থায় পুরোটা অনেক সহজ হয়ে গেছে, এখন একটি অপটিক্যাল ফাইবারে একই সাথে আক্ষরিক অর্থে লক্ষ লক্ষ মানুষের কথাবার্তা পাঠানো সম্ভব তাই টেলিফোন কথাবার্তা বলার বিষয়টি অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে।

মোবাইল টেলিফোন

ল্যান্ডফোন যেহেতু তামার তার দিয়ে যুক্ত তাই এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখতে হয় এবং টেলিফোন করার জন্য কিংবা টেলিফোন ধরার জন্য সেই জায়গাটিতে আসতে হয়। মোবাইল টেলিফোন আমাদের সেই বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং এই টেলিফোনটি আমরা আমাদের সাথে রেখে যেকোনো জায়গায় যেতে পারি এবং যতক্ষণ আমরা নেটওয়ার্কের ভেতরে আছি, যেকোনো নম্বরে ফোন করতে পারি, কথা বলতে কিংবা এস.এম.এস বিনিময় করতে পারি। সে কারণে মোবাইল ফোন এখন সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এবং সবচেয়ে জনপ্রিয় যোগাযোগমাধ্যম।

তোমরা সবাই দেখেছ মোবাইল টেলিফোন কোনো তার দিয়ে যুক্ত নয়—যার অর্থ এটি ওয়ারলেস বা রেডিও তরঙ্গ দিয়ে যোগাযোগ করে থাকে। কাজেই প্রত্যেকটি মোবাইল টেলিফোন আসলে একই সাথে একটি রেডিও ট্রান্সমিটার এবং রেডিও রিসিভার।

ল্যান্ড টেলিফোনে যে যে যান্ত্রিক উপাংশ থাকা প্রয়োজন, মোবাইল টেলিফোনেও সেগুলো কোনো না কোনো রূপে থাকতে হয়, তার সাথে আরো কয়েকটি বাড়তি বিষয় হয়। সেগুলো হচ্ছে (a) ব্যাটারি: এই ব্যাটারি দিয়ে মোবাইল ফোনের জন্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা হয় (b) স্ক্রিন: এই স্ক্রিনটিতে মোবাইল ফোনের যোগাযোগের তথ্য দেখানো হয় (c) সিম কার্ড: (SIM: Subscriber Identity Module) যেখানে ব্যবহারকারীর তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা হয় (d) রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার:

এগুলো দিয়ে মোবাইল ফোন তার নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগ করে (e) ইলেকট্রনিক সার্কিট: এটি মোবাইল টেলিফোনের জটিল কার্যক্রমকে ঠিকভাবে সম্পাদন করতে সাহায্য করে।

মোবাইল টেলিফোনে যোগাযোগ করার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য পুরো এলাকাকে অনেকগুলো সেলে (Cell) ভাগ করে নেয় (চিত্র ১৩.১১) এজন্য মোবাইল টেলিফোনকে অনেক সময় সেলফোনও বলা হয়। এই সেলগুলো প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে ১ কিলোমিটার থেকে ২০ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। প্রত্যেকটা সেলে একটি করে বেস স্টেশন (BTS: Base Transceiver Station) থাকে। একটি এলাকার অনেকগুলো বেস স্টেশন একটা বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC: Base Station

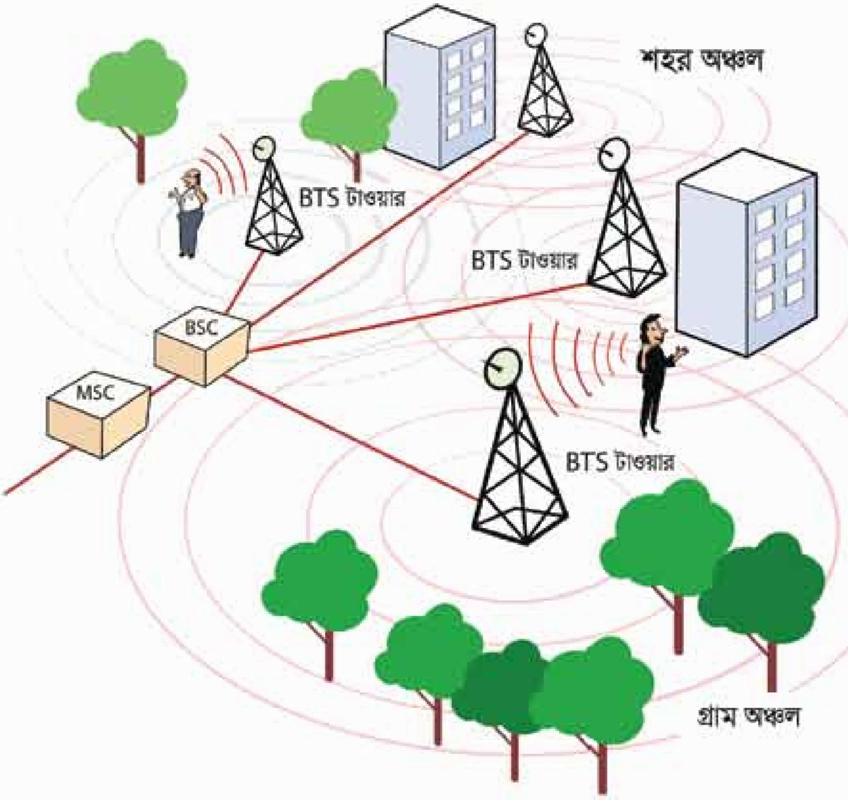

চিত্র ১৩.১১: মোবাইল টেলিফোনের নেটওয়ার্ক

Controller) মাধ্যমের মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রের (MSC: Mobile Serviece Switching) সাথে যোগাযোগ করে। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রটি মোবাইল নেটওয়ার্কের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এখানে প্রেরক আর গ্রাহকের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হয়।

কেউ (প্রেরক) যখন তার মোবাইল ফোনে অন্য কোনো নাম্বারে (গ্রাহকের) ডায়াল করে, তখন প্রেরকের মোবাইল ফোনটি সে যে সেলে আছে তার বেস স্টেশনের (BTS) সাথে যুক্ত হয়। সেই বেস স্টেশন থেকে

তার কলটি বেস স্টেশন কন্ট্রোলারের (BSC) ভেতর দিয়ে মোবাইল সুইচিং কেন্দ্রে (MSC) পৌঁছায়। মোবাইল সুইচিং কেন্দ্র তার কাছে রাখা তথ্যভান্ডার থেকে গ্রাহক সেই মুহূর্তে কোন সেলের ভেতর আছে সেটি খুঁজে বের করে। তারপর প্রেরকের কলটি গ্রাহকের সেই সেলের বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করে দেয় এবং সেই বেস স্টেশন থেকে গ্রাহকের মোবাইল ফোনে রিং দেওয়া হয়।

মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ককে সচল রাখার জন্য অনেক ধরনের প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন করা হয়েছে। আমাদের মোবাইল টেলিফোন থেকে খুবই কম শক্তির সিগন্যাল ব্যবহার করে কাছাকাছি বেস স্টেশনের সাথে যুক্ত করা হয় এবং আমরা যদি একটি সেল থেকে অন্য সেলে চলে যাই, এই নেটওয়ার্ক সেটি জানতে পারে এবং এক বেস স্টেশন থেকে অন্য বেস স্টেশনে যোগাযোগটি স্থানান্তর করে দেয়। একটি ঘনবসতিপূর্ণ শহরে যদি অনেক মোবাইল ফোন ব্যবহারকারী থাকে, তাহলে ছোট ছোট অনেকগুলো সেল দিয়ে তাদের ফোন করার সুযোগ দেওয়া হয়। আবার গ্রামের কম জনবসতি এলাকায় একটি অনেক বড় সেল দিয়ে পুরো এলাকাতে নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত রাখা হয়।

এখানে উল্লেখ্য যে শুরুতে শুধু কথা বলার জন্য টেলিফোন উদ্ভাবন করা হয়েছিল। মোবাইল টেলিফোনে কথার সাথে সাথে এস.এম.এস. পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন স্মার্টফোন নামে নতুন যে ফোনগুলো এসেছে, সেগুলো কণ্ঠস্বরের (Voice) সাথে সাথে সব ধরনের তথ্য (Data) পাঠাতে পারে। কাজেই সেগুলো সরাসরি ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত হতে পারে এবং আগে যে কাজগুলো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ ছাড়া করা সম্ভব ছিল না, সেগুলো এই স্মার্ট ফোন দিয়ে করা সম্ভব হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই স্মার্টফোনগুলোর জন্য নানা ধরনের অ্যাপ (Application) তৈরি হচ্ছে, সেগুলো দিয়ে স্মার্টফোন আমাদের আরো নানা ধরনের কাজ করতে সাহায্য করে।

স্মার্টফোন একদিকে আমাদের জীবনযাত্রার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, একই সাথে খুব সহজে স্মার্টফোনে ইন্টারনেটে যুক্ত হওয়ার সুযোগের কারণে নতুন প্রজন্ম সামাজিক নেটওয়ার্ক-জাতীয় বিষয়গুলোতে অনেক অপ্রয়োজনীয় সময় ব্যয় করছে, সেটি এই মুহূর্তে শুধু আমাদের দেশের নয় সারা পৃথিবীর একটি বড় সমস্যা।

ফ্যাক্স

ফ্যাক্স শব্দটি হচ্ছে ফ্যাক্সিমিল (Facsimile)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। ফ্যাক্স করা বলতে আমরা বোঝাই কোনো ডকুমেন্টকে কপি করে টেলিফোন লাইন ব্যবহার করে তাৎক্ষণিকভাবে সরাসরি পাঠিয়ে দেওয়া। বর্তমান যুগে কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট এই ফ্যাক্স প্রযুক্তিকে অনেক পিছনে ফেলে এসেছে, তারপরও প্রায় সব প্রতিষ্ঠানই এখনো এই প্রাচীন কিন্তু নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। শুনে অবাক লাগতে পারে, ফ্যাক্স পাঠানো হয় টেলিফোন লাইন দিয়ে কিন্তু প্রথম ফ্যাক্সের ধারণাটি পেটেন্ট করা হয় টেলিফোন আবিষ্কারেরও ত্রিশ বছর আগে।

ফ্যাক্স মেশিন।

চিত্র ১৩.১২: ফ্যাক্স মেশিন এবং তার কর্মপদ্ধতি

ফ্যাক্স মেশিন একই সাথে একটা ডকুমেন্টের কপি পাঠাতে পারে এবং এই মেশিনে পাঠানো একটি কপিকে প্রিন্ট করে দিতে পারে। ফ্যাক্স মেশিনে যখন একটি ডকুমেন্ট দেওয়া হয়, তখন সেখানে উজ্জ্বল আলো ফেলা হয়, ডকুমেন্টের কালো অংশ থেকে কম এবং সাদা অংশ থেকে বেশি আলো প্রতিফলিত হয়, সেই তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে ডকুমেন্টটির কপিকে বৈদ্যুতিক সিগন্যালে রূপান্তর করে টেলিফোন লাইন দিয়ে পাঠানো হয়।

টেলিফোন লাইনের অন্য প্রান্তে ফ্যাক্স মেশিনটি তার কাছে পাঠানো ডকুমেন্টের কপিটিকে একটি প্রিন্টারে প্রিন্ট করে দেয় (চিত্র ১৩.১২)। ফ্যাক্স মেশিন এখনো একটি নির্ভরযোগ্য প্রযুক্তি, এটি একটি ডকুমেন্টের কপিটিকে শুধু সাদা এবং কালো হিসেবে পাঠানো হয় বলে লিখিত ডকুমেন্টের জন্য ঠিক থাকলেও রঙিন কিংবা ফটোগ্রাফের জন্য উপযুক্ত নয়। এছাড়া বেশিরভাগ ফ্যাক্স মেশিনে থার্মাল পেপার ব্যবহার করা হয় বলে ডকুমেন্টটি খুব তাড়াতাড়ি অস্পষ্ট হয়ে যেতে পারে।

১৩.৪.৪ রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্ট সমস্যা

রেডিও এবং টেলিভিশন থেকে যে সমস্যা দেখা দিতে পারে, সেগুলো প্রধানত শব্দদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা। অনেকেই খুব হাই-ভলিয়ুমে রেডিও টেলিভিশন ব্যবহার করে। এতে নিজের কানের যেমন সমস্যা হতে পারে, তেমনি আশপাশে যারা থাকে, তাদেরও সমস্যা হতে পারে। যারা কানে হেডফোন লাগিয়ে সারাক্ষণ খুব বেশি শব্দে রেডিও বা মিউজিক শোনে, তারা মাথাব্যথা, কানে কম শোনা— এরকম স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়তে পারে।

এছাড়া যারা দিনে তিন-চার ঘণ্টা থেকে বেশি টিভি দেখে, তাদের মাথাব্যথা, নিদ্রাহীনতা, চোখে ব্যথা বা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়ার মতো সমস্যায় পড়তে পারে। এ প্রতিক্রিয়াগুলো শিশুদের জন্য অনেক বেশি

হয়ে থাকে। তাদের বিকাশমান কোষের যথোপযুক্ত বিকাশে টেলিভিশন থেকে নিঃসৃত বিকিরণ যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।

যেকোনো স্বাস্থ্য সমস্যা প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ করা সহজ। তাই শব্দদূষণ বা অন্যান্য সমস্যা থেকে রক্ষা পেতে উচ্চ শব্দে রেডিও বা টিভি না চালানো, একনাগাড়ে অধিক সময় রেডিও এবং টিভি না শোনা বা না দেখা ভালো। শুধু তাই নয়, টেলিভিশন থেকে নিঃসৃত বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে টেলিভিশন থেকে নিরাপদ দূরত্বে বসে টিভি দেখতে হবে।

পৃথিবীতে অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এর পিছনে শিশুদের অল্প বয়সে টেলিভিশন দেখার একটি যোগসূত্র থাকতে পারে। সেজন্য অটিস্টিক শিশুদের পরিবারে ডাক্তারেরা টেলিভিশন না দেখার পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

এরপর আসা যাক, মোবাইল ফোন থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা সম্পর্কে। মোবাইল ফোন হলো একটি নিম্ন ক্ষমতার রেডিও ডিভাইস, যা একটি ছোট এন্টেনার সাহায্যে একই সাথে রেডিও কম্পাঙ্কে বিকিরণ, প্রেরণ এবং গ্রহণ করে। মোবাইল ফোন ব্যবহারের সময় এ এন্টেনাটি ব্যবহারকারীর মাথার খুব কাছে থাকে। এ নিয়ে পৃথিবীর মানুষ এখন উদ্বিগ্ন যে এই মাইক্রো তরঙ্গের ক্রমাগত ব্যবহার হয়তো মাথায় ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করতে পারে। এসব সমস্যার সৃষ্টি সম্পর্কে খুব বেশি প্রমাণ নেই। তবু অত্যধিক বিকিরণ থেকে রক্ষা পেতে সবাইকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে বিকিরণের প্রভাব খুব বেশি না পড়লেও শিশুদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এ বিকিরণ শিশুদের মস্তিষ্কের কোষ বিকাশে সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার জন্য সবাইকে সাবধান করা হয়েছে। গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কা অনেক বেড়ে যায়।

আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে অনেক সহজ করে তুলেছে। কিন্তু আমরা যদি এই প্রযুক্তি সুবিবেচকের মতো ব্যবহার না করে অবিবেচকের মতো অনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবহার করি, তাহলে খুব সহজেই আমাদের জীবনে আরো বড় নতুন নতুন জটিলতা হাজির হতে পারে।

চিত্র ১৩.১৩: একটি কম্পিউটারের মূল অংশগুলো

১৩.৫ কম্পিউটার ও নেটওয়ার্কিং

১৩.৫.১ কম্পিউটার

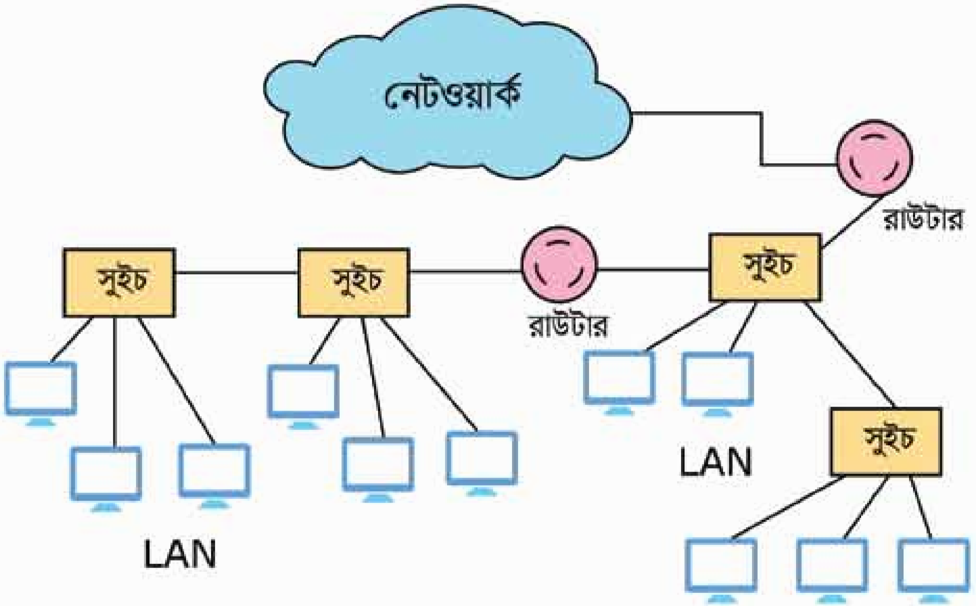

চিত্র ১৩.১৪: নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত একাধিক LAN

তোমরা সবাই কম্পিউটার ব্যবহার করেছ। যারা একটু ইতস্তত করছ, তাদেরকে বলা যেতে পারে কম্পিউটার বলতেই যাদের চোখের সামনে একটা মনিটর, একটা সিপিইউ বা কি-বোর্ড কিংবা ল্যাপটপের ছবি ভেসে ওঠে—শুধু সেগুলোই কম্পিউটার নয়। আমরা যে মোবাইল টেলিফোন ব্যবহার করি, তার মাঝেও ছোট ছোট এবং পূর্ণাঙ্গ কম্পিউটার রয়েছে।

আধুনিক জগতে কম্পিউটারের গুরুত্বটি বিশাল। তার কারণ এটি অন্য দশটি যন্ত্রের মতো নয়। অন্য যেকোনো যন্ত্র বা টুল (Tool) সব সময়েই একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে পারে। একটা স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে বাঁশি বাজানো সম্ভব নয় আবার বাঁশি দিয়ে স্ক্রু খোলা যায় না। কিন্তু কম্পিউটার এমন একটা যন্ত্র, যেটা দিয়ে সম্ভাব্য সকল কাজ করা যায় এবং কী কী করা যাবে তার সীমারেখা মাত্র একটি এবং সেটি হচ্ছে মানুষের সৃজনশীলতা। একজন মানুষ যত সৃজনশীল সে কম্পিউটারের তত বেশি ব্যবহার বের করতে পারবে। তাই কম্পিউটার দিয়ে আমরা যে রকম হিসাব (compute) করতে পারি, ঠিক সে রকম গান শুনতে পারি, ছবি আঁকতে পারি, তথ্য আদান-প্রদান করতে পারি, যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারি, এমনকি যারা ঘাগু অপরাধী, তারা এটা ব্যবহার করে মানুষকে প্রতারণা পর্যন্ত করে ফেলে।

কম্পিউটারের গঠন: যারা কম্পিউটারের ভেতর উঁকি দিয়েছ, নিঃসন্দেহে তাদের মনে হতে পারে এটি খুবই জটিল একটি যন্ত্র, কিন্তু তোমরা জেনে খুশি হবে, এর কাজ করার মূল বিষয়টি খুবই সহজ। একটা কম্পিউটারের মূল অংশ দুটি: একটি হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসর, অন্যটি হচ্ছে মেমোরি। (চিত্র ১৩.১৩) মেমোরির ভেতর নানা ধরনের নির্দেশ বা ইনস্ট্রাকশন জমা করা থাকে, সেগুলো কিছু ডিজিটাল সিগন্যাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মেমোরি থেকে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হয়, মাইক্রোপ্রসেসর কোন ইনস্ট্রাকশনের জন্য কী করতে হবে, সেটি জানে এবং তার জন্য বরাদ্দকৃত কাজটি শেষ করে এবং যখন প্রয়োজন হয়, তখন ফলাফলটি আবার মেমোরিতে জমা করে দেয়। এভাবে মেমোরিতে রাখা সবগুলো ইনস্ট্রাকশন শেষ করা হলে আমরা বলে থাকি এটা তার প্রোগ্রাম পুরোটা শেষ করেছে। কম্পিউটারের তথ্য সংরক্ষণ করার জন্য শুধু মেমোরির ওপর নির্ভর করা হয় না, পাকাপাকিভাবে সেখানে তথ্য রাখার ব্যবস্থা করা হয়, সেটাকে আমরা হার্ড ড্রাইভ বলে থাকি।

কম্পিউটারে একটা প্রোগ্রাম চালাতে হলে তার সাথে বাইরে থেকে যোগাযোগ করতে হয়। যেসব যন্ত্রপাতি (কি-বোর্ড কিংবা মাউস) দিয়ে কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করা হয়, তাদেরকে বলা হয় ইনপুট ডিভাইস। কম্পিউটার আবার তার তথ্য ব্যবহারকারীর কাছে দিতে পারে, যেসব যন্ত্রপাতি দিয়ে কম্পিউটার বাইরের জগতের সাথে যোগাযোগ করে (মনিটর, প্রিন্টার), তাকে বলা হয় আউটপুট ডিভাইস।

তবে আজকাল কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে নেটওয়ার্কিং। প্রত্যেকটা কম্পিউটারেই নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC: Network Interfacing Card), থাকে যেটি দিয়ে সেটি একটি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত থাকে এবং কম্পিউটার সেটি দিয়ে তথ্য গ্রহণ করে আবার তথ্যকে প্রেরণ করে।

১৩.৫.২ ইন্টারনেট ও ই-মেইল

ইন্টারনেট

তোমরা এর মাঝে অনেকবার কম্পিউটার কী এবং সেটা কীভাবে কাজ করে, সেটা পড়ে এসেছ। একটা প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটারগুলোকে সাধারণত একটা নেটওয়ার্ক দিয়ে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয় যেন একটা কম্পিউটার অন্য একটা কম্পিউটারের সাথে যোগাযোগ করতে পারে, আবার প্রয়োজন হলে একটা কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের Resource ব্যবহার করতে পারে। এই ধরনের নেটওয়ার্ককে LAN (Local Area Network) বলা হয়ে থাকে। আজকাল LAN তৈরি করার জন্য একটা সুইচের সাথে অনেকগুলো কম্পিউটার যুক্ত করে সুইচগুলোকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে দিতে হয়। যখন একটা কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের যোগাযোগ করতে হয়, সেটি যদি তার নিজের সুইচের সাথে যুক্ত কম্পিউটারের মাঝে পেয়ে যায় তাহলে তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে। সেখানে না পেলে অন্য সুইচে খোঁজ করতে থাকে।

একটি প্রতিষ্ঠানের একটি LAN-কে অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের অন্য একটি LAN-এর সাথে যুক্ত করার জন্য রাউটার (Router) ব্যবহার করা হয়। (চিত্র ১৩.14) বিভিন্ন নেটওয়ার্ক (Network)-এর নিজেদের মাঝে Inter Connection করে Networking-কে Internet বলা হয়। এই মুহূর্তে পৃথিবীর প্রায় নয় বিলিয়ন কম্পিউটার বা অন্য কোনো ডিভাইস ইন্টারনেটের সাথে যুক্ত আছে এবং সংখ্যাটি প্রতিদিনই বাড়ছে।

কাজেই ইন্টারনেট হচ্ছে নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক, যেখানে প্রাইভেট, পাবলিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি-বেসরকারি স্থানীয় বা বৈশ্বিক সব ধরনের নেটওয়ার্কগুলো জড়িত হয়েছে। এই বিশাল নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য নানা ধরনের ইলেকট্রনিক, ওয়ারলেস এবং ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ইন্টারনেট ব্যবহার করে এখন নানা ধরনের তথ্য আদান-প্রদান করা যায় এবং নানা ধরণের সেবা দেয়া যায়। উদাহরণ দেওয়ার জন্যে বলা যেতে পারে, ইন্টারনেটে রয়েছে নানা ধরনের ওয়েব সাইট, ইলেকট্রনিক মেইল, টেলিফোন এবং ভিডিও যোগাযোগ, তথ্য আদান-প্রদান, সামাজিক নেটওয়ার্ক, বিনোদন, শিক্ষা এবং গবেষণা টুল এবং নানা ধরনের ইন্টারনেটভিত্তিক সেবা। সারা পৃথিবীর মানুষ এখন ইন্টারনেটের উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে এবং আমাদের জীবনধারার একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এখানে উল্লেখ করা যায়, ইন্টারনেটে পৃথিবীর সকল মানুষেরই যোগাযোগ করার সমান সুযোগ আছে বলে নানা ধরনের প্রচার এবং অপপ্রচারে ব্যবহার এবং অপব্যবহার সুযোগ তৈরি হয়েছে। নানা ধরনের ক্ষতিকর সফটওয়্যার তৈরি করে নেটওয়ার্কের ক্ষতি করা, বিদ্বেষ এবং হিংসা ছড়ানো আপত্তিকর তথ্য উপস্থাপন ছাড়াও অপরাধীরাও তাদের কার্যক্রমে গোপনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে।

কিছু নেতিবাচক বিষয় থাকার পরও ইন্টারনেট এই সভ্যতার সবচেয়ে বড় অবদান এবং এই প্রথমবার পৃথিবীর সকল মানুষ সমানভাবে একটি প্রযুক্তিতে অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে এই নেটওয়ার্কের কী প্রভাব পড়বে, তা দেখার জন্য সারা পৃথিবীর মানুষ আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছে।

ই-মেইল

ইলেকট্রনিক মেইলের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ই-মেইল এবং ই-মেইল বলতে আমরা বোঝাই কম্পিউটার, ট্যাবলেট, স্মার্টফোন ইত্যাদি ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে নেটওর্য়াক ব্যবহার করে একজন বা অনেকজনের সাথে ডিজিটাল তথ্য বিনিময় করা। ১৯৭১ সালে প্রথম ই-মেইল পাঠানো হয় এবং মাত্র ২৫ বছরের ভেতরে পোস্ট অফিস ব্যবহার করে পাঠানো চিঠি থেকে ই-মেইলের সংখ্যা বেশি হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে ই-মেইলের ব্যবহার ছাড়া আমরা একটি দিনও কল্পনা করতে পারি না।

ই-মেইল পাঠানোর জন্য প্রথমেই যিনি পাঠাবেন এবং যিনি পাবেন দুজনেরই ই-মেইলের ঠিকানার দরকার হয়। তোমরা সবই ই-মেইল ঠিকানার সাথে পরিচিত এবং সবাই লক্ষ্য করেছ ই-মেইল ঠিকানাটি @ বর্ণটি দিয়ে ভাগ করা হয়েছে। যদি abc@def.com একটি ই-মেইল ঠিকানা হয়ে থাকে তাহলে @

এর পরের অংশটুকু হচ্ছে ডোমেইন নেইম, যেটা দিয়ে বোঝানো হয় ব্যবহারকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত। প্রথম অংশটুকু হচ্ছে ব্যবহারকারীর কোনো ধরনের পরিচয়।

কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা অন্য কোনো ডিজিটাল ডিভাইস দিয়ে ই-মেইল পাঠাতে হলে সবসময়েই একটি ই-মেইল সার্ভারের দরকার হয়। এই ই-মেইল সার্ভার ব্যবহারকারীদের ই-মেইল সংরক্ষণ করে এবং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অন্য ব্যবহারকারীদের সাথে ই-মেইল বিনিময় করে। ই-মেইল বিনিময় করার আরেকটি এবং বর্তমানে অনেক জনপ্রিয় উপায় হচ্ছে ইন্টারনেটের দেওয়া ই-মেইল সার্ভিস। তাদের মাঝে রয়েছে Gmail, Yahoo, Hotmail ইত্যাদি ই-মেইলের সেবা শুধু যে বিনামূল্যে দেওয়া হয় তা নয়, ব্যবহারকারীর ই-মেইল সংরক্ষণ করার দায়িত্বও গ্রহণ করে থাকে।

ই-মেইল পাঠানোর জন্য সবসময় প্রেরণকারী এবং গ্রাহকের ই-মেইল ঠিকানা লিখতে হয়। একটি ই-মেইল একাধিক গ্রাহকের কাছে পাঠানো যায়। প্রয়োজনে ই-মেইলকে অন্য একজনকে "কার্বন কপি" হিসেবে (CC) পাঠানো যায়। ই-মেইলের শুরুতে বিষয় হিসেবে ই-মেইলের বক্তব্যটির একটি শিরোনাম লেখা যায়। শুধু তা-ই নয় ই-মেইলের বিষয়বস্তু লেখার পাশাপাশি তার সাথে অন্য কোনো ডকুমেন্ট, ছবি সংযুক্ত করে পাঠিয়ে দেওয়া যায়। আমরা ই-মেইল ছাড়া এখন একটি মুহূর্তও কল্পনা করতে পারি না।

ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা ইন্টারনেটভিত্তিক নানা ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্ক আমাদের জন্য একটি নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। একই সাথে এই প্রযুক্তিগুলোর অপব্যবহার আমাদের জীবনে খুব সহজেই বড় ধরনের বিপর্যয় নিয়ে আসতে পারে। কাজেই এটা বলা বাহুল্য, অত্যন্ত শক্তিশালী এই প্রযুক্তিগুলো আমাদের দায়িত্বশীলের মতো ব্যবহার করতে হবে। উল্লেখ্য, এই বিষয়টি শুধু তথ্যপ্রযুক্তি নয়, সকল প্রযুক্তির জন্য সত্যি।

একক কাজ

কাজ: ই-মেইল, ইন্টারনেট কিংবা সামাজিক নেটওয়ার্কে দায়িত্বহীন হিসেবে কী কী ব্যবহার করা সম্ভব তার তালিকা তৈরি করো।

১৩.৫.৩ কম্পিউটার প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য সমস্যা

স্বাস্থ্য সমস্যা

তথ্য ও প্রযুক্তির অনিয়ন্ত্রিত ব্যাপক ব্যবহারের ফলে বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যারা রোজই মাত্রাতিরিক্ত সময় ধরে কম্পিউটারের কোনো গেইম খেলে, তারা হাতের আঙুলের মাথায় সুঁই ফুটানোর

মতো ব্যথা অনুভব করা এমনকি আঙ্গুলের মাথায় ফোস্কা পড়া, আঙ্গুল ফুলে যাওয়ার মতো স্বাস্থ্য সমস্যায় পড়ে যাওয়ার উদাহরণও আছে।

যারা অধিকক্ষণ ধরে কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, কম্পিউটারের কি-বোর্ড ও মাউসের দীর্ঘক্ষণ ও দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে তাদের হাতের রগ, স্নায়ু, কব্জি, বাহুতে, কাঁধ ও ঘাড়ে অতিরিক্ত টান (stress) বা চাপ পড়ে। কাজেই কাজের ফাঁকে যথেষ্ট বিশ্রাম না নিলে এসব অঙ্গ ব্যথাসহ নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম না নিয়ে দীর্ঘদিন ও দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারের কাজ করলে চোখে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়, একে বলা হয় কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এই সিনড্রেমের মধ্যে রয়েছে চোখ জ্বালাপোড়া করা, চোখ শুষ্ক হয়ে যাওয়া, চোখ চুলকানো, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং চোখের পানি শুকিয়ে যাওয়া।

প্রতিকারের উপায়: কম্পিউটার ব্যবহার থেকে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যার চিকিৎসার চাইতে এই সমস্যা সৃষ্টি হতে না দেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আমাদের সতর্ক হতে হবে যেন এসব স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি না হয়। হাত, হাতের কব্জি, আঙ্গুল, কাঁধ ও ঘাড়ের সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার জন্য যা করতে হবে তা হলো :

১. কম্পিউটারের কাজ করার সময় সঠিকভবে বসতে হবে এবং সোজা সামনে তাকাতে হবে।

২. সঠিক পদ্ধতিতে টাইপ করতে হবে। টাইপ করার সময় হাতে যেন কোনো কিছুর ওপর রাখা না থাকে এবং হাত ও আঙ্গুল যেন সোজা থাকে।

৩. কাজের ফাঁকে ফাঁকে অন্তত আধা ঘণ্টা পর পর ৫ মিনিটের জন্য হলেও বিশ্রাম নিতে হবে এবং কাঁধ ও ঘাড়কে রিল্যাক্স করতে দিতে হবে।

কম্পিডার ভিশন সিনড্রোমের কারণে সৃষ্ট চোখের সমস্যা প্রতিরোধ যেসব সতর্কতা অবলম্বন করবে তা হলো:

১. তোমার কম্পিউটারের পর্দাটি যেন অবশ্যই তোমার চোখ থেকে ৫০-৬০ সেন্টিমিটার দূরে থাকে।

২. কোনো ডকুমেন্ট হোল্ডার ব্যবহার করলে তা অবশ্যই পর্দার কাছাকাছি রাখবে।

৩. মাথার ওপরকার বাতির আলো এবং টেবিলের বাতির আলো এমনভাবে কমিয়ে দিতে হবে তা যেন তোমার চোখে বা কম্পিউটারে পর্দায় না পড়ে।

৪. প্রতি ১০ মিনিট পর পর কিছুক্ষণের জন্য দূরের কোনো কিছুর দিকে তাকাবে, এতে চোখ আরামবোধ করবে।

এই সহজ কিছু নিয়ম মেনে চললেই কম্পিউটার ব্যবহারের কারনে শারীরিক সমস্যাগুলোকে এড়িয়ে চলা সম্ভব হবে।

মানসিক সমস্যা

কম্পিউটার ব্যবহারে যেসব শারীরিক সমস্যা হতে পারে, তার চাইতে অনেক গুরুতর সমস্যা হচ্ছে মানসিক সমস্যা। ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার কারণে আজকাল প্রায় সবাই এটি ব্যবহার করতে পারে। ইন্টারনেটে একদিকে যেমন তথ্য ও জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে রাখা আছে, ঠিক সেরকম সামাজিক নেটওয়ার্ক জাতীয় সার্ভিসের মাধ্যমে অসচেতন ব্যবহারকারীদের মোহগ্রস্ত করে রাখার ব্যবস্থাও করে রাখা আছে। মনোবিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখাতে শুরু করেছেন যে মানুষ যেভাবে মাদকে আসক্ত হয়ে যায়, সেভাবে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার, ইন্টারনেট বা সামাজিক নেটওয়ার্কে আসক্ত হয়ে যেতে পারে। অতিরিক্ত কম্পিউটার গেম খেলে মৃত্যুবরণ করেছে এরকম উদাহরণও আছে। কাজেই সবসময়েই মনে রাখতে হবে, আধুনিক প্রযুক্তি মাত্রই ভালো নয়, পৃথিবীতে যেমন অনেক অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকর প্রযুক্তি আছে, ঠিক সেরকম ভালো প্রযুক্তির অপব্যবহারের কারণে সেটি আমাদের জীবনে অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে পারে।

অনুসন্ধান (২ পিরিয়ড)

মনে করো, তোমার কাজটির শিরোনাম:

"যেসব ছেলেমেয়ে অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহার করে, তাদের স্বাস্থ্য সমস্যা: একটি অনুসন্ধান"।

তোমার গবেষণার উদ্দেশ্য হতে পারে:

১. অতিরিক্ত কম্পিউটার ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণ।
২. পেশাদার ও অপেশাদার কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্য সমস্যার মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কি না তা জানা।
৩. এসব স্বাস্থ্য সমস্যা সৃষ্টির কারণ জানা।
৪. ব্যবহারকারীদের বয়স ও স্বাস্থ্য সমস্যার সাথে কোনো সম্পর্ক আছে কি না তা জানা।
৫. কী করে এসব স্বাস্থ্য সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা যায় তা জানা।

এরপর তোমাকে এলাকা চিহ্নিত করতে হবে এবং তারপর কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করতে হবে। কোনো কোনো সময় একই এলাকায় বেশি কম্পিউটার ব্যবহারকারী না-ও পেতে পার। তখন তোমাকে বিভিন্ন এলাকা থেকে কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের খুঁজে বের করতে হবে এবং খুব বেশি ব্যবহারকারী থাকলে তাদের থেকে নমুনা নিতে হবে। এজন্য বন্ধুরা কাজ ভাগাভাগি করে নিতে পার।

এরপর তোমাকে তোমার অনুসন্ধানের একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। এ প্রতিবেদনে থাকবে:

১. শিরোনাম
২. একটি ভূমিকা
৩. অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য
৪. অনুসন্ধানের নমুনা (অঞ্চল বা ব্যক্তি)
৫. অনুসন্ধানের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি
৬. অনুসন্ধানের তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি
৭. অনুসন্ধানের ফলাফল ও মন্তব্য এবং সুপারিশ

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সকল নেটওয়ার্কের জননী কোনটি?

ক. ই-মেইল	খ. ইন্টারনেট
গ. মোবাইল	ঘ. টেলিফোন

২. কম্পিউটারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:

i. কম্পিউটার ভুল করে না, ভুল শনাক্ত করতে পারে
ii. কম্পিউটার নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে
iii. কম্পিউটার অক্লান্ত ও নির্ভুলভাবে কাজ করতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii	খ. i ও iii
গ. ii ও iii	ঘ. i, ii ও iii

২০২১

নিচের চিত্রগুলো থেকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

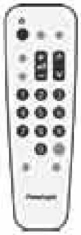
P

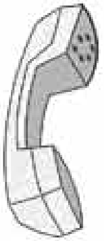
Q

R

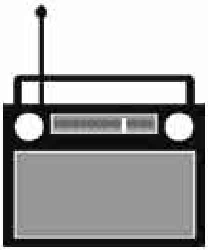
S

৩. আবহাওয়ার সংবাদ শুনতে কোনটি কার্যকর?

ক. P খ. Q

গ. R ঘ. S

৪. 'P' যন্ত্রটির অধিক ব্যবহারে:

i. মাথাব্যথা ও বমি বমি ভাব হতে পারে

ii. খিচুনি ও উচ্চ রক্তচাপ হতে পারে

iii. ভালো ঘুম হতে পারে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফারহান ও কাবাদ সময় পেলেই কম্পিউটার গেম খেলে এবং টিভি দেখে। ফারহান খুব কাছে বসে টিভি দেখে। ইদানীং ফারহানের আঙুলে ব্যথা ও চোখ জ্বালা পোড়া করে। মা ফারহানকে কম্পিউটার চালাতে ও কাছাকাছি বসে টিভি দেখতে নিষেধ করলেন।

ক. রঙিন টেলিভিশনের মৌলিক রং কয়টি?

খ. ডিজিটাল সংকেত বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের প্রথম যন্ত্রটির যান্ত্রিক কৌশল বর্ণনা করো।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ফারহানের সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ করো।

২০২৩

২. নজরুল ইসলাম সবসময় ইন্টারনেটে কাজ করেন। একদিন ইন্টারনেটে বিদেশে একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তি দেখে তিনি আবেদন করলে অপর প্রান্ত থেকে দরকারি কাগজপত্র, মূল সার্টিফিকেটের কপি পাঠাতে বলা হয়। তিনি কাগজপত্র স্ক্যান না করে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কয়েক মিনিটের মধ্যে সেগুলো পাঠিয়ে দেন।

ক. হার্ডওয়্যার কী?

খ. অডিও সংকেত বলতে কী বুঝায়?

গ. নজরুল ইসলামের যোগাযোগের প্রথম মাধ্যমটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা করো।

ঘ. নজরুল ইসলাম প্রয়োজনীয় কাগজপত্রগুলো ইন্টারনেটের পরিবর্তে বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেন পাঠালেন? বিশ্লেষণ করো।

চতুর্দশ অধ্যায়

জীবন বাঁচাতে বিজ্ঞান

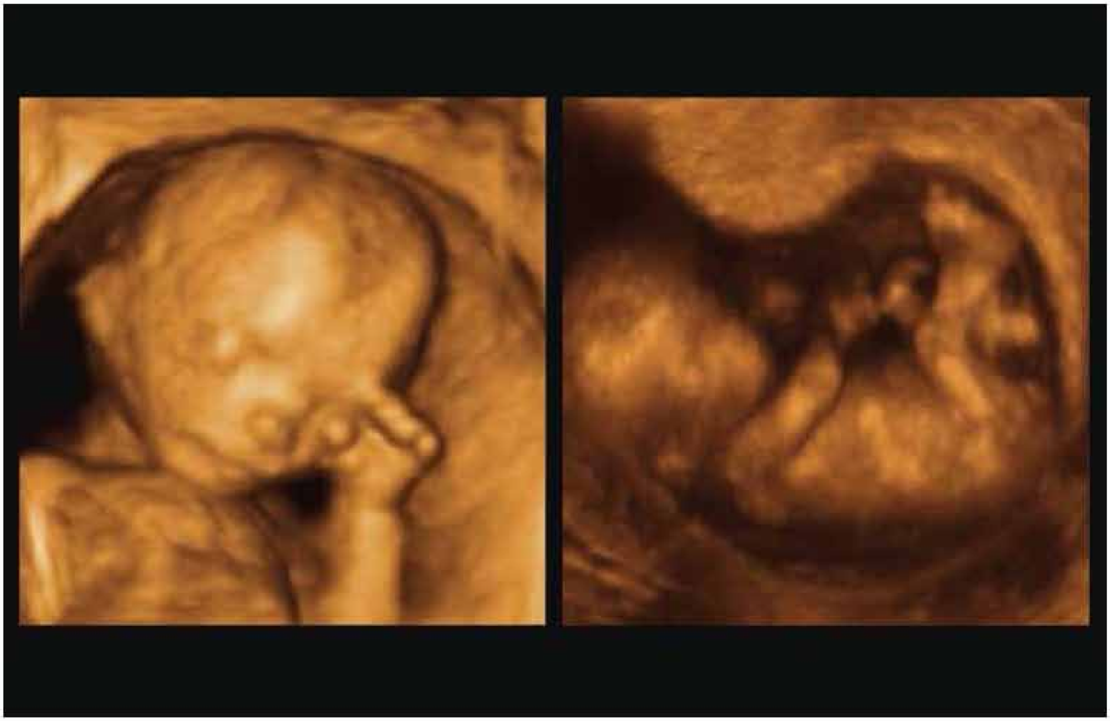

বেঁচে থাকার জন্য আমাদের দরকার সুস্থ, সবল এবং নীরোগ দেহ। স্বাভাবিকভাবেই আমরা সবসময় সুস্থ থাকতে পারি না। কখনো কখনো কোনো একটি রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ি। রোগ হলে দরকার ভালো চিকিৎসা আর ভালো চিকিৎসার জন্য সবার আগে দরকার সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়। বর্তমান সময়ে চিকিৎসা ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বের প্রয়োগে তৈরি হয়েছে রোগ নির্ণয়ের নতুন নতুন যন্ত্রপাতি। যার কারনে মানুষের বিভিন্ন ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা শনাক্তকরণে এবং সেগুলো নিরাময় আর প্রতিরোধে বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করাও অনেক সহজ হয়ে পড়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা বিজ্ঞান, বিশেষ করে পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করে রোগ নির্ণয় আর চিকিৎসার নানা পদ্ধতির কথা আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- চিকিৎসাবিজ্ঞানের রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও ধারণার ব্যবহার বর্ণনা করতে পারব।
- আধুনিক প্রযুক্তি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা এবং প্রতিরোধের কৌশল বর্ণনা করতে পারব।
- রোগ নির্ণয়ে বিজ্ঞানের অবদানকে প্রশংসা করতে পারব।

১৪.১ রোগ নির্ণয়ে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি

১৯৫০ সালে পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু ছিল ৫০ বছরের কাছাকাছি, ষাট বছরে সেই আয়ু ২০ বছর থেকে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। পৃথিবীর মানুষের জীবনধারণের মান উন্নত হওয়া, রোগ প্রতিষেধক ব্যবহার, স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া এবং চিকিৎসার মান উন্নয়নের জন্য সারা পৃথিবীতে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে গেছে।

তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ, মানুষের গড় আয়ু বেড়ে যাওয়ার পিছনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির একটা সম্পর্ক আছে। আর চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির পিছনে রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সেগুলো দিয়ে অনেক সঠিকভাবে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। একটা সময় ছিল যখন চিকিৎসকেরা রোগীর বাহ্যিক বিভিন্ন লক্ষণ দেখেই রোগ নির্ণয় করতেন। শরীরের তখন অনেক কিছু অনুমান করতে হতো, সঠিকভাবে রোগ নিরূপণ করা যেত না। আধুনিক যন্ত্রপাতির কারণে শুধু যে অনেক নিখুঁতভাবে রোগ নিরূপণ করা যাচ্ছে তা নয়, অনেক কার্যকরভাবে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়েছে।

১৪.১.১ এক্স-রে (X-Ray)

১৮৮৫ সালে উইলহেলোম রন্টজেন উচ্চশক্তিসম্পন্ন এক ধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেন, যেটি শরীরের মাংসপেশি ভেদ করে গিয়ে ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুলতে পারত। এই রশ্মির প্রকৃতি তখন জানা ছিল না বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল এক্স-রে। এখন আমরা জানি, এক্স-রে হচ্ছে আলোর মতোই বিদ্যুৎ

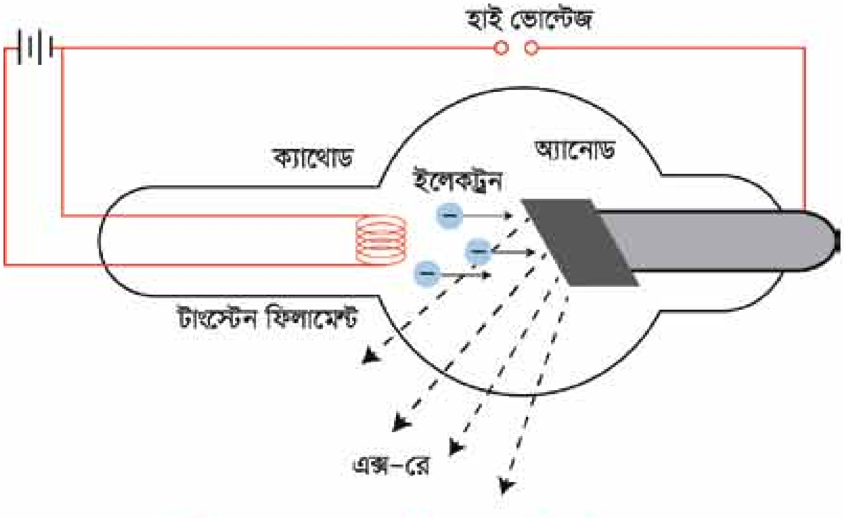

চিত্র ১৪.০১: এক্স-রে টিউবের কার্য পদ্ধতি

চৌম্বকীয় তরঙ্গ, তবে তার তরঙ্গদৈর্ঘ্য আমাদের পরিচিত দৃশ্যমান আলো থেকে কয়েক হাজার গুণ ছোট। তাই তার শক্তিও সাধারণ আলো থেকে কয়েক হাজারগুণ বেশি। যেহেতু তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনেক ছোট তাই আমরা খালি চোখে এক্স-রে দেখতে পাই না।

১৪.০১ চিত্রে কীভাবে এক্স-রে তৈরি হয়, সেটি দেখানো হয়েছে। একটি কাচের গোলকের দুই পাশে দুটি ইলেকট্রোড থাকে একটি ক্যাথোড অন্যটি অ্যানোড। ক্যাথোড টাংস্টেনের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ করে উত্তপ্ত করা হয়। তাপের কারণে ফিলামেন্ট থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হয় এবং অ্যানোডের ধনাত্মক ভোল্টেজের কারণে সেটি তার দিকে ছুটে যায়। ক্যাথোড এবং অ্যানোডের ভেতর ভোল্টেজ যত বেশি হবে, ইলেকট্রন তত বেশি গতিশক্তিতে অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে। এক্স-রে টিউবে এই ভোল্টেজ ১০০ হাজার ভোল্টেজ কাছাকাছি হতে পারে। ক্যাথোড থেকে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুটে আসা ইলেকট্রন অ্যানোডকে আঘাত করে। এই শক্তিশালী ইলেকট্রনের আঘাতে অ্যানোডের পরমাণুর ভেতর দিকের কক্ষপথের ইলেকট্রন কক্ষপথচ্যুত হয়। তখন বাইরের দিকে কক্ষপথের কোনো একটি ইলেকট্রন সেই জায়গাটা পূরণ করে। তখন যে শক্তিটুকু উদ্বৃত্ত হয়ে যায়, সেটি শক্তিশালী এক্সরে হিসেবে বের হয়ে আসে। ঠিক কতো তরঙ্গদৈর্ঘ্যের এক্স-রে বের হবে সেটি নির্ভর করে অ্যানোড হিসেবে কোন ধাতু ব্যবহার করা হবে তার উপর। সাধারণত তামাকে অ্যানোড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে অনেকভাবে ব্যবহার করা যায়, নিচে তার কয়েকটি ব্যবহারের তালিকা দেওয়া হলো।

চিত্র ১৪.০২: হাত এবং পায়ের এক্স-রে

১. স্থানচ্যুত হাড়, হাড়ে ফাটল, ভেঙে যাওয়া হাড় ইত্যাদি খুব সহজে শনাক্ত করা যায় (চিত্র ১৪.০২)।

২. দাঁতের ক্যাভিটি এবং অন্যান্য ক্ষয় বের করার জন্য এক্স-রে ব্যবহার করা হয়।

৩. পেটের এক্স-রে করে অন্ত্রের প্রতিবন্ধকতা (Intestinal Obstruction) শনাক্ত করা যায়।

৪. এক্স-রে দিয়ে পিত্তথলি ও কিডনি পাথরের অস্তিত্ব বের করা যায়।

৫. বুকের এক্স-রে করে ফুসফুসের রোগ যেমন যক্ষা, নিউমোনিয়া ফুসফুসের ক্যান্সার নির্ণয় করা যায়।

৬. এটি ক্যান্সার কোষকে মেরে ফেলতে পারে, তাই রেডিওথেরাপিতে এক্স-রে চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

এক্স-রের অপ্রয়োজনীয় বিকিরণ যেন শরীরে কোনো ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা

অবলম্বন করা হয়। এজন্য কোনো রোগীর এক্স-রে নেওয়ার সময় এক্স-রে করা অংশটুকু ছাড়া বাকি শরীর সিসা দিয়ে তৈরি এপ্রন দিয়ে ঢেকে নিতে হয়। অত্যন্ত প্রয়োজন না হলে গর্ভবতী মেয়েদের পেট বা তলপেটের অংশটুকু এক্স-রে করা হয় না।

১৪.১.২ আলট্রাসনোগ্রাফি (Ultrasonography)

আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাংসপেশি ইত্যাদির ছবি তোলা হয়, এটি করার জন্য খুব উচ্চ কম্পাংকের শব্দ ব্যবহার করে তার প্রতিধ্বনীকে ব্যবহার করা হয়। শব্দের কম্পাঙ্ক ১-১০ মেগাহার্টজ হয়ে থাকে বলে একে আলট্রাসনোগ্রাফি বলা হয়ে থাকে। ১৪.০৩ চিত্রে সাধারণ 2D এবং সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত 3D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি দেখানো হলো।

আলট্রাসনোগ্রাফি যন্ত্রে ট্রান্সডিউসার নামে একটি স্ফটিককে বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে উদ্দীপ্ত করে উচ্চ কম্পাঙ্কের আলট্রাসনিক তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয়। আলট্রাসনিক যন্ত্রে এই তরঙ্গকে একটা সরু বিমে পরিণত করা হয়। শরীরের ভেতরের যে অঙ্গটির প্রতিবিম্ব দেখার প্রয়োজন হয় ট্রান্সডিউসারটি শরীরে উপরে সেখানে স্পর্শ করে বীমটিকে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করানো হয়, রোগী সে যেন কোনো ব্যথা বা অস্বস্তি অনুভব করে না। যে অঙ্গের দিকে বিমটি নির্দেশ করা হয়, সেই অঙ্গের প্রকৃতি অনুযায়ী

চিত্র ১৪.০৩: সাধারণ 2-D এবং 3-D আলট্রাসনোগ্রাফি ছবি

প্রতিফলিত, শোষিত বা সংবাহিত হয়। যখন বিমটি মাংসপেশি বা রক্তের বিভিন্ন ঘনত্বের বিভেদতলে আপতিত হয়, তখন তরঙ্গের একটি অংশে প্রতিধ্বনিত হয়ে পুনরায় ট্রান্সডিউসারে ফিরে আসে। এই প্রতিধ্বনিগুলোকে বৈদ্যুতিক সংকেতে রূপান্তর করে সমন্বিত করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবিম্ব তৈরি করে।

আলট্রাসনোগ্রাফি নিচের কাজগুলো করার জন্য ব্যবহার করা হয়:

১. আলট্রাসনোগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার স্ত্রীরোগ এবং প্রসূতিবিজ্ঞানে। এর সাহায্যে ভ্রূণের আকার গঠন, স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক অবস্থান জানা যায়, প্রসূতি বিজ্ঞানে এটি একটি দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি।

২. আলট্রাসনোগ্রাফি দিয়ে জরায়ুর টিউমার এবং অন্যান্য পেলভিক উপস্থিতিও শনাক্ত করা যায়।

৩. পিত্তপাথর, হৃদ্‌যন্ত্রের ত্রুটি এবং টিউমার বের করার জন্যও আলট্রাসনোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করার জন্য যখন আলট্রাসাউন্ড ব্যবহার করা হয়, তখন এই পরীক্ষাকে ইকোকার্ডিয়গ্রাফি বলে।

৪. এক্স-রের তুলনায় আলট্রাসনোগ্রাফি অনেক বেশি নিরাপদ, তবুও এটাকে ঢালাও ভাবে ব্যবহার না করে সীমিত সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয় ট্রান্সডিউসারটি যেন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বেশি সময়ের জন্য একটানা বিম না পাঠায় সেজন্য আলট্রাসাউন্ড করার সময় ট্রান্সডিউসারটিকে ক্রমাগত নড়াচড়া করাতে হয়।

১৪.১.৩ সিটি স্ক্যান (CT Scan)

সিটি স্ক্যান শব্দটি ইংরেজি Computed Tomography Scan— এর সংক্ষিপ্ত রূপ। টমোগ্রাফি বলতে বোঝানো হয় ত্রিমাত্রিক বস্তুর একটি ফালির বা দ্বিমাত্রিক অংশের প্রতিবিম্ব তৈরি করা। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই যন্ত্রে এক্স-রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করার সময় শরীরের ভেতরের একবার ত্রিমাত্রিক অঙ্গের দ্বিমাত্রিক একটা প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। সিটি স্ক্যান যন্ত্রে একটি এক্সরে টিউব রোগীর শরীরকে বৃত্তাকারে ঘুরে এক্স-রে নির্গত করতে থাকে এবং অন্য পাশে ডিটেকটর প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে থাকে। প্রতিবিম্বটি স্পষ্ট করার জন্য অনেক সময় রোগীর শরীরে বিশেষ Contrast দ্রব্য ইনজেকশন করা হয়।

বৃত্তাকারে চারপাশের এক্সরে প্রতিবিম্ব পাওয়ার পর কম্পিউটার দিয়ে সেগুলো বিশ্লেষণ করে সমন্বয় করা হয় এবং একটি পরিপূর্ণ ফালির (Slice) অভ্যন্তরীণ গঠন পাওয়া যায়। একটি ফালির ছবি নেওয়ার পর সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র রোগীকে একটুখানি সামনে সরিয়ে পুনরায় বৃত্তাকারে চারদিক থেকে এক্স-রে প্রতিচ্ছবি গ্রহণে করে যেগুলো বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় আরেকটি ফালির অভ্যন্তরীণ গঠনটির একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরি করে (চিত্র ১৪.০৪)। এভাবে রোগীকে একটুখানি একটু খানি করে সামনে এগিয়ে নিয়ে তার শরীরের কোনো একটি অঙ্গের অনেকগুলো ফালির প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়। একটা রুটির অনেকগুলো স্লাইস পরপর সাজিয়ে নিয়ে আমরা যেরকম পুরো রুটিটি পেয়ে যাই, ঠিক সেরকম শরীরের কোনো অঙ্গের অনেকগুলো স্লাইসের ছবি একত্র করে আমরা রোগীর শরীরের ভেতরের একটা ত্রিমাত্রিক প্রতিচ্ছবি তৈরি করে নিতে পারি। সিটিস্ক্যানের কাজের পদ্ধতিটি দেখে তোমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারছ এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল, জটিল এবং একটি বিশাল যন্ত্র। এ

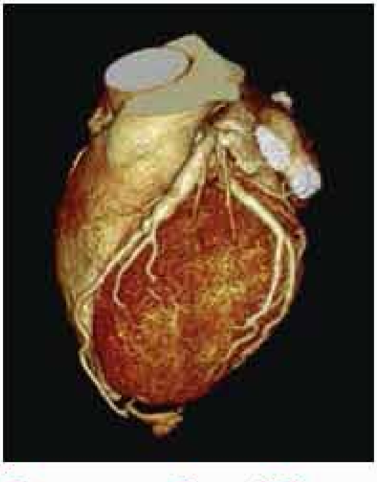

চিত্র ১৪.০৪: হৃৎপিণ্ডের সিটি স্ক্যান

যন্ত্রটি শরীরের ভেতরে না গিয়ে বাইরে থেকেই শরীরের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিখুঁত ত্রিমাত্রিক ছবি তৈরি করতে পারে। এটি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের খুব প্রয়োজনীয় একটি যন্ত্র (চিত্র ১৪.০৫) হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিটিস্ক্যান করে নিচের কাজগুলো করা সম্ভব:

চিত্র ১৪.০৫: সিটি স্ক্যান করার যন্ত্র

১. সিটিস্ক্যানের সাহায্যে শরীরের নরম টিস্যু, রক্তবাহী শিরা বা ধমনী, ফুসফুস, ব্রেন ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ ছবি পাওয়া যায়।

২. যকৃত, ফুসফুস এবং অগ্ন্যাশয়ের ক্যান্সার সনাক্ত করার কাজে সিটিস্ক্যান ব্যবহার করা হয়।

৩. সিটিস্ক্যানের প্রতিবিম্ব টিউমারকে শনাক্ত করতে পারে। টিউমারের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারে এবং টিউমারের আশপাশের টিস্যুকে কী পরিমাণ আক্রান্ত করেছে, সেটিও জানিয়ে দিতে পারে।

৪. মাথার সিটিস্ক্যানের সাহায্যে মস্তিষ্কের ভেতর কোনো ধরনের রক্তপাত হয়েছে কীনা, ধমনী ফুলে গেছে কী না কিংবা কোনো টিউমার আছে কি না, সেটি বলে দেওয়া যায়।

৫. শরীরে রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা আছে কিনা সেটিও সিটি স্ক্যান করে জানা যায়।

সতর্কতা: সিটিস্ক্যান করার জন্য যেহেতু এক্স-রে ব্যবহার করা হয়, তাই গর্ভবতী নারীদের সিটিস্ক্যান করা হয় না। ছবির কন্ট্রাস্ট বাড়ানোর জন্যে যে "রং" ব্যবহার করা হয় সেটি কারো কারো শরীরে এলার্জির জন্ম দিতে পারে বলে সেটি ব্যবহার করার আগে সতর্ক থাকতে হয়।

১৪.১.৪ এমআরআই (MRI: Magnetic Resonance Imaging)

মানুষের শরীরের প্রায় সত্তরভাগ পানি, যার অর্থ মানুষের শরীরের প্রায় সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে পানি থাকে। পানির প্রতিটি অনুতে থাকে হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের নিউক্লিয়াস হচ্ছে প্রোটন। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগ করলে প্রোটনগুলো চৌম্বকক্ষেত্রের দিকে সারিবদ্ধ হয়ে যায়, তখন নির্দিষ্ট একটি কম্পনের বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ পাঠানো হলে এই প্রোটনগুলো সেই তরঙ্গ থেকে শক্তি গ্রহণ করে তাদের দিক পরিবর্তন করে এবং এই প্রক্রিয়াটিকে বলে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স। পদার্থবিজ্ঞানের এই চমকপ্রদ ঘটনাটির উপর ভিত্তি করে ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স ইমেজিং বা এমআরআই তৈরি করা হয়েছে (চিত্র ১৪.০৬)।

২০২৩

এমআরআই যন্ত্রটি দেখতে সিটিস্ক্যান যন্ত্রের মতো কিন্তু এর কার্যপ্রণালি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সিটিস্ক্যান যন্ত্রে এক্স-রে পাঠিয়ে প্রতিচ্ছবি নেওয়া হয়, এমআরআই যন্ত্রে একজন রোগীকে অনেক শক্তিশালী চৌম্বকক্ষেত্রে রেখে তার শরীরে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সির বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ দেওয়া হয়। শরীরের পানির অণুর ভেতরকার হাইড্রোজেনের প্রোটন থেকে ফিরে আসা সংকেতকে কম্পিউটার দিয়ে বিশ্লেষণ করে শরীরের ভেতরকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতিবিম্ব তৈরি করা হয়।

চিত্র ১৪.০৬: এম আর আই করার যন্ত্র

সিটিস্ক্যান দিয়ে যা কিছু করা সম্ভব, এমআরআই দিয়েও সেগুলো করা সম্ভব। তবে এমআরআই দিয়ে শরীরের ভেতরকার কোমল টিস্যুর ভেতরকার পার্থক্যগুলো ভালো করে বোঝা সম্ভব। সিটিস্ক্যান করতে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি সময়ের দরকার হয় না, সেই তুলনায় এমআরআই করতে একটু বেশি সময় নেয়। সিটিস্ক্যানে এক্স-রে ব্যবহার করা হয় বলে যত কমই হোক তেজস্ক্রিয়তার একটু ঝুঁকি থাকে এমআরআইয়ে সেই ঝুঁকি নেই।

শরীরের ভেতরে কোনো ধাতব কিছু থাকলে (যেমন: পেস মেকার) এমআরআই করা যায় না, কারণ আর এফ (RF) তরঙ্গ ধাতুকে উত্তপ্ত করে বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে।

১৪.১.৫ ইসিজি (ECG)

ইসিজি হলো ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম (Electro Cardiogram) শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইসিজি করে মানুষের হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক এবং পেশিজনিত কাজকর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করা যায়। আমরা জানি, বাইরের কোনো উদ্দীপনা ছাড়াই হৃৎপিণ্ড ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক সংকেত তৈরি করে এবং এই সংকেত পেশির ভেতর ছড়িয়ে পড়ে, যার কারণে হৃৎস্পন্দন হয়। ইসিজি যন্ত্র (চিত্র ১৪.০৭) ব্যবহার করে আমরা হৃৎপিণ্ডের এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো শনাক্ত করতে পারি। এর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন হার এবং ছন্দময়তা পরিমাপ করা যায়। ইসিজি সংকেত হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের একটি পরোক্ষ প্রমাণ দেয়।

ইসিজি করতে হলে বৈদ্যুতিক সংকেতগুলো গ্রহণ করার জন্য শরীরে ইলেকট্রোড লাগাতে হয়। দুই হাতে দুটি, দুই পায়ে দুটি এবং ছয়টি হৃৎপিণ্ডের অবস্থান-সংলগ্ন বুকের উপর লাগানো হয়। প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে বৈদ্যুতিক

চিত্র ১৪.০৭: ই সি জি মেশিন

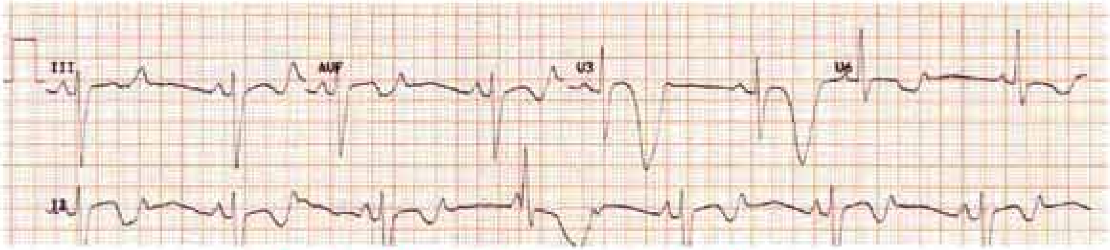

চিত্র ১৪.০৮: ইসিজি মেশিন থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক সংকেত

সংকেতকে সংগ্রহ করা হয়। এই সংকেতগুলোকে যখন ছাপানো (চিত্র ১৪.০৮) হয়, তখন সেটিকে বলে ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম।

একজন সুস্থ মানুষের প্রত্যেকটি ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া বৈদ্যুতিক সংকেতের একটা স্বাভাবিক নকশা থাকে। যদি কোনো মানুষের হৃৎপিণ্ডে অস্বাভাবিক অবস্থা তৈরি হয়, তখন তার ইলেকট্রোড থেকে পাওয়া সংকেতগুলো স্বাভাবিক নকশা থেকে ভিন্ন হবে।

সাধারণ কোনো রোগের কারণ হিসেবে বুকের ধড়ফড়ানি, অনিয়মিত কিংবা দ্রুত হৃৎস্পন্দন বা বুকে ব্যথা হলে ইসিজি করা হয়। এছাড়া নিয়মিত চেক আপ করার জন্য কিংবা বড় অপারেশনের আগে ইসিজির সাহায্য নেওয়া হয়।

হৃৎপিণ্ডের যেসব অস্বাভাবিক অবস্থা ইসিজি করা যায়, সেগুলো হচ্ছে:

১. হৃৎপিণ্ডের অস্বাভাবিক স্পন্দন, অর্থাৎ স্পন্দনের হার বেশি বা কম হলে

২. হার্ট এটাক হয়ে থাকলে

৩. হৃৎপিণ্ডের আকার বড় হয়ে থাকলে

ইসিজি মেশিনটি অত্যন্ত সহজ সরল মেশিন। এটি ব্যবহার করে শরীরের ভেতরকার হৃৎপিণ্ডের অবস্থার অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। একজন রোগীর চিকিৎসার জন্য এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

১৪.১.৬ এন্ডোসকপি (Endoscopy)

চিকিৎসার কারণে শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গ বা গহ্বরকে বাইরে থেকে সরাসরি দেখার প্রক্রিয়াটির নাম এন্ডোসকপি। এন্ডোসকপি যন্ত্র দিয়ে শরীরের ফাঁপা অঙ্গগুলোর ভেতরে পরীক্ষা করা যায় (চিত্র ১৪.০৯)।

এন্ডোসকোপ যন্ত্রে দুটি স্বচ্ছ নল থাকে। একটি নল দিয়ে বাইরে থেকে রোগীর শরীরের নির্দিষ্ট অঙ্গের ভেতরে তীব্র আলো ফেলা হয়। এটি করা হয় অপটিক্যাল ফাইবার দিয়ে, আলো এই ফাইবারে পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের মাধ্যমে প্রবেশ করে বলে নলটি সোজা থাকতে হয় না, আঁকাবাঁকা হতে পারে।

চিত্র ১৪.০৯: এন্ডোসকপির মাধ্যমে পাকস্থলীর ভেতরে দেখার প্রক্রিয়া

রোগীর শরীরের ক্ষতিগ্রস্ত বা রোগাক্রান্ত জায়গাটি আলোকিত করার পর সেই এলাকার ছবিটি দ্বিতীয় স্বচ্ছ নলের ভেতর দিয়ে দেখা যায়। কোনো বস্তু দেখতে হলে সেটি সরল রেখায় থাকতে হয়। কিন্তু শরীরের ভেতরের কোনো অঙ্গের ভেতরে সরল রেখায় তাকানো সম্ভব নয়। তাই ছবিটি দেখার জন্য অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করা হয় যেখানে আলো পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে আঁকাবাঁকা পথে যেতে পারে। শরীরের অভ্যন্তরের একটি নির্দিষ্ট জায়গা সূক্ষ্মভাবে দেখার জন্য অত্যন্ত সরু ৫ থেকে ১০ হাজার অপটিক্যাল ফাইবারের একটি বান্ডিল ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেকটি ফাইবার একটি বিন্দুর প্রতিচ্ছবি নিয়ে আসে বলে সব মিলিয়ে অত্যন্ত নিখুঁত একটি ছবি দেখা সম্ভব হয়। অপটিক্যাল ফাইবার অত্যন্ত সরু হয় বলে ৫ থেকে ১০ হাজার ফাইবারের বান্ডিলটির প্রস্থচ্ছেদও কয়েক মিলিমিটার থেকে বেশি হয় না।

বর্তমানে অত্যন্ত ক্ষুদ্র সিসিডি ক্যামেরার প্রযুক্তির কারণে এন্ডোসকপি যন্ত্রের নলের মাথায় একটি ক্ষুদ্র ক্যামেরা বসিয়ে সেটি সরাসরি শরীরের ভেতরে ঢুকিয়ে ভিডিও সিগন্যাল দেখা সম্ভবপর হচ্ছে। এন্ডোসকপি ব্যবহার করে ডাক্তারেরা যেকোনো ধরনের অস্বস্তিবোধ, ক্ষত, প্রদাহ এবং অস্বাভাবিক কোষ বৃদ্ধি পরীক্ষা করে থাকেন। যে অঙ্গগুলো পরীক্ষা করার জন্য এন্ডোসকপি ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে-

১. ফুসফুস এবং বুকের কেন্দ্রীয় বিভাজন অংশে

২. পাকস্থলী, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র বা কোলন

৩. স্ত্রী প্রজনন অঙ্গ

৪. উদর এবং পেলভিস

৫. মূত্রনালির অভ্যন্তর ভাগ

৬. নাসা গহ্বর, নাকের চারপাশের সাইনাস এবং কান

এন্ডোসকপি করার সময় যেহেতু একটি নল সরাসরি ক্ষতস্থানে প্রবেশ করানো হয়, সেটি দিয়ে সেই ক্ষতস্থানের নমুনা নিয়ে আসা সম্ভব এবং প্রয়োজনে এটা ব্যবহার করে কিছু কিছু সার্জারিও করা সম্ভব।

১৪.১.৭ এনজিওগ্রাফি (Angiography)

এক্স-রের মাধ্যমে শরীরের রক্তনালিগুলো দেখার জন্য এনজিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। সাধারণ এক্স-রে করে রক্তনালি ভালোভাবে দেখা যায় না বলে এনজিওগ্রাম করার সময় রক্তনালিতে বিশেষ Contrast Material বা বৈসাদৃশ্য রঙিন তরল (ডাই) ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। রক্তনালির যে অংশটুকু পরীক্ষা করতে হবে ঠিক সেখানে রঙিন তরল দেওয়ার জন্যে একটি সরু এবং নমনীয় নল কোনো একটি ধমনি দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। এই সরু এবং নমনীয় নলটিকে বলে ক্যাথিটার। ক্যাথিটার দিয়ে রক্তনালির নির্দিষ্ট জায়গায় ডাই দেওয়ার পর সেই এলাকায় এক্স-রে নেওয়া হয়। ডাই থাকার কারণে এক্স-রেতে রক্তনালিগুলোকে স্পষ্ট দেখা যায় (চিত্র ১৪.১০)। ডাই পরে কিডনির সাহায্যে ছেঁকে আলাদা করা হয় এবং প্রস্রাবের সাথে শরীর থেকে বের হয়ে যায়।

চিত্র ১৪.১০: ওপরের ছবিতে রক্তনালিগুলোর এনজিওগ্রাফিতে ধমনিতে ব্লকেজ দেখা যাচ্ছে এবং ডানের ছবিতে এনজিওপ্লাস্টি করার পর স্বাভাবিক রক্ত

সাধারণত যেসব সমস্যা পরীক্ষা করার জন্য ডাক্তারেরা এনজিওগ্রাম করার পরামর্শ দেন, সেগুলো হচ্ছে:

১. হৃৎপিণ্ডের বাইরের ধমনিতে ব্লকেজ হলে। রক্তনালি ব্লক হলে রক্তের স্বাভাবিক প্রবাহ হতে পারে না, হৃৎপিণ্ডে যথেষ্ট রক্ত সরবরাহ করা না হলে সেটি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না এবং হার্ট এটাকের আশঙ্কা বেড়ে যায়।

২. ধমনি প্রসারিত হলে

৩. কিডনির ধমনির অবস্থাগুলো বোঝার জন্য

৪. শিরার কোনো সমস্যা হলে।

সিটিস্ক্যান কিংবা এমআরআই করার সময় সকল পরীক্ষাগুলো শরীরের বাইরে থেকে করা হয়। এনজিওগ্রাম করার সময় একটি ক্যাথিটার শরীরের ভেতরের রক্তনালিতে ঢোকানো হয় বলে কোনো

রকম সার্জারি না করেই তাৎক্ষণিকভাবে রক্তনালি ব্লকের চিকিৎসা করা সম্ভব। যে প্রক্রিয়ায় এনজিওগ্রাম করার সময় ধমনির ব্লক মুক্ত করা হয়, তাকে এনজিওপ্লাস্টি বলা হয়। এনজিওপ্লাস্টি করার সময় ক্যাথিটার দিয়ে ছোট একটি বেলুন পাঠিয়ে সেটি ফুলিয়ে রক্তনালিকে প্রসারিত করে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে সেখানে একটি রিং (ring) প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয় যেন সংকুচিত ধমনিটি প্রসারিত থাকে এবং প্রয়োজনীয় রক্তের প্রবাহ হতে পারে।

১৪.২ রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান (Science in Treatment)

১৪.২.১ রেডিও থেরাপি (Radio Therapy)

রেডিও থেরাপি শব্দটি ইংরেজি Radiation Therapy শব্দটির সংক্ষিপ্তরূপ। রেডিওথেরাপি হচ্ছে কোনো রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ব্যবহার। এটি মূলত ক্যান্সার রোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। রেডিওথেরাপিতে সাধারণত উচ্চক্ষমতার এক্সরে ব্যবহার করে ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করা হয়। এই এক্স-রে করে ক্যান্সার কোষের ভেতরকার ডিএনএ (DNA) ধ্বংস করে কোষের সংখ্যাবৃদ্ধি করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। একটি টিউমারকে সার্জারি করার আগে ছোট করে নেওয়ার জন্য কিংবা সার্জারির পর টিউমারের অবশিষ্ট অংশ ধ্বংস করার জন্যও রেডিওথেরাপি করা হয়।

বাইরে থেকে রেডিওথেরাপি দিয়ে চিকিৎসা করার জন্যে সাধারণত একটি লিনিয়ার এক্সেলেটর ব্যবহার করে উচ্চক্ষমতার এক্স-রে তৈরি করা হয়। শরীরে যেখানে টিউমারটি থাকে সেদিকে তাক করে তেজস্ক্রিয় বিমটি (চিত্র ১৪.১১) পাঠানো হয়। বিমটি তখন শুধু ক্যান্সার কোষকে ধ্বংস করে দেয় না, তার বিভাজন ক্ষমতাও নষ্ট করে দেয়। বিমটি শুধু ক্যান্সার আক্রান্ত জায়গায় পাঠানো সম্ভব হয় না বলে আশপাশের কিছু সুস্থ কোষও ধ্বংস হয়। রেডিওথেরাপি বন্ধ হওয়ার পর সুস্থ কোষগুলো আবার সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করে।

চিত্র ১৪.১১: রেডিও থেরাপি যন্ত্র

১৪.২.২ কেমোথেরাপি (Chemotherapy)

ক্যান্সারে শরীরের কিছু কোষ বিভাজনের গতি অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। কেমোথেরাপি হলো এমন এক ধরনের চিকিৎসা, যেখানে বিশেষ

২০২৫

ধরনের রাসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করে শরীরের জন্য ক্ষতিকর দ্রুত বিভাজনরত ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করা হয়। এটি ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি।

কার্যপ্রণালি : প্রতিটি জীবদেহ কোষ দ্বারা গঠিত। এই কোষ বৃদ্ধি পায় বা বিভাজিত হয়। জীবদেহের এই কোষ বিভাজনের ওপর ভিত্তি করে কেমোথেরাপি গঠিত হয়েছে। কেমোথেরাপিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক ঔষধ কোষ বিভাজনের নির্দিষ্ট ধাপে প্রয়োগ করা হয়। কোষ বিভাজনের কোন ধাপে কী প্রয়োগ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে রাসায়নিক ঔষধগুলো ঠিক করা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সময় জুড়ে থাকে। যেমন: প্রতিদিনে ১ বার, সপ্তাহে ১ বার বা মাসে ১ বার প্রভৃতি। সাধারণত এভাবে প্রায় ৬ বার ঔষধ প্রয়োগ করা হয়।

কেমোথেরাপির ঝুঁকি বা পার্শ্বক্রিয়া—প্রতিক্রিয়া: কেমোথেরাপির বিশেষ ঔষধ ক্যান্সার আক্রান্ত কোষ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট অন্য কোষও ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। এতে নিম্নোক্ত ঝুঁকি থাকতে পারে:

১. চুল পড়ে যাওয়া

২. হাতের তালু, পায়ের তালু প্রভৃতি অঙ্গের চামড়া পুড়ে যাওয়া

৩. হজমে সমস্যা হওয়া এবং এর কারণে ডায়ারিয়া, পানিশূন্যতা, বমি প্রভৃতি সমস্যা হওয়া

৪. লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেতরক্ত কণিকা ও অণুচক্রিকা উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হওয়া।

কেমোথেরাপির ঝুঁকি এড়াবার কিছু কৌশল এরকম:

১. শরীরের তাপমাত্রার দিকে লক্ষ রাখা।

২. তরল বা নরম খাবার খাওয়া।

৩. কেমোথেরাপি গ্রহণকৃত রোগীর বর্জ্য, যেমন মলমূত্র, বমি ইত্যাদি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জীবাণুনাশক নিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা।

৪. বর্জ্য পরিষ্কার করার সময় খালি হাত ব্যবহার না করে গ্লাভস বা কমপক্ষে প্লাস্টিকের ব্যাগে হাত ভালভাবে মুড়িয়ে পরিষ্কার করা।

৫. শরীরের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঠিক রাখার জন্য সার্বক্ষণিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলা ও যোগাযোগ রাখা।

১৪.২.৩ আইসোটোপ এবং এর ব্যবহার (Isotopes and its Uses)

মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াসে নিউট্রনের সংখ্যা ভিন্ন হলে তাকে সেই মৌলিক পদার্থের আইসোটপ বলে। প্রকৃতিতে অনেক মৌলের বিভিন্ন আইসোটপকে স্বাভাবিকভাবে তেজস্ক্রিয় হিসেবে পাওয়া যায়, আবার নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া করে তেজস্ক্রিয় আইসোটপ বানানো সম্ভব। চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময়ই এই

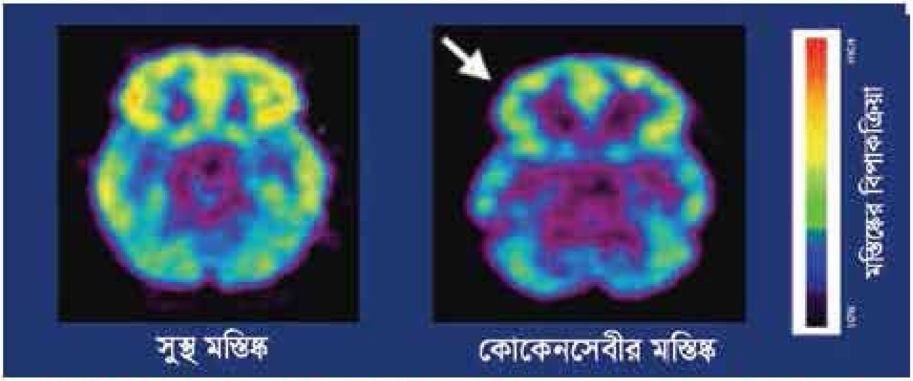

চিত্র ১৪.১২: PET scan দিয়ে দেখা স্বাভাবিক এবং কোকেন মাদকাসক্ত মানুষের মস্তিষ্কের ক্রিয়াশীল অংশের ছবি

তেজস্ক্রিয় আইসোটপ ব্যবহার করা হয়। এই আইসোটোপগুলো রোগ নির্ণয় করার জন্য যেরকম ব্যবহার করা যায়, ঠিক সেরকম রোগ নিরাময়ের জন্যও ব্যবহার করা যায়।

শরীরের কোনো কোনো অংশে মাঝে মাঝে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো যৌগিক পদার্থ যুক্ত হয়। সেই যৌগিক পদার্থের পরিমাণ দেখে অঙ্গটি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া সম্ভব। যৌগটির পরিমাণ বোঝার জন্য যৌগটির কোনো একটি পরমাণুকে তেজস্ক্রিয় আইসোটপ দিয়ে পাল্টে দেওয়া হয় এবং সেই তেজস্ক্রিয় আইসোটপের বিকিরণ থেকে নির্দিষ্ট অঙ্গে যৌগের পরিমাণ বোঝা যায়। সাধারণত আইসোটপটি গামা-রে বিকিরণ করে এবং বাইরে থেকেই এই গামা-রে শনাক্ত করা যায়।

সম্ভবত: তেজস্ক্রিয় আইসোটপ ব্যবহারের একটি চমকপ্রদ উদাহরণ PET বা Positron Emission Tomography যেখানে তেজস্ক্রিয় আইসোটপটি পজিট্রন বিকিরণ করে। তোমরা জান, পজিট্রন ইলেকট্রনের প্রতিপদার্থ (Anti Particle) এবং এটি ইলেকট্রনের সাথে যুক্ত হয়ে শক্তিতে রূপান্তর হয়। এই শক্তি দুটি গামা-রে হিসেবে বিপরীত দিকে বের হয়ে আসে। কাজেই বিপরীত দিকে দুটি নির্দিষ্ট শক্তির গামা-রে শনাক্ত করে পজিট্রনটি কোথা থেকে বের হয়েছে, সেটি বের করে নেওয়া যায়। সেই তথ্য থেকে আমরা শুধু যে পজিট্রন তৈরির অস্তিত্ব জানতে পারি তা নয়, সেটি ঠিক কোথায় কতটুকু আছে, সেটাও বলে দিতে পারি। গ্লুকোজের ভেতর পজিট্রন বিকিরণ করে সেরকম একটি আইসোটোপ যুক্ত করে দিলে PET ব্যবহার করে আমরা মস্তিষ্কের কোথায় কতটুকু জমা হয়েছে, সেটি বের করতে

পারব। এই তথ্য থেকে কোন সময় মস্তিষ্কের কোন অংশ বেশি ক্রিয়াশীল (চিত্র ১৪.১২) এবং বেশি গ্লুকোজ ব্যবহার করেছে, সেই তথ্যও বের করা সম্ভব। PET প্রযুক্তি মানুষের মস্তিষ্কের কর্মপদ্ধতি বের করার ব্যাপারে যুগান্তকারী ভূমিকা রেখেছে।

তেজস্ক্রিয় আইসোটপ ব্যবহার করে শুধু যে রোগ নির্ণয় বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কর্মপদ্ধতি বের করা হয়, তা নয়, এটি দিয়ে রোগ নিরাময় করা হয়। ^{60}Co একটি গামা-রে বিকিরণকারী আইসোটপ, এই আইসটোপ ব্যবহার করে গামা রে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে ধ্বংস করা হয়। ^{131}I (আয়োডিন)-কে থাইরয়েডের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। থাইরয়েডের চিকিৎসায় এটি এতই কার্যকর যে আজকাল থাইরয়েডের সার্জারির প্রয়োজন হয় না।

এছাড়াও লিউকেমিয়া নামে রক্তের ক্যান্সারের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় ফসফরাস আইসোটোপ ^{32}P যুক্ত ফসফেট ব্যবহার করা হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ক্যান্সারের চিকিৎসায় কোনটি ব্যবহার করা হয়?

(ক) এমআরআই (খ) কেমোথেরাপি
(গ) এনজিওগ্রাফি (ঘ) আলট্রাসনোগ্রাফি

২. এন্ডোস্কোপিতে প্রয়োগ করা হয়

i. আলোর প্রতিসরণ
ii. বৈদ্যুতিক তরঙ্গের নিঃসরণ
iii. আলোর পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) ii (খ) iii (গ) i ও iii (ঘ) I ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রফিক সাহেব বুকে ব্যথা অনুভব করলে তিনি একটি পরীক্ষা করালেন। এই পরীক্ষা করার সময় রফিক সাহেবের রক্তনালিকা দিয়ে এক ধরনের বিশেষ তরল পদার্থ প্রবেশ করানো হয়।

৩. রফিক সাহেব কোন পরীক্ষাটি করালেন?

(ক) এন্ডোস্কোপি (খ) এনজিওগ্রাফি

(গ) কেমোথেরাপি (ঘ) রেডিওথেরাপি

৪. রফিক সাহেবের রক্ত নালিকায় প্রবেশ করানো পদার্থটি কী?

(ক) 'ডাই' নামক তরল (খ) তরল অক্সিজেন

(গ) মলিবডেনাম (ঘ) টাংস্টেন

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রহমান সাহেব দীর্ঘদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছেন। এ সমস্যার জন্য ডাক্তারের শরণাপন্ন হলে ডাক্তার তাকে এন্ডোস্কোপি করতে বললেন। অন্যদিকে রহমান সাহেবের ছেলে সুমন হঠাৎ সিঁড়িতে পড়ে গিয়ে হাতে আঘাত পায় এবং হাত ভেঙে যায়। পরবর্তীসময়ে ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার এক্স-রে করার পরামর্শ দেন।

(ক) MRI-এর পূর্ণরূপ লিখ।

(খ) রেডিওথেরাপি বলতে কী বুঝায়?

(গ) ডাক্তার সুমনকে এক্স-রে করার পরামর্শ দিলেন কেন?

(ঘ) রহমান সাহেবের রোগ নির্ণয়ে এন্ডোস্কোপি কতটুকু কার্যকর? মতামত দাও।

২. রশিদ সাহেব অফিস থেকে বাসায় ফিরছিলেন। হঠাৎ গাড়িটি দুর্ঘটনায় পড়লে তিনি মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যান। সহকর্মীরা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে সিটি স্ক্যান করতে বলেন। কিছুদিন পর রশিদ সাহেবের ভাই বুকে প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করলেন। পরবর্তীসময়ে ডাক্তারের কাছে গেলে তিনি ECG করার পরামর্শ দিলেন।

(ক) এনজিওগ্রাফি কী?

(খ) আলট্রাসনোগ্রাফি বলতে কী বুঝায়?

(গ) রশিদ সাহেবকে ডাক্তার সিটি স্ক্যান করতে বললেন কেন?

(ঘ) রশিদ সাহেবের ভাইয়ের চিকিৎসায় ECG-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

সমাপ্ত

স্বাধীনতার
৫০
বছর
উন্নয়ন আমারও

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বিশ্বে মোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ ভাগ আসে পারমাণবিক প্রযুক্তি খাত থেকে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বল্প মূল্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তির ব্যবহার করার প্রয়াসে পাবনা জেলার রূপপুরে দুই ইউনিট বিশিষ্ট পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে। প্রতিটি ইউনিট প্রায় ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। ১৯৬১ সালে পাবনা জেলায় ৬৩২ একরের উপর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা স্থগিত হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম ইউনিট ও ২০১৮ সালে দ্বিতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হয় যা ২০২৩ বা ২০২৪ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

২০২৩
শিক্ষাবর্ষ
৯ম-১০ম বিজ্ঞান

‘দেশ তোমাকে কী দিতে পারবে সেটা জিজ্ঞেস করো না, বরং নিজেকে জিজ্ঞেস করো তুমি দেশকে কী দিতে পারবে।’ —জন এফ কেনেডি

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য ‘৩৩৩’ কলসেন্টারে ফোন করুন
নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য